পথের নয় ; কেবল রাজপথেরই আজকে পাঁচালী হয়।

কারণ সব পথই এখন রাজপথে এসে মিশেছে। আমরা কেবল মুখেই বলি : গ্রাম ; মনে মনে যার ভজনা করি তার নাম, রেডিও-গ্রাম। আমরা সকলের সমুখেই বলি শুধু : ভিসান চাই এই দেশকে বাঁচাতে হলে। আর মনে মনে উচ্চারণ করি ; টেলিভিসান চাই এ দেশের প্রেস্টিজ বাঁচাতে হলে। মুখ আর মন যেদিন এক ছিলো সেদিন কবির একথা সত্য ছিলো যে, বহু ব্যয় করে বহু দেশ ঘোরার পরেও বাকী থাকে দেখা, 'একটি ধানের শিষের উপরে একটি শিশিরবিন্দু'। আজ যখন ধান ভানতে শিবার গীত শোনার দিনও বিরল হয়ে আসছে তখন রাজপথের পাঁচালীর অশুভারম্ভ হোক এই বলে যে : একটি ধেনোর শিশির উপরে একটি নিশির বন্ধু!

এখন বহু ক্রোশ দূরের পথ পাড়ি দিতে হয় না ; রাজপথে বেরুলেই হয়। দশটা-পাঁচটার প্রহসনে তিনটে-ছটা-নটার চেয়ে অনেক চমকপ্রদ ছবি যার চোখে পড়ে না সে হতভাগ্য ব্যক্তির চোখে সূর্য ডোববার পরেও রয়ে গেছে সান গ্লাস। চোখ আর কান খোলা রাখলে এমন সব দৃশ্য আপনার চোখে পড়বে এর আগে যা অদৃশ্য ছিলো। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত মহৎ অথবা বৃহৎ সে কারুর ধ্যানে কিংবা কল্পনায় ধরা পড়েনি 'যার কণা মাত্র'।

তখন ছিলো সাহেবদের যুগ ; এখন মোসাহেবদের দাপট। 'আংরেজি হঠাও' বলছি মুখে ; কিন্তু মুখেই বলছি কেবল। সকলের সমুখে তাই বলছি বটে কিন্তু ছেলেদের পাঠাচ্ছি লামার্টিনেয়ারে

মেয়েদের লরেটোয়। সেখানে ইংরিজিতে রামায়ণ পড়ছে তারা: Dasarath's four sons; বাড়িতে ফিরে তার হিন্দি তর্জমা হচ্ছে; দশরথকা চৌবাচ্চা। পার্টিতে তারা খাচ্ছে স্যাণ্ডুইচ; মুখে বলছে: বালুকা মায়াবী। চাপছে বাই-সাইকেল: বাই-সাইকেলকে রাষ্ট্র-ভাষায় যা বলছে তা কিন্তু ছাপা যাচ্ছে না কিছুতেই, সাংঘাতিক স্ল্যাং শোনাবে এই ভয়ে।

সাহেবরা যাবার আগে কেবল দেশটাকে নয় গোটা জাতটাকেই ভাগ করে দিয়ে গেছে। একদলের পরণে ঠিক অফিসে, ট্রামে-বাসে, উৎসবে ব্যসনে, শ্মশানে রাজদ্বারে সর্বত্র হাওয়াইয়ান সার্ট, ড্রেনপাইপ ট্রাউজার, ছুঁচলোমুখ জুতো: আরেকদলের অংগে শেরোয়ানি আর চুড়িদার পায়জামা, মাথায় ক্যাপ, পায়ে চপ্পল। একদল বলছে: জয় হিন্দ; আরেকদল,—জয় হিন্দি। একদল গাইছে: কাম্ সেপ্টেম্বার; আরেকদল হাঁকছে, সংস্কৃতকে করো রাষ্ট্রভাষা!

এই রাজপথের নাটকে কমিডি, ট্রাজিডি, ট্রাজি-কমিডি, ফার্স অপেরা, ম্যাজিক সব দেখতে পাবেন: বিনা দর্শনীতে বিরামবিহীন এই প্রদর্শনীতে কেবল আপনাকে তৈরী থাকতে হবে সর্বক্ষণ চোখ-কান খোলা রেখে। কখন কি হয় নয়: সর্বক্ষণই এখানে কি না হয় বলা কঠিন। এই দেখবেন একটু তেল, সরষে কিংবা কেরোসিনের জন্যে লাইন দিচ্ছে কেউ; আবার কেউ প্রয়োজনীয় কাউকে একটু তেল দেবার লাইন খুঁজছে। জব চার্নকের প্রিয় শহর এই কলকাতাকে মহাজনেরা বলেছেন, সিটি অভ নাইটমেয়ার; মিছিলের শহর; আবর্জনার জায়গা। কিন্তু আসলে আজকের কলকাতা হচ্ছে লাইনের শহর। যেখানে তাকাও, শুধু লাইন।

টেলিফোনের লাইন মাটির তলায়; টেলিগ্রামের লাইন মাথার উপর; ট্রামের লাইন পায়ের নীচে। কেরোসিনের লাইন, মাছের

লাইন, র‍্যাশনের লাইন, টিকিটের লাইন, কিসের লাইন নয়। সদর কলকাতায় আপনার আইনভাঙা যেমন সহজ, লাইনভাঙা তেমনই কঠিন। ধরুন, প্রসূতি সদনে হবু-বাপেরা লাইন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কখন নার্স এসে খবর দেবে তারই প্রতীক্ষায়। এমন সময় লাইনের সব শেষে যে দাঁড়িয়ে তাকে এসে নার্স জানালো; যান, আপনার ছেলে হয়েছে। সংগে সংগে লাইনে যারা আগে দাঁড়িয়ে, তারা চীৎকার করে উঠলো: এ কেন হবে? আমরা ভোর রাত থেকে দাঁড়িয়ে, উনি এসেছেন এই আধঘণ্টা আগে, ওঁর ছেলে আগে হ'বে কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর হয় না, কিন্তু এ প্রশ্ন যেখানে করা যায় তার নামই কলকাতা।

সেই কলকাতার কথা বলছি যা একদিন ভারতবর্ষের রাজধানী ছিলো এবং এখন যা ভারতবর্ষের বাঁশধানীতে পরিণত। অর্থাৎ যত প্রকার সমস্যা ভারতবর্ষে এখন আছে তার সবই আছে কলকাতায়। এবং সমস্যার চেয়ে বড় বাঁশ যে আর নেই সেকথা বলা বাহুল্য। এই কলকাতায় একদা ভারতের সকল ভূতপূর্ব নেতাদের অভ্যুদয় হতো; এখনও এই কলকাতায় অহরহ আবির্ভূত হতে দেখা যাচ্ছে অভূতপূর্ব অভিনেতাদের। এখন রাজনীতি বলে কিছু নেই, যা 'আছে' তার নাম, আজনীতি। সেই আজনীতি বলে যে আজকের ভারতে যে যত বড় নেতা সে তার চেয়েও বড় অভিনেতা।

আজনীতির রাজধানী দিল্লি; কিন্তু আজনৈতিক অভিনেতাদের মক্কা আজও কলকাতা। কেবল আজনীতির কেন? যে কোনও ক্ষেত্রের যে কোনও নেতা অর্থাৎ যে আসলে অভিনেতা সে যত বড়ই হোক কলকাতায় তাকে আসতেই হবে। কলকাতা জয় না করে ভারত দিগ্বিজয় করা যদি বা আজনৈতিক ক্ষেত্রে সম্ভব হয়, শিল্প,

সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য তো বটেই ফিল্মস্টার, ব্যারিস্টার থেকে মিনিস্টার, রাজনীতি, অর্থনীতি থেকে দুর্নীতি,—কলকাতায় না মজা প্রায় অসম্ভব।

সাহেবদের ইণ্ডিয়ায় কলকাতা ছিলো ফেয়ার লেডি, মোসাহেবদের ইণ্ডিয়া দ্যাট ইস্ ভারতে কলকাতা হচ্ছে আনফেয়ার লেডি। সাহেবরা বাঙলা দেশকে ভয় করতো কিন্তু ভালোবাসত কলকাতাকে। মোসাহেবরা বাঙালীকে কাঙালী জ্ঞান করে; কলকাতাকে মনে করে ভয়ংকর। কলকাতাকে ডরায় শিল্পপতিরা কারণ কলকাতায় স্ট্রাইক ডাকতে হয় না, কলকাতা স্ট্রাইক করে। কলকাতাকে ঈর্ষা ক'রে চিত্রজগৎ কারণ এখানকার ছবি বারবার প্রাইজ পেয়ে পেয়ে সারপ্রাইজের মর্যাদা রাখে না। কলকাতাকে ভয় পায় দিল্লি: কারণ কেরল নয়, কলকাতাই হচ্ছে কম্যুনিস্টদের, অর্থাৎ যত অনিষ্টের গোড়াপত্তন।

এলিয়টের ওয়েস্ট ল্যাণ্ডের পরেও, আরও একটি কাব্য আজও জন্মের অপেক্ষায়; তার নাম কলকাতা,—দ্য ইটার্নাল কোয়েস্ট ল্যাণ্ড!

আমার কাছে কলকাতা ওয়েস্ট ল্যাণ্ড নয়, কোয়েস্ট ল্যাণ্ড। ভারতবর্ষের যত বড় বড় শহর, বোম্বাই, দিল্লি, মাদ্রাজ, চণ্ডীগড়, ভুবনেশ্বর, ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট দাও সবাইকে; কেবল কলকাতা বাদ। কলকাতার ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট দরকার নেই, কারণ তার ক্যারেক্টার আছে। সাহেবদের আমলে যা ছিলো মোসাহেবদের আমলে তার চেয়ে হীনচরিত্র হলেও, কলকাতা আজও চরিত্রহীন নয়। তার জাত আলাদা, স্বাদ ভিন্ন, লক্ষ্য—স্বতন্ত্র।

দুই

পাঁচালীর লঘু মেজাজ ইতি করি হাঁস দিয়ে। অতঃপর আরম্ভ করি কলকাতার গুরু কথা। গুরুতর কথা ও চোখের জল না দিলে বাঙলা সাহিত্যে আপনার যথেষ্ট খ্যাতির সম্ভাবনা এবং খ্যাতির অসম্ভাবনা যথাক্রমে সুদূরপরাহত ও সন্নিকট। বাঙালী সমাজে কথা বলতে না পারার নাম ব্যক্তিত্ব এবং বাঙলা সাহিত্যে গুরুতর কথা লঘুতম ভঙ্গিতে বলতে পারার ক্ষমতা প্রতিভার পরিচয় নয়; ক্ষমতার অপব্যবহার। সিয়েরিয়াস RAW-চোনার আমাদের আসক্তি রামছাগলের দাড়ি রাখার মতোই সর্বজনীন। রচনা রম্য হলেই আমাদের সাহিত্যে তার জাত গেলো। যে লেখা পড়তে বোরিং এবং বুঝতে প্রাণান্ত সেই লেখাই লেখা। যে লেখা রবীন্দ্রনাথ কেন গ্যায়টে নন এ সম্পর্কে দারুণ গবেষণা (গো+এষণা) এদেশে তার নিদারুণ খাতির। যে লেখা রবীন্দ্রনাথ—রবীন্দ্রনাথ বলে এবং গ্যেটে—গ্যেটে বলেই, একজন আরেকজন নন, বলতে চায় এদেশে সে লেখকের অখ্যাতির সীমা পরিসীমা নেই। প্রত্যেক মহৎ লেখকেরই সাহিত্যধর্ম আলাদা এবং নিজের ধর্মে নিধনও অপরধর্ম গ্রহণের চেয়ে কম ভয়াবহ, এ বিশ্বাস যার সেই যথার্থ শিল্পী যে, একথা যাকে লিখে বোঝাতে হয় তার ট্রাজিডি ক্লাউনের কপালের লিখন! খণ্ডাবে কে? নিজের দুঃখকে পরের হাসি করতে পারা পৃথিবীর যে কোনও দেশের যে কোনও ভাষায় নন্দিত এবং আমাদের দেশে, আমাদের ভাষায় নিন্দিত হয়। তাই তাকে বলতে হয় নিঃস্বভারতীর দেশেঃ লেখক করলে তো বাঙালী

করলে কেন? বাঙালী করলে যদি তবে কেন, কেন করলে লেখক আমাকে?

কিন্তু সেকথা থাক। তার বদলে তোলা যাক রাজপথের পাঁচালীর যবনিকা। কলকাতার সেই রাজপথ যার মাথায় ঝুলছে অলোকিত ঘোষণা : 'ঈশ্বর মানুষকে প্রেম করিবেন ; এরই আলোর নীচে শুয়ে আছে মড়ার গাদার মতো মানুষ যাদের শোবার জায়গা নেই এত বড় সহরের কোথাও। একটু রাতে যদি বেরুন এই রাজপথে তো দেখবেন সড়াদাঁড়িয়ে গেছে কাণা ট্রাফিক সিগন্যালের রক্তিম চক্ষুর ইসারায়। লাল আলোয় জ্বলছে সেই সাবধান বাণী— দেখিয়া রাস্তা পার হইবেন। এই সতর্ক উচ্চারণ শুনে এই মাত্র মারা গেছে যে চারজনের কাঁধে চেপে চলতে চলতে যে হয়ত হাসে অমনই সোচ্চার। শুধু মৃত আর অর্ধমৃতের দেশে আমরা তার কথায় কান দিইনি তাই রক্ষে।

এই রাস্তাতেই শিং ধরে গরুকে পাহারোলা সেপাই বার করে দিচ্ছে দেখে যদি আপনার মনে অলস কৌতূহল জাগে, গরুর প্রতি এমন অদয় কেন সেপাই। তা' হলে জিজ্ঞেস করে দেখবেন, লাইন দেখিয়ে দেবে সে : NO HORN AREA! এ শিং যে সে হর্ণ নয়, এ কথা সেপাই জাঁদরেল সিংকে বোঝানো শক্ত। বোঝানো এখনও শক্ত যে, তার কারণ মাথার ওপরই তার লাল থেকে নীল হয়েছে ; মাথার ভেতর তখনও যেমন ছিলো না, এখনও তেমন নেই সেই হই বস্তু, যার নাম গ্রে ম্যাটার।

কলকাতায় এই বিচিত্র রাজপথেই একদিন বাস থেকে নামলেন এক ভদ্র মহিলা। বুককাটা বগলকাটা জামা পরে ঠোঁটে রং, মুখে এনামেল, চোখে সূর্য কাচ, হাতে গর্বপেটিকা ঝুলিয়ে। নেমেই একজন পথচারীকে দেখিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন : ওইতো। ওইতো।

ধরুন, ওকে। ধরুন। ধরুন। চীৎকার শুনে সবাই দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো; সেই লোকটিও। ট্র্যাফিক সার্জেন্ট লোকটিকে আটকালো, ভদ্রমহিলার নির্দেশে। কী ব্যাপার? ভদ্রমহিলা বললেন, এই লোকই নাকি অফিস যাবার পথে বেশ কয়েক দিন ভদ্রমহিলাকে বিরক্ত করেছেন, ইতর মন্তব্য ও কুৎসিত মন্তব্য করে। ভদ্রলোক শুনে থ। বললেন, তিনি জীবনে ভদ্রমহিলাকে কখনও দেখেননি এর আগে, শপথ করে বলতে পারেন। ট্রাফিক সার্জেন্টের কাছে শপথের মূল্য পুলিসের মাথার মতোই NIL। সার্জেন্ট দুজনকে নিয়েই থানায় চললো। থানায় যাবার পথে সার্জেন্টের একটু বেশি অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করেন ভদ্রমহিলা। সার্জেন্টের দৃষ্টি এড়ায় না তা। থানায় অভিযোগের পুনরুক্তি করেন মহিলা, যথাসম্ভব প্রতিবাদ করেন ভদ্রলোক। পুলিস কর্মচারী প্রশ্ন করে ভদ্রমহিলাকে জানতে পারেন, তিনি এবং তাঁর স্বামী দুজনেই চাকরি করেন। তখন প্রশ্ন হয় মহিলাকে ঃ আপনি স্বামীর সঙ্গে যান না কেন? উত্তর হয়ঃ দুজনের অফিস যাবার টাইম আলাদা। চার্জ লেখা হয় পুলিসের খাতায়। ভদ্রমহিলা কিন্তু কিন্তু করে, তার পর সই দিতে বাধ্য হন এবং ঠিকানা। কোর্টে মামলা গড়ায়।

কোর্টে হাজিরা দিতে যাননি সেই ভদ্রমহিলা আজও। সেই পুলিস সার্জেন্ট, সেই অভিযুক্ত ভদ্রলোক, যে শুনেছে এই কাহিনী সবাই অবাক হয়েছে যৎপরোনাস্তি। ভদ্রমহিলা পাগল? ভুল করেছেন? না, অন্য কিছু?

শুধু অবাক হইনি আমি। অবাক হবার আমার বয়স নেই, মাত্র এ কারণে নয়। অবাক হবেন না আপনারাও যদি জানেন যে, সেই পুলিস সার্জেন্টটি বাংলা ছবির নায়ক। বেশ কয়েকখানা

ছবিতে নেমেছেন। আরও কয়েকখানা ছবিতে অভিনয়রত এই মুহূর্তে। অনুমান করি বন্ধুদের সঙ্গে বাজি রেখেছিলেন ভদ্রমহিলা। সার্জেণ্ট নায়কের সঙ্গে আলাপ করতে পারেন তিনি কি-না তাই নিয়ে বাজি। ঘরে নেমন্তন্ন করে আলাপ নয়। রাস্তায় কর্তব্যরত অবস্থায় সকলের চোখের ওপর সার্জেণ্টের সঙ্গে কথা বলতে হবে, তবেই বাজি মারা যাবে। না। সার্জেণ্ট নয়। বাংলা ছবির নায়কের সঙ্গে।

সেই বাজি রাখতেই একজন নিরীহ পথচারীকে পথে বসিয়ে তার পর বাজি জেতা হয়ে গেলে কোর্টে যাওয়া আর দরকার মনে করেন নি। করেন নি তিনি। এ আমার অনুমান মাত্র স্বীকার করি। কিন্তু অনুমানও কি কখনও কখনও প্রমাণ নয়? অকাট্য প্রমাণ?

তিন

কলকাতার রাস্তায় বাড়ীর ওপর থেকে ময়লা জল পথচারীর গায়ে পড়লে প্রতিবাদ করবার আছে; কিন্তু প্রতিকার করবার কেউ নেই। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে রক fellow-রা আড্ডা দেবে। গাড়ীতে যেতে যেতে হর্ণ দেন যদি পথ ছেড়ে দেবার জন্যে, সঙ্গে সঙ্গে শুনবেন অশ্রাব্য গালাগাল: রাস্তা কি আপনার বাবার মোশাই? তারপরেও যদি হর্ণ দেন, তাহলে ওদেরই একজন এসে গাড়ির বনেট খুলে হর্ণের তার ছিঁড়ে দেবে আপনার চোখের ওপর। যদি জিজ্ঞেস করেন, ওটা কি হলো? রিটর্ট হবে তৎক্ষণাৎ: শিং ভেঙ্গে দিলাম। ততক্ষণে পাড়ার সবচেয়ে বজ্জাত বাচ্চা, যে এই রকফেলোদের সবচেয়ে ওবিডিয়েণ্ট বাফেলো, সে বলবে: গ্যাস বার করে দিলাম! বড্ড বেশি গ্যাস হয়েছিলো কি না! রকের ডায়ালগ যদি আপনার নীরেট মাথা ভেদ করে না ঢোকে তখনও, তাহলে হর্ণের তার কাটা গাড়িতে ষ্টার্ট দেবার ট্রাবল নিন, দেখবেন, গাড়ির টায়ার ফুটো। তখন বুঝবেন গ্যাস বেরিয়ে যাওয়া বলতে কি বোঝায় রকফেলোদের স্ল্যাং-এ।

কলকাতার রাস্তায় পথচারীর গায়ে জল ফেলেছিলো এমনই একদিন একজন। পথচারীর রোষকষায়িত দৃষ্টির সামনে অকম্পিত বুকে বলেছিলো সে, "ওরকম তাকাবার কি আছে? মানুষে জল ফেলেছে তাই এত অমানুষিক রাগ বুঝি আপনার? যদি আকাশ থেকে কুকুর-বেড়াল বৃষ্টি নামত হঠাৎ, তাহলে কি করতেন?

ভগবানের দিকেও রক্তচক্ষু করে তাকাতেন! এ-উত্তরের আর জবাব নেই!

ভগবানের মার নামে যখন তখন আর সাবধান নেই। মানুষ, গরু, বাড়ি ঘর সব ভাসে, সব ভাঙ্গে একসঙ্গে। কেন? মনে হয় যুগসঞ্চিত পাপের পঙ্ক ধুয়ে মুছে দিতে দেখা দেয় প্রলয়। শঙ্খের মুখে তিনি অসংখ্যবার বলেছেন, সম্ভবামি যুগে যুগে। সে কেবল ধর্মকে অধর্মের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যেই নয়। মানুষকে মনে করিয়ে দেবার জন্যে যে, মর্তসীমা লঙ্ঘন করলে মানুষ, একজন আছেন যিনি দেখা দেন, যুদ্ধ, মহামারী, মৃত্যুরূপে!

কি রকম পাপে প্রয়োজন হয় এমন প্রায়শ্চিত্তের কখনো কখনো. তারই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দিই এখন। কলকাতার রাজপথ থেকে ধরে আনা হয়েছে একদিন থানায় একটি মাঝবয়সী মহিলা এবং তার বাচ্চা একটা মেয়ে। অপরাধ কি? না, ওয়াগন থেকে উপচে পড়া কয়লা পাওয়া গেছে মহিলার আঁচলে আর মেয়েটার কচি হাতের মুঠোয় ধরা আছে একটা কয়লা তখনও। অত্যন্ত গরীব সেই মহিলা। তার বাচ্চাটার বয়স খুব বেশি হলে বছর পাঁচ। ভয়ঙ্কর এত বড় চুরি হাতেনাতে ধরার কৃতিত্বে তখনও কলকাতার সেই পুলিস-থানা ডগমগ। পোর্ট থেকে, রেল লাইন থেকে হাজার-লক্ষ টাকার মাল উবে যাবার খবর বেরয় খবর কাগজে। তার সিকি অংশেরও হদিশ হয় না কোন। কিন্তু বাচ্চা একটা মেয়ের, আর তার মায়ের হাতে কয়লার টুকরো,—এ আসামী ছাড়া পেলে পুলিসের নিষ্কলঙ্ক গণ্ডে চূণকালি পড়বে। চার্জ লেখা রয়েছে থানায়। এবার চালান হবে আদালতে।

এইবারই সেই অমানুষিক ট্রাজিডির স্নুরু। মাকে হাজির হতে হবে এক আদালতে আর বাচ্চাটার বিচার হবে লিলুয়ায় বিশেষ

আদালতে। ঠিক সেই সময়ে আমি থানায় বসে। মাকে টানছে পুলিস একদিকে; বাচ্চাকে টানছে আরেক দিকে। হৃদয়-বিদারক আর্তনাদে পুলিস ছাড়া আর কারুর ঠিক থাকা অসম্ভব।

বেরিয়ে এলাম থানা থেকে। বাচ্চাটাকে লিলুয়া নিয়ে যাবে। বিচারে বাচ্চা যদি ছাড়া পায় তাকে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব পুলিসের নয়। মায়ের বিচার হবে কলকাতার কোনও আদালতে। জরিমানা হবে, অথবা ছাড়া পাবে। কিন্তু বাচ্চাকে খুঁজে পাবে না আর। সমস্ত জীবন এ খুঁজবে ওকে, ও খুঁজবে একে!

পুলিসের দোষ নেই। আইন বলছে, বাচ্চাদের আর বড়দের বিচার এক জায়গায় হবে না। তাই, মায়ের সঙ্গে পাঁচ বছরের মেয়ে ধরা পড়লে ওই আইন অনুযায়ী বাচ্চা চালান হয়ে যাবে লিলুয়ায়। কি করে সে ফিরে আসবে সে নিয়ে যদি প্রশ্ন করেন তো ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডে তার কোনও উত্তর নেই। অথচ এই আইন, এই অমানুষিক আইন যারা তৈরী করেছে, তারাও মানুষ। তাদেরও বাচ্চা আছে। পুলিসেরও তো নিশ্চয়ই সংসার আছে, আছে সন্তান। কারুর কি একবার মায়ের কোল থেকে ছেলে-মেয়েকে ছিনিয়ে নেবার মুহূর্তে মনে এ-প্রশ্নও ওঠে না যে, এই বাচ্চাটা অত দূর থেকে কি করে ফিরবে আবার মায়ের শূন্য বুকে; মায়ের শুকনো বুকে?

যদি এ-প্রশ্ন না ওঠে মানুষের মনে তাহলে, মানুষের যিনি বিধাতা তার মনে এ-প্রশ্ন এক সময়ে ওঠে এবং আরেক সময়ে সে উত্তর আসে ওই প্রলয়ের বজ্রাগ্নিশিখায়। মৃত্যুতে, যুদ্ধে, মহামারী, প্লাবনে: আড়াই মিনিটের ঝড়ে তাই নিশ্চিহ্ন হয় তুফানগঞ্জ।

বিধাতা কেন এত নিষ্ঠুর, মানুষ যখন এ-প্রশ্ন তোলে, তখন আমার মনে এই দৃশ্যটি জেগে ওঠে। মানুষ মানুষের সন্তানের প্রতি

যদি এই ব্যবহার করতে পারে, এই অমানুষিক ব্যবহার, তাহলে বিধাতার রুদ্ররোষে কেঁদে লাভ কি ?

মানুষ ঈশ্বরের শিশু। তার একশত অপরাধ পর্যন্ত ঈশ্বর ক্ষমা করেন। একশতর একটি বেশী হওয়া মাত্র মানুষ আর শিশু নয় ঈশ্বরের চোখে। শিশু তখন শিশুপাল এবং তখনই সুদর্শন চক্রের দেখা পাই বজ্রে, মেঘে, বন্যায়, মৃত্যুতে, দুর্ভিক্ষে, মহামারীতে, প্লাবনে, যুদ্ধে।

কলকাতার পাপের অঙ্ক একশত পূর্ণ হতে দেরী কত আর ?

চার

জানি। আরেকজন কার কথা বলছেন।

ভগবান ? দূর, দূর। যীশুখৃষ্ট ঝুলেছিলো ক্রসে, ভগবান তো ওই হোর্ডিং-এ ঝুলছে—

তাহলে আপনার গুরু ঠাকুর কে ?

ঠাকুর রামকৃষ্ণ ! আর সব ঠাকুরই তো ধাপ্পা !

আপনি রামকৃষ্ণের ভক্ত ?

সুয়া'র নাহলে আমার এ-হাল হবে কেন ? শোনেন নি কখনও, না, না, কি যাতা বলছি, আপনি কি করে শুনবেন, আপনি তো সায়েন্স মানেন, ঠাকুরকে জানেন না—

কি বলেছেন তিনি ?

বলেছেন, যে করে আমার আশ আমি করি তার সর্বনাশ।

তবুও যে—

একটু গলা নামিয়ে, তবুও যে, ওইটেই পারছি না। হরিশচন্দ্র

শ্মশানে গিয়ে ফিরে পেয়েছিলো সব। কিন্তু আমি তো শ্মশানে যাব হিন্দু সৎকারের গাড়িতে—

আপনি হিন্দু?

আরে? আপনি না সেকুলার ষ্টেট ইণ্ডিয়া দ্যাট ইস ভারতের সিটিজন? হিন্দু সৎকারের গাড়িতে মুসলমান কি ক্রিষ্টিশ্চান হলে চাপতে দেবে? নামিয়ে দেবে না তখুনি?

(একটা বাচ্চা ছেলে এক ভাড় চা নিয়ে এল ইতিমধ্যে)

—আরেকজন ঠাকুর কে?

রবি ঠাকুর।

তার কথা মনে পড়ল কেন?

আপার কিপ্টেমি দেখে—দুটো পয়সা দিলেই তুমি বলতে পারেন আমাকে—তবু সেই একটা অক্ষর বেশি বলতেই হবে, কেন জানেন?

না—

গুরুদেব জানতেন—

কি?

এ-জগতে হায় সেই বেশি চায় আছে যার ভুরি ভুরি—। ভুরি নয়, ওটা ভুঁড়ি হবে—দেখবেন যার অল্প ভুঁড়ি আছে সে আরও ভুঁড়ি বাগাতে চায়। যার বেশ ভুঁড়ি হয়েছে, সে চায় আরও বেশি ভুঁড়ি তৈরী করতে--

(আগন্তুক আড়চোখে নিজের ভুঁড়ির দিকে তাকায়)

—আহা হা, লজ্জা পাবেন না, লজ্জা পাবেন না। আপনার ও ভুঁড়ি ছোটো সরাই—আমি জালার কথা বলছিলাম—ওই দেখুন।

(একটা কালো, মস্ত ভুঁড়িওলা লোক আসছে দেখা যায়। সে বিড়ি টানা লোকটার কাছে আসে) তারপর বলে: এই যে এই

নাও তোমার কার্ড,—এতে লেখা আছে, আজ কোথায় তোমাকে যেতে হবে, কি পোষাক পরতে হবে, সব—নাও। (লোকটা চলে যায় অন্য ভিখিরীদের কাছে।)

—এই তোমাদের মালিক বুঝি ?

দূর, দূর। মালিক এখন ভিখিরী বস্তি তুলে দেবার জন্যে বক্তৃতা তৈরী করছে বাড়িতে বসে। আমাদের এই ভিক্ষে ব্যবসার মালিক কে জানো ? (আগন্তুকের কানে কানে নামটা বলে)।

—কোথায় গেলে দেখা পাব, সেই ভারত বিখ্যাত ব্যক্তির ?

—সাড়ে আটটার সময় পাবে বালিগঞ্জে গোলপার্কের কাছে এব বাড়িতে—

—সেখানে কে আছে ?

—মা পূর্ণতারা। উনি তাঁর শিষ্য যে।

—আচ্ছা থ্যাংক্ ইউ ফর দি ইনফরমেশান্, চলি এখন সেখানে —দেখি সেখানে আবার নতুন কি নাটক জমেছে ইতিমধ্যে।

পাঁচ

মা পূর্ণতারা একটু একটু করে তরমুজের সরবৎ খাচ্ছিলেন গেলাসে করে। দু'জন ভারতবিখ্যাত ধুরন্ধর পণ্ডিত আলাপ করছিলেন মায়ের সামনে বসে। সবাই শুনছিলো আর হাসছিলেন মা। ভুবন-মনোমোহিনী হাসি। পণ্ডিত বলছিলেন যে দুঃখ পাবার প্রয়োজন হয় কেন মানুষের। বিষয় যেমন, আলোচনা তেমনই গভীর। মন্ত্রমুগ্ধ শ্রোতারা গিলছিলো সেই কথা নিবিষ্ট চিত্তে। পণ্ডিতদের মতে, দুঃখ পাবার প্রয়োজন এই জন্যে যে, তা না হলে চিত্তশুদ্ধি হয় না। আর চিত্তশুদ্ধি না হলে ভগবানকে পায় না কেউ। কুন্তীর কথা বলছিলেন আরেক পণ্ডিত। কুন্তীকে বর প্রার্থনা করতে বললে কৃষ্ণ, কুন্তী বলেছিলেন : "আমার জীবন থেকে দুঃখের মেঘ সরিয়ে নিও না, কারণ তাহলেই হে পাণ্ডবসখা, আমি তোমাকে ভুলে যাব।"

মা পূর্ণতারা হঠাৎ বলে উঠলেন : তাহলে আমার ভগবানকে পাওয়া আর হোল না।

কেন ?—পণ্ডিতদের উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন।

কারণ আমি তো দুঃখের সাধনা করছি না, কেমন আরাম করে তরমুজের সরবৎ খাচ্ছি।

তোমার কথা আলাদা—

আলাদা কেন ?

কারণ তুমি তাকে পেয়ে গেছ, যিনি দুঃখের অতীত !

মা পূর্ণতারা এবারে বললেন : একটু খেয়ে দেখ তো কেমন সরবৎ। বলে, এগিয়ে দিলেন গেলাস। যে গেলাস থেকে নিজে

খাচ্ছিলেন, সে গেলাস নয়। আরও একটা গেলাসে সরবৎ রাখা ছিলো। সেটা থেকে পণ্ডিতদের একজন একটু মুখে দিয়েই চীৎকার করে উঠলো : মরে গেলাম! মরে গেলাম!

কী ব্যাপার?

তরমুজের নয়, লঙ্কার সরবৎ। মা এতক্ষণ মিষ্টিমুখ করে সাংঘাতিক জ্বালা ধরানো সরবৎ খাচ্ছিলেন অক্লেশে। তারপর সরবৎ খেতে খেতেই বলেন হাসতে হাসতে : লঙ্কার সরবৎ আর তরমুজের সরবতে যেদিন তফাৎ থাকবে না, সেদিন প্রয়োজন হবে না আর দুঃখের সাধনার। আশীর্বাদ করি সেই সাধনায় তোমরা সিদ্ধ হও।

সবাই সমস্বরে জয়ধ্বনি দিলে, রাজা ও প্রজা, জ্ঞানী ও মূঢ়, সাধু ও পাপী : জয় মা, পূর্ণতারার জয়।

মামাবাবু তখন শুধু সেখানে ছিলেন না। আশ্রমের সবচেয়ে নির্জন অন্ধকার ঘরে ভক্ত দাসী বিধবা অনুপমাকে বলছিলেন : শোনো, এখনি গিয়ে মা'-র কাছ থেকে টোল খাওয়া গেলাসটা সরিয়ে নাও। মনের ভুলে তোমার মা যদি ওই গেলাস থেকে কাউকে পেসাদ দেয়, তাহলেই সে বুঝবে একটায় লঙ্কার সরবৎ, আর আরেকটা, যেটায় তোমার মা চুমুক দিচ্ছেন মাঝে মাঝে, হচ্ছে তরমুজের সরবৎ। এখনই না সরালে সাধনা ধরা পড়ে যাবে তোমার মায়ের—দুঃখজয়ের সাধনা!

'মামাবাবু আছে বলেই আশ্রম চলছে। মামাবাবু তোমার কি বুদ্ধি!'—সোহাগে ঢলে পড়ে অনুপমা। গাল টিপে দেয় মামাবাবুর।

এক ঝটকায় ভক্ত দাসী অনুপমার হাত সরিয়ে দিয়ে মামাবাবু শংসায় : কী করিস যে যখন-তখন? কে দেখে ফেলবে—

যেতে যেতে থমকে দাঁড়ায় ভক্ত দাসী অনুপমা : না গো না। কেউ দেখবে না। সব তো চোখ বুজে বসে আছে, দেখবে কে? চোখ খোলা থাকলে এখানে একজনেরও আমরা কি আর করে খেতে পারতাম? আর আমাদের মা পূর্ণভারা কিছুই না করে তোফা খেতে পারত—লঙ্কার সরবতের গেলাসে তরমুজের সরবৎ।

লয়ের উপাচার্য। চোখের এবং কানের মাথা পুরো খেয়ে উদোম নির্লজ্জ, প্যাঁচালো, বজ্জাত নোংরা, দুশ্চরিত্র, ঘুষ খেতে এবং দিতে সমান উৎসাহী না হতে পারলে আজকের শিক্ষাজগতে তার, বাঙালীর ইংরেজিতে যাকে বলে 'NO ADMISSON' তাই জুটবে। ডাল-ভাতে জুটবে না তার, যদি সে পড়িয়ে খেতে চায়। বলা বাহুল্য, বিদ্যাসাগর এই কাঙালী সমাজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারতেন না। কাজে কাজেই সেই খাপ খোলা বাঁকা তলোয়ার আজকের কোলকাতায়, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতোই, অত্যন্ত অবাঞ্ছিত ব্যক্তি বলে চিহ্নিত। ঈশ্বরের মতোই ঈশ্বর বিদ্যাসাগরের নাম শুনলেও এই কোলকাতা বলতো, নাক সিঁটকিয়ে, রাশ্যান শূন্যচারী মহাশূন্য ঘুরে এসে বলেছে ঈশ্বর ট্রাইসাইকেল চেপে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অর্থাৎ ঈশ্বর নেই।

তবুও। ঈশ্বর নেই কি আছে এ নিয়ে আমি বিন্দুমাত্র বিচলিত নই। ঈশ্বর বিদ্যাসাগরের মতো একজন লোকও এখন নেই, এ নিয়ে আমার দুঃখ নিরবধি। যদিও একই নিঃশ্বাসে আমি বলছি, ঈশ্বরচন্দ্র থাকলেও, আমি জানি, কাজে লাগতেন না তিনি। ঈশ্বর

বিদ্যাসাগর তো নয়ই, আমার সন্দেহ, স্বয়ং ঈশ্বরও সম্ভবতঃ কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কেও আর আবর্জনামুক্ত করতে পারেন না। পৃথিবী যেমন বিয়ণ্ড রিপেয়ার হয়ে আসায় আমাদের বিধাতা বহু আশায় মানুষের মাথা দিয়েই বার করেছেন সেই আণবিক কল, যার কয়েকটি একসঙ্গে বিস্ফারিত হলেই, পৃথিবী এবং পৃথিবীর সব মানুষ নিকেশ একসঙ্গে। তখন আর সবার উপরে মানুষ নয়, সবার উপরে ফানুস সত্য তাহার উপরে নাই।

তার আগে, সেই মহত্তম সুদিনের আগে একটি ক্ষুদ্রতর আশায় বুক বেঁধে আছি আমি। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবে নিজের হাতে উচ্চারিত হবে বিয়ণ্ড রিপেয়ার বলে!

কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নয়, কোলকাতা নিঃস্ব বিদ্যালয়। ভাইস চ্যান্সেলার একটি। কিন্তু VICE অনন্ত।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আজই নয় প্রথম, বিষবৃক্ষ চারা পোঁতা হয়েছে অনেক কাল আগেই। স্যার যদুনাথ সরকার বিষের চারাদের জ্বালায় পালাতে পথ পাননি একদিন। একদিন কোলকাতার দুটি বাড়িতে, দুটি বিখ্যাত বাড়িতে, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্কুলের, অধ্যাপক থেকে মাষ্টার পর্যন্ত টিকি বাঁধা থাকতো পুরুষানুক্রমে। স্কুলে বা কলেজে, কিম্বা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার চেয়ে অনেক বেশি জরুরী ছিলো এই দুই বাড়িতে রেগুলার য়্যাটেণ্ডেন্স। এই দুই বাড়ির কোনও ছেলে বা মেয়ে পরীক্ষায় বসলে, ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট যার বাঁধা তেমন ছাত্র পরীক্ষায় বসত না সে বছর। কারণ সে, মাইকেল পড়ে জানতো, রাবণ যার কাছে হেরেছে, সে রাম নয়, নিয়তি। সে বছর পরীক্ষা দিলে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হওয়ায় নিয়তির নিষেধ রয়েছে। এই নির্মম নিয়তির নাম, সবাই জানতো, আজও জানে। জিজ্ঞেস করলে অবশ্য বলতে বাধা আছে। অথবা সেই এক উপায় আছে, যে উপায়

বার করার কৃতিত্ব জনশ্রুতি হেরম্ব মৈত্রের কাঁধে চাপিয়েছে বরাবর : 'জানি কিন্তু বলব না।' অথবা জীবিত লোকের ওপর বেস করে লেখা বেস্ট সেলার উপন্যাসের গোড়ায় দেগে দেওয়া আছে, দ্বিতীয় আরেক অদ্বিতীয় উপায় : এ গ্রন্থের কোনও চরিত্রের সঙ্গে যদি কোনও জীবিত লোকের আদল মিলে যায় তাহলে বুঝতে হবে তা আকস্মিক এবং সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত।

রাজপথের পাঁচালীর এই ছয় নম্বর অধ্যায়ে যাদের নয়ছয় করে দিতে উদ্যত হয়েছি তারা কেউ কাল্পনিক ব্যক্তি নয়। সবাই বেঁচে আছেন। সবাই চেনা আপনাদের। কেউ নাম-করা কেউ বদনাম-করা। কেউ প্রিন্সিপ্যাল, কেউ রিডার, কেউ লেকচারার, কেউ ছাত্র-ছাত্রী। এদের আসল নাম দিতে না পারলেও, ঠারে ঠোরে এমন ভাবে নামের সঙ্গে মিলিয়ে ছদ্মনামে হাজির করব যাতে আপনাদেব বুঝতে বিন্দুমাত্র দেরী না হয়। যেমন ধরুন কারুর নাম যদি রুদ্রেন্দ্র তাকে যদি কেউ হাজির করে ক্ষুদ্রেন্দ্র বলে তাহলে বুদ্ধিমান পাঠকের বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, ক্ষুদ্রেন্দ্র কারুর নাম হওয়া অসম্ভব। তা ছাড়া রুদ্রেন্দ্র যদি দুর্নামধন্য লোক হয় তাহলে ক্ষুদ্রেন্দ্র থেকে ধরা শক্ত হবে কেন যে কার কথা বলতে যাচ্ছি। অতএব অভিশাপ দিন।

অয়মারম্ভ অশুভায় ভবতু।

অতি সম্প্রতি একটি পরীক্ষায় বঙ্গভারতী অর্থাৎ সাহিত্যের ছাত্রীকে প্রথম শ্রেণী পাইয়ে দিয়েছেন একজন রথী-মহারথী শ্রেণীর পরীক্ষক। তাঁর কথা দিয়েই সুরু করি। এঁর কাছে, এই অবিবাহিত পরীক্ষকের কাছে কয়েকজন ছাত্রী গেলে, তিনি তাদের বলেন, দল বেঁধে এলে কিছু হবে না। একা একা এসো। অবশ্য এঁকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। এখন পরীক্ষার খাতায় এই ধরণের পক্ষপাতিত্ব

জাতে উঠে গেছে। দু'চারজন ছাড়া এদোষে সবাই প্রায় দোষী। সব পাখীই মাছ খায়, অতএব মাছরাঙ্গাকে দোষ দিয়ে লাভ কি ?

এর চেয়ে গুরুতর কথা বলবার জন্যে কলম ধরেছি, কাদা ছিটোবার জন্যে নয়। এমন কি একথাও কবুল করতে লজ্জা নেই আমার যে আমিও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ নয়, কারণ আমিও রক্তমাংসের মানুষ। নিরপেক্ষতার ভাণ করে সংবাদপত্রের জগতে যুগান্তর আনতে পারব, এমন সাধ অথবা সাধ্য কোনটাই আমার আয়ত্তে নয়।

আমি চাইছি এই লেখা পড়ে আপনারা সমাজের সর্ববিধ অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। পুঁজিবাদ, সমাজবাদ, সাম্যবাদ নয়। চাই প্রতিবাদ। সক্রিয় প্রতিবাদ। একক নয়, সম্মিলিত সোচ্চার প্রতিবাদ। মনে নিতে পারছেন না, যা, তা মেনে নেবেন না ভয়ে। আপনিও ছেলে-মেয়ের বাপ-মা। ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ আপনারও ভবিষ্যৎ। অভিভাবক হিসেবে আপনার কখনও উচিত হবে না ছেলেমেয়েদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে দেওয়া। আপনি জানবেন, নিশ্চয়ই জানবেন, যার বর্তমান সৎ নয়, তার নেই কোনও ভবিষ্যৎ।

আমার কাজ অন্যায়ের আবরণ উন্মোচন। আপনাদের কাজ অন্যায়ের উচ্ছেদ। লেখক এবং পাঠকে মিলে, চিন্তা এবং কর্ম এক সঙ্গে হলে তবেই এদের মাথায় বাজ পড়বে। তার জন্যে আমার অপেক্ষা কখনও ফুরোবে না। আমি অপেক্ষা করে আছি। আমি অপেক্ষা করব।

সাত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে স্যার বি, এল, মিত্তির তদন্ত কমিটি কতকগুলো এমন কলঙ্কজনক অধ্যায়ের আবরণ উন্মোচন করেছিলেন যা সাধারণ লোকের হাতে পড়লে তারা বুঝতে পারত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আজ কত নিঃস্ব বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। এই রিপোর্টের অংশবিশেষ প্রকাশিত হয়েছে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রহস্য নামে একখানা বইতে। এই বইয়েয় লেখক হচ্ছেন সুবোধ ব্যানার্জী, বিগত দশকের বিধান সভায় যিনি ছিলেন নিঃসংশয়ে শ্রেষ্ঠ বিরোধী। এই বইয়ের উপসংহার সুবোধবাবু লিখছেন :

'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রহস্যএর উপসংহার হয় না। ১৯৫১ সালে Ancient Indian History and culture-এ দুটি বোন প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়। তাঁরা প্রাইভেট ছাত্রী হিসেবে পরীক্ষা দেয়। সুবোধবাবু বলছেন : 'শোনা যায় প্রমথবাবুর আমলে Grace Marks পাইয়া তাহারা pass course-এ B. A. পাশ করেছিলো। তারাই চাকরি করতে করতে প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে পেলো ফার্স্ট ক্লাস এবং রেগুলার ষ্টুডেন্টরা কেউ সেবারে প্রথম শ্রেণী পেল না। ব্যাপারটা নিয়ে তাই য়ুনিভার্সিটি মহল চঞ্চল হলো। পরীক্ষক রমেশ মজুমদার রিপোর্ট দিলেন দুজনেরই উত্তর প্রায় একরকম হয়েছে। মেয়ে দুটির রেজাল্ট আটকে রেখে সেই সময়কার উপাচার্য এনকোয়ারি কমিটি বসালেন। কিন্তু মেয়ে দুটি পার পেয়ে গেলো। সুবোধবাবু অতঃপর লিখছেন যে, "শোনা যায় যে, ডাঃ নীহাররঞ্জন

রায় ইঁহাদের প্রাইভেট টিউটার ছিলেন এবং দেখা গেল, যে রায় মহাশয় ঐ বারে ঐ পরীক্ষার আটটি প্রশ্নপত্রেরই মডারেটার ছিলেন।" (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রহস্য : উপসংহার : পৃঃ ১৪০)।

এই বই ১৯৫১ সালের জুলাই মাসে বেরিয়েছিলো। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কেউ এর প্রতিবাদ করেনি আজ তক। এই বইতে উদ্ধৃত ওই কমিটির রিপোর্টের কয়েকটি রেকমণ্ডেশান এবার শুনুন :

"(1) In our report on the University Press we recommend that Mr. P. N. Banerjee should cease to have any connection with the University any more."

(3) Mr. Dasgupta (Mr A. P. Das Gupta, officiating Controller of examinations—ওই সময়ে) Mr. Das Gupta is mainly responsible for the present deplorable condition of his department.

(6) Mr. D. K. Sanyal, তদন্তের সময়ে ইনি ছিলেন, Secretary Appointment and information Board and social work committee.—In view of the facts stated before we recommend that Mr. Sanyal should no longer be retained in the service of the University.

এবং আরেক জায়গায় কমিটি বলছেন :

"That continued association of R. P. Mukherjee and P. N. Banerjee with the University should cease."

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রহস্য : পৃঃ ৩০)

এঁদের অনেকেই আজও বিশ্ববিদ্যালয়ে বহাল তবিয়তেই আছেন।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি উল্লেখযোগ্য কথা মনে করিয়ে দেবার আছে যে, "তদন্ত কমিটি যখন Accounts Department সম্পর্কে

গুরুতর দুর্নীতির সন্ধান পাইয়াছিলেন তখন একদিন অকস্মাৎ উক্ত Department'এ আগুন লাগিয়া পুড়িয়া যায়। তখন সংবাদপত্রে নানা ধরণের বিরূপ সমালোচনা হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃত অপরাধীদের সন্ধান পাওয়া যায় না।" (কঃ বিঃ রহস্যঃ পৃঃ ৮৯)

উপসংহারে সুবোধবাবু ঠিক বলেছেন যে, "যদি আর একটি Enquriy Committee বসে তবে এই ধরণের আরও অনেক ঘটনা যবনিকার বাহিরে আসিতে পারে। ঐরূপ একটি Enquiry Committee বসাইবার দায়িত্ব শিক্ষিত জনসাধারণের। তাঁহারা তাহাদের কর্তব্যের কথা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন"।

বৃথাই বলেছেন সুবোধবাবু, ঠিক বললেও। অন্যদের প্রতিবাদে উঠে দাঁড়ানোর শিরদাঁড়া বাঙালীর ভেঙ্গে গেছে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে এমনভাবে নির্বীর্য, নিস্ফল, নপুংসক বাঙালী আর কখনও দেখা যায়নি। যারা সব রকম অন্যায়, সরকারের, পৌরসভার, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের, মাথা পেতে নিয়েছে, তারাই আজকের বাঙ্গালী। বাঙ্গালী নয়; কাঙ্গালী। সুরেন্দ্রনাথ,—SURRENDER NOTH -এর মতো একজন বাঙালী থাকলেও হায়ার সেকেণ্ডারীর সিলেবাস কখনও চালু হতে পারতো না। মুটের মাথায় করে বয়ে নিয়ে যেতে হয় এত বই, এত খাতা; ক্লাস সেভেনে লাগছে এখন। একেকবার মনে হয় আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের মা-বাপ বুঝি নেই। অভিভাবকদের মধ্যে কি সবাই অমানুষ যে বিশ্ববিদ্যালয় এবং বোর্ড যথেচ্ছ অন্যায় চালিয়ে যেতে পারে বছরের পর বছর। কে জানে?

আট

খবর কাগজে ছাপা হয়, তাই পড়ি। ছেলেরা কি রকম ভুল উত্তর দেয় তাই নিয়ে হাসিমস্করা চোখে পড়ে। ওরা যাকে বলে হাওলার। এগুলো পড়ে আমার হাসি পায় না; দুঃখ হয়। দুঃখ হয় এই ভেবে যে, যারা এই হাস্যকর উত্তর দিয়েছে, তাদের পড়ায় কারা? এক হাতে কি তালি বাজে? যে ছেলেটি এ রকম উত্তর দেয় সে যদি পরীক্ষকের নিজের ছেলে হয়, তখনও কি হাসা যায় এমনভাবে? কেউ খোঁজ নেয় স্কুলে-কালেজে কোর্স শেষ হয় কিনা? যতগুলো লেকচার দেওয়া বিধিনির্দিষ্ট ততগুলি লেকচার প্রাক্ বিশ্ববিদ্যালয় শ্রেণীতে দেওয়া সম্ভব? সবগুলি বিষয়ের জন্যে উপযুক্ত শিক্ষক ক'টি কালেজে, ক'টি স্কুলে আছে? ছেলেরা কি খায়, কি ভাবে বাস করে, খোঁজ নেয় কেউ? হায়ার সেকেণ্ডারির সিলেবাস নিয়ে আপত্তি করবার আছে একজনও? সারাদিন স্কুল, বাড়ি ফিরে হাতমুখ ধুয়েই আবার পড়তে বসা, কারণ প্রতি সপ্তাহে পরীক্ষা। পরীক্ষার খাতা সত্যি দেখা হয়,—বুকে হাত দিয়ে বলতে পারেন কালেজের অধ্যাপকেরা? যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের খাতা ছেলেরা দেখতে পেত, তা হলে প্রতিদিন একটা না একটা মামলা লেগে থাকত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নামে।

খাতা দেখার উদ্দেশ্য কি? ভুলগুলো বুঝিয়ে দেওয়া। যাতে শেষ পরীক্ষায় সেই ভুল না করে ছেলেরা। সেভাবে খাতা দেখতে হলে এক সপ্তাহে চারশো খাতা দেখতে হয়। কালেজের এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষককে পরীক্ষার সময় পাহারোলার কাজ করতে

হয়। কেন? এটা কি শিক্ষকের কাজের মধ্যে পড়ে? যদি পড়ে, তা হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ পরীক্ষায়, এম-এ ক্লাসের অধ্যাপকরা পাহারা দেন না কেন?

ছেলেরা নীরস বক্তৃতা শুনতে চায় না, অথচ পার্সেন্টেজের ভয় আছে। তাই প্রক্সি দেয় তারা। জীবনের আরম্ভেই জোচ্চুরিতে হাতেখড়ি হয়। অথচ এমন বক্তৃতা একজনও দেয় না, খেলা-সিনেমা-আড্ডা ফেলে যার ক্লাসে ভিড় করবে ছেলেরা। যদি পার্সেন্টেজের ব্যবস্থা একবার তুলে দেওয়া হয় তা হলেই বোঝা যাবে আমার অভিযোগ কতদূর সত্য। একটি ছেলেও একজন অধ্যাপকের ক্লাসে আসবে না।

নোট বই-এর বুকে লেখকের নামের তলায় লেখা থাকে, পরীক্ষক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। কেন? পরীক্ষক কথাটা ছাপানো কি কনফিডেন্সিয়াল ব্যাপার আউট করে দেওয়া নয়? অথচ এরাই বছরে বছরে পরীক্ষক হবে। আর সামান্য ছুতোয় কিম্বা ছুতো ছাড়াই কেউ কেউ হবে না পরীক্ষক কোনও জন্মে। কেন? কারণ তারা দলের লোক নয়; নয়,—দেশের লোক।

প্রতিবার পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র কঠিন বলে ছেলেরা চেঁচাবে। গ্রেস দিতে হবে চল্লিশ নম্বর। এর চেয়ে ডিসগ্রেসফুল আর কি হতে পারে

স্কুলে ইংরেজী শেখাব না, কিন্তু কালেজে সেক্সপীয়ার পড়াব। কেন সেক্সপীয়ার সম্পর্কে বাঙলায় লিখতে পারব না, কি বুঝেছি? ইংরিজীর ভাবনাতেই, দুর্ভাবনাতেই অন্য পরীক্ষাও খারাপ হবে, তবু ইংরিজী শেখানোর ব্যাপারে স্কুলে নিদারুণ অবহেলা। এবং অভিভাবকরা প্রতিবাদশক্তিহীন।

ষ্টুডেন্টস য়ুনিয়্যন আছে। তারা মাইনে বাড়ানোর বিরুদ্ধে

বলবে, ডেভেলপমেন্ট ফি-র ব্যাপারে আপত্তি করবে, কিন্তু ভুলেও বলবে না যে, কালেজের খাতা ভালো করে দেখা হোক বা কোর্স শেষ হোক, কিম্বা সিলেবাস পরিবর্তিত হোক।

তবুও কোনও কোনও ছেলে পরীক্ষায় ভালো করে কি করে? করে,—অধ্যাপকদের সহযোগিতা সম্ভব হয় না বলেই। স্কুলে একটি ছেলে ইতিহাসে ৭৫ পেয়েছে। মাস্টার মশাই ছেলেদের বলছেন: দেখেছ, পড়া যে শোনে সে নম্বর পায়। এই যে অম্বুজ ৭৫ পেয়েছে, কেন? আমার পড়া মন দিয়ে শুনেছে। এই কথা বলে 'অম্বুজ অম্বুজ' বলে হাঁক পাড়েন মাষ্টার। অম্বুজের সাড়া পাওয়া যায় না। অনেকক্ষণ বাদে অম্বুজ উঠে দাঁড়ায়। তার কানে চোংগা। বদ্ধকালা অম্বুজ। যন্তর ছাড়া একটা কথাও শুনতে পায় না।

তবে বোঝা যায় সে কেন ৭৫ পেয়েছে। মাষ্টারের একটা কথাও কানে যায়নি তার। তাই। এ ঘটনা বানানো। গল্প। তবুও শুধুই কি বানানো? কেবলি গপ্‌পো? আপনারাই বলুন।

নয়

অরুণাভর মুখ থেকে আলো সরে গিয়েছিলো। আলো নয় ঠিক, আলোর আভা। সমস্ত সময় তার মুখে একটা আশ্চর্য খুসি ছড়িয়ে থাকে। ছবির ওপর ল্যাকারের মতো ঝকঝক করে সেই হাসিখুসি। যে দেখে সেই খুসি হয়। আশেপাশের অগুন্তি বিষণ্ন মুখের মধ্যে এই একটি মানুষের মুখ যার মধ্যে প্রাণ আছে। যাকে রোমান্টিক চেহারা বলে, অরুণাভর চেহারা ঠিক তার উল্টো। মোটা, বেঁটে। ফর্সা। কিন্তু সব মিলিয়ে এমন স্বাস্থ্যকর খুসি উপচে পড়ছে সে চোখে যে, মনে হয়, লোকটার মনের মধ্যে কি একটা পাবার আনন্দ মৌমাছির মতো সারাক্ষণ গুণ গুণ করছে। চোখ দুটো যেন সব সময়ই হাসছে আর ভালোবাসছে। যতক্ষণ তার কাছে কেউ থাকে ততক্ষণ সংক্রাসিত হয় সে খুসিতে। অরুণাভ মুখ গম্ভীর করলে তাকে এত খারাপ দেখায় যে, মনে হয় যেন কেউ প্রজাপতির পাখাকে সুতো দিয়ে বেঁধে রেখেছে। অরুণাভ নিজেও সেকথা জানে। হাজার কারণ থাকলেও তাই পারতপক্ষে কারুর সামনে মুখ গম্ভীর করে বসে না। আজ তার আর উপায় ছিলো না। বসেছিলো অসম্ভব মুখ কালো করে। থমথমে। গতানুগতিক এক্সপ্রেসানে বল। যায় ঝড়ের আগের আকাশের মতোই ভয়ঙ্কর লাগছিলো অরুণাভকে। লেখক, অধ্যাপক, কাগজের সম্পাদক, বক্তা অরুণাভ মজুমদারকে।

আজ ১০ই জানুয়ারি। গত দু'তিন দিন থেকেই তার মুখে আস্তে আস্তে মেঘ জমেছে। গত দু'তিন দিন থেকে পূর্ববঙ্গ থেকে

খবর আসছে। খারাপ খবর। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর অমানুষিক অত্যাচারের খবর। অবশ্য একটা কথা কখনই পরিষ্কার হবার নয়। অমানুষিক অত্যাচারের খবর, না, খবরের অমানুষিক অত্যাচার। সাধারণ লোকের সঙ্গে অসাধারণ লোকের এ ব্যাপারে এত ফারাক যত তফাৎ আসমান-জমীনে নয় (আবার একটা গতানুগতিক উচ্চারণ ছাড়া এ পার্থক্য বোঝানো গেল না বলে অরুণাভ দুঃখিত)। সরকার পক্ষের সঙ্গে অসাধারণ লোকদের এ ব্যাপারে অসম্ভব মিল সে লক্ষ্য করেছে। এজন্যেই নিশ্চয়ই লোকে বলে, সরকার কখন সাধারণের সরকার হয় না।

১০ জানুয়ারির সকালের কাগজে সাধারণের ভাষায় অমানুষিক অত্যাচারের খবর অথবা অসাধারণ মুখে খবরের অমানুষিক খবরের অত্যাচার পড়ে তার মুখ রীতিমতো গম্ভীর ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলো। প্রথম এবং দ্বিতীয় দিনও খবরকে তেমন গুরুত্ব দেয়নি সে। মনে করেছিলো ব্যাপারটা পূর্ববঙ্গে দেশভাগের পর থেকেই যেমন মাঝে মাঝেই ঘটেছে, আবার থেমে গেছে তারই পুনরাবৃত্তি মাত্র। আজ তার মনে হলো, ব্যাপারটা অনেক বেশী দীর্ঘস্থায়ী সম্ভাবনায় সমুজ্জ্বল। কেন এ রকম মনে হলো তার বলতে পারবে না সে। ভীষণ খারাপ কিছু ঘটতে যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গেও বলে তার বাঁ চোখের ওপরের পাতা নাচতে লাগলো। কুসংস্কার বলে তাকে উড়িয়ে দিতে পারলো না অরুণাভ। প্রত্যেক বার ভয়ঙ্কর কিছু ঘটবার আগেই তার এরকম হয়। তাই একে কুসংস্কার বলে না সে; বলে প্রিমনিশান।

কলেজে স্পেশাল বাংলার ক্লাসে পড়াতে গিয়ে পড়াতে পারলো না কিছুতেই। একটি ছাত্র বললো; পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের জবাব কি পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানদের ওপর অত্যাচার করা?

ছাত্রটির চোখে চোখ রেখে অরুণাভ জিজ্ঞেস করলো : তাহলে তোমার মতে এর জবাব কি ?

একটুও না থেমে প্রত্যুত্তর দিলো সে : পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুরা একটা আলাদা দেশের নাগরিক। তারা অত্যাচারিত হলে আমরা মানুষ হিসেবে দুঃখিত হতে পারি, কিন্তু তাদের দায়িত্ব আমাদের নয়। পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানরা এ অত্যাচারের জন্য দায়ী নয় যখন তখন তাদের ওপর অত্যাচার করা মিডিয়েভেল যুগের ধর্মান্ধতা ছাড়া কিছু নয়।

দশ

অরুণাভ মজুমদার বাড়ি ফিরে চা খেয়ে জামা-কাপড় পাল্টে এক মিনিটও বসতে পারলে না। একটি সদ্যমুক্ত অখাদ্য বাংলা ছবি দক্ষিণ কলকাতার সব চেয়ে জঘন্য প্রেক্ষাগৃহে দেখতে যাবার হাত থেকে রেহাই ছিলো না কোনওক্রমেই। ছবি দেখতে যাওয়া ইদানীং সে ছেড়েই দিয়েছিলো। সিগারেট খাওয়া বন্ধ হয়েছিলো, যেদিন থেকে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত প্রেক্ষাগৃহে ধূমপান হয়েছিলো নিষিদ্ধ। নিজের কাগজে ছবির সমালোচনা—তাও বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। ছবি দেখতে দেখতে সিগারেট খেতে ভুলে যাবার মতো ছবিও আসেনি এর মধ্যে। আজ ১০ই জানুয়ারী, তার ছবি দেখায় কেবল বিরক্তি নয়, আপত্তি ছিলো। শহরের অবস্থা প্রমোদের পটভূমি নেই আর, প্রমাদের পীঠভূমি হয়ে দাঁড়িয়েছে সেই মাত্র। তবুও। তবুও তাকে আজ ছবি দেখতে যেতেই হবে। যেতেই হবে কারণ, ছবির বিজ্ঞাপন দেবার দুর্ভাগ্য যে ভদ্রলোকের ছিলো এ ছবিতে, তিনি বাড়ি

এসে বলে গেছেন ছবি দেখতে যেতে। ভদ্রলোক বিজ্ঞাপন লাইনে নূতন। তাঁর মুখখানা ভারি করুণ দেখাচ্ছিলো। না বলতে পারেনি অরুণাভ।

প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে অরুণাভ একই সঙ্গে লজ্জিত ও গর্বিত হলো। ছবি দেখানো বন্ধ করে দিয়েছেন কর্তৃপক্ষ। দক্ষিণ কলকাতার শহরতলীতে একটি কলেজের ছাত্র পুলিশের গুলীতে মারা যাওয়ায় বিক্ষুব্ধ দক্ষিণ-জনতা দক্ষিণ কলকাতার সব কটি প্রেক্ষাগৃহের সান্ধ্য বাসর বন্ধ করাতে বাধ্য করেছে। গর্বিত হলো অরুণাভ। দক্ষিণ কলকাতা একেবারে মরে যায়নি তাহলে। লজ্জিতও হলো অরুণাভ। অরুণাভ মজুমদারের মনে হলো এ তিরস্কার তারই প্রাপ্য। কেন সে আজ ছবি দেখতে এলো। দেশে আগুন লাগলে যে বেহালা বাজায় সে নীরো। অরুণাভ তো নীরোও নয়, নেহরুও নয়। তবে?

অরুণাভ মজুমদারের বিস্মিত হবার বয়স বহুদিন পার হয়ে গেছে। তবু সে আজ মনে মনে অবাক হয় বাংলা দেশের চিত্র-সাংবাদিকদের, বিচিত্র সাংবাদিকদের ব্যবহার দেখে। যারা এলো তাদের মধ্যে একজন ছবির বিজ্ঞাপনদাতাকে রাগত স্বরে বললো: কি মশাই, ফোন করে জানাতে পারেননি যে, শো বন্ধ আছে? অরুণাভের ইচ্ছে করলো, ঠাস করে একটা চড় দেয় লোকটার গালে। একটি ছাত্র পুলিশের গুলীতে নিহত হবে, তার প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ জনতা শো বন্ধ করে দেবে, এই খবরে কোথায় খবরকাগজের লোকেরা ব্যাপারটার গুরুত্ব অনুভব করবে, তা নয়, শো বন্ধর খবর কেন দেওয়া হয়নি? তা নিয়ে অনুযোগ অরুণাভ কিছুই করলো না। করলো না কারণ, তার এক চড়ে লোকটা মাথা ঘুরে পড়ে যেত; থানা-পুলিশ করতে হতো অকারণে। একটু গলা চড়িয়ে লোকটার উদ্দেশ্যে কটূক্তি করতেই বিজ্ঞাপনদাতা ভদ্রলোক দৌড়ে এলেন। বললেন, আপনি

কিছু বললে সব ঝাল আমার ওপর ঝাড়বে। দায়ী করে কিছু বলবেন না।

কিন্তু বিস্ময়ের বাকী ছিলো আরও। শো-এর পর ডিনারের নিমন্ত্রণ ছিলো। অরুণাভ ভাবতে পারেনি, কোনও ভদ্রলোক এর পরে সে রাতে হোটেলে খানাপিনায় যেতে পারে। কিন্তু দেখা গেল প্রযোজকের গাড়িতে করে সাংবাদিকদের সানন্দে ডিনারে যেতে। অরুণাভকেও একটি খাচায় পুরে পাঠানো হলো। বাড়ির মোড়ে এসে গাড়ি থেকে নেমে গেল অরুণাভ। অরুণাভর সঙ্গে একজন লোক দিয়েছিলো ছবির বিজ্ঞাপনদাতা, যাতে অরুণাভ হোটেল পর্যন্ত যায়। তাঁর সন্দেহ ছিলো, অরুণাভ হয়ত যাবে না। সে সন্দেহ শেষ পর্যন্ত সত্য হলো।

অরুণাভ দেখলো, রাস্তায় রাস্তায় মোড়ে মোড়ে লোকের জটলা। সেই ১৯৪৬-এর কয়েকটি দিন কি আবার ফিরে এসেছে কলকাতায় আজ অন্ধকারে? না। বেশি ভাবছে অরুণাভ। এত কিছু ভয়ঙ্কর ব্যাপার নয়। ভাবতে ভাবতেই খবর এলো। একটি প্রেক্ষাগৃহের পাশে একটি দোকান লুঠ হতে সুরু করেছে। অরুণাভর মনে প্রশ্ন জাগলো। মুখ্যমন্ত্রী কলকাতায় ছিলেন না। কখন কলকাতায় এলেন তিনি? কখন গুলী চালাবার হুকুম দিলেন? এর কয়েক মাস আগে শেয়ালদায় হঠাৎ একটা উত্তেজনায় যখন কলকাতা ফাটো ফাটো হয়েছিলো, তখনও মুখ্যমন্ত্রী পুলিশকে দিয়ে গুলী চালাতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে রাশ টেনেছিলেন। এবারে এখনই এমন কি ঘটলো—যাতে. গুলী না চালিয়ে পুলিশ পারলো না? ব্যাপারটা গুজব নয়তো?

না: বাড়ি ফিরে শুনলো, আকাশ বাণী বলেছে, গুলীর খবর ঠিক:

অনেক রাত্তিরে ঘুম ভেঙ্গে গেল অরুণাভর। কলেজের সেই ছাত্রর কথা তার মনে পড়লো। পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা অন্য রাষ্ট্রের নাগরিক। তারা মারা গেলে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু বাঙালীর দুঃখ করা ছাড়া কিছু করার নেই। এই কথাই বলেছিলো সেই ছাত্রটি পূর্ববঙ্গের দাঙ্গায়—যার কোনও ক্ষতি হয়নি। কিন্তু যাদের হয়েছে, তাদের মনে প্রতিহিংসার আগুন প্রদীপ্ত হবে না,—এতটা আশা করা কি একটা হৃদয়হীন তামাসা নয়?

মুখ্যমন্ত্রীর মা-বোন-ভাই-বাবা—কেউ পূর্ববঙ্গে থাকলে তিনি কি পুলিশকে গুলী চালাতে দিতে পারতেন? অথবা পশ্চিমবঙ্গের লোককে শান্ত থাকতে উপদেশ দিতেন?

এগারো

শুক্রবার, ১০-ই জানুয়ারী, দুপুরও নয়। বেলা তখন কটা হবে, —বড়জোর বারোটা। দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ কলেজের ছেলে-মেয়ের (মিলিয়ে ২০০-র মতো) একটি দল সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছে। পূর্ববঙ্গে সংখ্যালঘু বাঙালী হিন্দুর ওপর পাশবিক অত্যাচারের প্রতিবাদে যেটুকু না করলে নয় বলে পশ্চিমবঙ্গে অপূর্ব দাওয়াই শান্তি মিছিলে যোগ দেবে বলে তৈরী হয়েছে ছাত্র-ছাত্রীরা। তারা জানত না যে শান্তির রক্ষকরা তার আগেই তৈরী হয়ে এসেছে কালেজের বাইরে। একটি ছেলেকে পুলিশ, বলা নেই কওয়া নেই, তুলে নিলো তাদের খাঁচায়। বাকী ছেলে-মেয়েরা ক্ষেপে উঠলো তৎক্ষণাৎ। কয়েকজন অধ্যাপক, অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষর হস্তক্ষেপে ক্ষেপে যাওয়ার দল তখনকার মতো শান্ত হলো। তারা শান্ত হলে কি হবে, শান্তির যারা রক্ষক তারা তো শান্তি চায় না। আরও একটি পুলিশের গাড়ি এসে দাঁড়ালো।

লাঠি বাড়ালো এবার পুলিশ। ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা বাদ গেল না কেউ লাঠির হাত থেকে। বন্দুক উঁচু করে ধরে আছে পুলিশ তখনও কলেজের দিকে। আবার শিক্ষকদের সমবেত প্রচেষ্টায় ছেলেরা ভীড় ভেঙ্গে দিয়ে চলে যায়। অবস্থা শান্ত হয়ে আসে।

পুলিশের আরও একটা ভ্যান আবার এসে দাঁড়ায়। অকারণে মারমুখী পুলিশের দল লাঠি চালায় নিরস্ত্র অধ্যাপক-ছাত্রের ওপর। কলেজের ভেতর থেকে কাউকে কাউকে টেনে বার করে য়্যারেস্ট

করাও হলো। কিন্তু তাতেও গায়ের ঝাল মিটোনো পুরো হলো না পুলিশের। লাঠি ছেড়ে বন্দুক ধরলো তারা। মাটিতে লুটিয়ে পড়লো একটি ছেলের অচৈতন্য দেহ। গুলি লেগেছে তার। দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ কলেজের গর্ব, ছেলেটির নাম ভূদেব সেন। এন সি সি'র সেরা ক্যাডেট সে। দিল্লীতে প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেডে যাবার জন্য নির্বাচিত হয়েছিলো পশ্চিমবঙ্গ থেকে।

ভূদেবকে যেভাবে গুলি মারা হয় তা হত্যা ছাড়া কিছু নয়,—বলেছেন দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ কলেজের টিচার্স কাউন্সিল। তাদের মতে: "The way in which Bhudeb was shot at, can be described as nothing short of murder." ভূদেবকে রাস্তায় ফেলে অত্যন্ত কাছ থেকে গুলি করা হয়। তারা জ্ঞানহারা দেহ নিয়ে হাসপাতালে যাবার পথে দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ কলেজের ছেলেরা পুলিশের হাতে ধৃত হয়।

অরুণাভ মজুমদার তখন তার কলেজে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্পর্কে বিতর্কে রত ছিলো একটি ছাত্রের সঙ্গে।

ভূদেবের পুলিশের গুলিতে মৃত্যুর সংবাদে প্রথম যা মনে হলো অরুণাভর তা হচ্ছে, ভূদেবের এই মৃত্যু ভুলে যেতে ছাত্রদের কদিন লাগবে। সামনে ক্রিকেট টেষ্ট, যথারীতি সেই খেলার টিকিট পাবার জন্যে লালায়িত, কাঙালীর চেয়েও অধম, আজকের বাঙালী, পূর্ববঙ্গের কথা বিস্মৃত হবে। ক্রিকেট টেষ্ট-ই হবে বাঙালী চরিত্রের। ধ্যান-জ্ঞান নুক্লিয়ার উইপন টেস্ট ব্যানের আগে ভারতবর্ষে যা ব্যান্ড্ হওয়া উচিত, তা হচ্ছে ক্রিকেট টেষ্ট। দেশে আগুন লাগলে নীরো বেহালা বাজাতে পারে, নেহরু যেতে পারে ক্রিকেট খেলা দেখতে। কিন্তু বাঙালী তার জীবন-মৃত্যু প্রশ্নের মুহূর্তে ক্রিকেট খেলা দেখতে যায় কোন মনোভাব থেকে?

এ প্রশ্ন করাই চলে, অরুণাভ জানে, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা আজকের বাঙালীর নেই। একদিন ছিলো, সেদিন ক্ষুদিরামের রক্তে রাঙা ছিলো বাঙালীর উত্তরীয়।

আর একটি প্রশ্নও অরুণাভর মনে উঠেছিলো। প্রশ্ন নয় ঠিক। একটি ফ্যাক্ট। অরুণাভর মনে হলো হঠাৎ যে, প্রফুল্ল সেনের যদি ছেলে থাকতো তাহলে তিনি পারতেন, সে পুলিশের গুলিতে মারা গেলে, শান্তির ললিতবাণী বর্ষণ করতে? তাঁর নিজের কানেই তা ব্যর্থ পরিহাস শোনাতো না? কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী চিরকুমার। তাই সে পরিহাসের হাত থেকে তিনি বেঁচে গেছেন।

অরুণাভর জিজ্ঞাসা কেবল এই যে, প্রজার পালক যিনি, তিনি সন্তানের পিতা না হলে প্রজার দুঃখ অনুভব করবেন কি করে? হেড অব দা স্টেট যদি ফ্যামিলি-হেড না হন, তাহলে তা কি কোনও প্রব্লেম নয়?

বারো

১১ই জানুয়ারী সকালের খবরকাগজে জানা গেল, দক্ষিণ সহরতলীর কলেজ-ছাত্র পুলিশ-গুলীতে মারা গেছে। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর দলের, কংগ্রেসের বাৎসরিক কাজ করে ফিরেছেন কলকাতায়। তুপুর বেলায় আকাশবাণী কলকাতা থেকে ঘোষিত হল, মিলিটারীর হাতে কলকাতাকে তুলে দেওয়া হয়েছে। না। গোটা কলকাতাকে নয়। কলকাতার উপদ্রুত কয়েকটি থানাকে। অরুণাভ মজুমদারের প্রতিবেশী মিষ্টার ভট্টাচার্য (৬৭) অরুণাভকে রেডিও শুনতে শুনতে জিজ্ঞেস করলেন: অবস্থা কি এত খারাপ হয়েছিল যে মিলিটারী ডাকতে হবে? অরুণাভ সে প্রশ্নের কোনও জবাব দিল না। ধনুক থেকে তীর, টিউব থেকে টুথপেষ্ট বেরিয়ে গেলে তা নিয়ে মাথা অথবা সময় নষ্ট করা তার স্বভাব নয়। সে বললো: কাল ভূদেব সেনকে গুলী করে, আজ মিলিটারী ডেকে সরকারই ব্যাপারটাকে ঘোরালো করে তুলছেন। কোন্ আন্দোলনকে থামা দেবার জন্যে কলকাতায় এই সন্ত্রাস-সৃষ্টি, ভেবে পেল না অরুণাভ। তার দৃঢ় সন্দেহ হল, পূর্ববঙ্গে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর অমানুষিক অত্যাচারের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া মাত্র এ নয়। অস্বাভাবিক কিছু ঘটাবার সুপরিকল্পিত রাস্তায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ব্যাপারটাকে পূর্ববঙ্গে চর নিয়ে তু'জমিদারের দাঙ্গায় এর চেয়ে অনেক বেশি হাঙ্গামা হয়, লাঠিসোটা বেরোয়, রক্ত পড়ে, আগুন লাগে। কিন্তু সেখানে মিলিটারী ডাকার কথা কখনও কারুর মাথায় আসেনি।

তখন কলকাতায় ডেঙ্গু জ্বরের পালা চলছিল। অরুণাভ এই

উপদ্রবের নামকরণ করল রাজনৈতিক ডেঙ্গু বলে। এবং ডেঙ্গুর যেমন একাধিক উপসর্গ, জ্বর, ব্যথা, পা ফোলা, রক্তপড়া, গায়ে র‍্যাশ বেরুনো, রাজনৈতিক ডেঙ্গুরও উপসর্গ একে একে দেখা দিতে লাগল ধরপাকড়, কার্ফু, ১৪৪ ধারা এক দিকে, অন্য দিকে গুজব, প্যানিক লুঠ, আগুন লাগানো দুই অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া অনিবার্য হল।

কিছু হলেই কলকাতায় প্রথম যা বন্ধ হয়, সেই স্কুল-কলেজে যাওয়া ছাত্রদের চুলোয় গেল। তার সঙ্গে সঙ্গেই ট্রাম-বাস বন্ধ হতে ঘরে ফিরতে লাগল সন্ধ্যে হবার আগেই। সন্ধ্যে ৭টায় কলকাতার চেহারা, জব চার্ণকের সুতানুটি-গোবিন্দপুরকালের ভয়ঙ্কর আরণ্যক হয়ে উঠল। কিন্তু প্রত্যেক বারই অরুণাভ লক্ষ্য করেছে, এবারেও তার ব্যতিক্রম দেখল না সে, দক্ষিণ কলকাতায়, বালিগঞ্জে, ভবানীপুরে বিশেষ করে, সবটাই একটা হুজুগ বলে মনে করে লোকেরা। 'উত্তর কলকাতায়, মধ্য কলকাতায় গোলমাল হচ্ছে, তাতে আমাদের কি ?'—এই হচ্ছে ভবানীপুর-বালিগঞ্জের মনোভাব। 'পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুরা মরলে আমাদের কি ?'—পশ্চিমবঙ্গের এই মনোভাবের মিনিয়েচার হচ্ছে কলকাতার দাঙ্গায় ভবানীপুর-বালিগঞ্জ আবিয়ার আইডিয়া। এই আইডিয়াই হিন্দু বাঙালীর মৃত্যুবীজ বহন করছে,—অরুণাভ মজুমদারের মনে তার ছায়া দীর্ঘকাল ধরে বাড়ছে।

দক্ষিণ কলকাতায় সমস্ত ব্যাপারটা একটা মজার খেলা ব'লে মনে করে লোকেরা। স্কুল-কলেজ যেতে হচ্ছে না, অফিস গিয়েই পালিয়ে আসা যাচ্ছে,…এই হচ্ছে সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে সব চেয়ে আশাপ্রদ। ঘরে ঘরে চা খেয়ে আলোয়ান গায়ে খবর-কাগজ থেকে কোট্ করা, প্রফুল্ল সেন কি করছে, অতুল্য ঘোষ চুপ কেন, বাঙালী বাঁচবে না,…ইত্যাদি আলোচনা ('যার মধ্যে আলো কম, চোনাই

বেশি')। ছেলেরা রাস্তার মোড়ে মোড়ে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে। মাথায় ঝোঁটা চুল, পরণে চোঙ্গা প্যাণ্ট, পায়ে ছুঁচলো জুতো। চা-সিগারেট চলছে; কা'র পয়সায় কে জানে। তিনটের শোতে কোন্ ছবিতে যাবে, ক্রিকেট টেষ্টের টিকিট পাওয়া যায় কি করে, সেই মেয়েটাকে ক'দিন দেখা যাচ্ছে না কেন, ইত্যাদিতে মশগুল হয়ে গেছে তারা।

দক্ষিণ কলকাতাকে দেখে মনে হয় না, কলকাতায় কিছু হয়েছে। অরুণাভ লজ্জিত হয় মনে মনে। সে ভবানীপুরে থাকে।

মিলিটারী ডাকা, ১৪৪ ধারা, কার্ফু জারি পর্যন্ত বুঝেছিল অরুণাভ। বুঝেছিল যে, কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী সেকুলার ষ্টেটের মর্যাদা রাখতে বোঝেন, মুসলিমতোষণ ও বাঙালী হিন্দু শোষণ। কিন্তু কিছুতেই যেটি তার বোধগম্য হল না, তা হচ্ছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গুলজারিলাল নন্দর কলকাতায় আসা। পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভার, সমগ্র কলকাতার বাঙালী হিন্দুর গালে এত বড় থাপ্পড় গত ১৭ বছরে আর কখনও কোন ঘটনায় পড়েছে বলে অরুণাভর মনে হল না। অরুণাভর মনে হল, ডক্টর রয় বেঁচে থাকলে, নন্দা আসা দূরে থাক, কলকাতায় আসার কথা ভাবতে কেঁপে যেত।

ডক্টর রয়ের জায়গায় প্রফুল্ল সেন মুখ্যমন্ত্রী হলে কোন কোন মূঢ় পণ্ডিত কাগজে লিখেছিল, বলেছিল যে, ডক্টর রয়ের জায়গায় তিনি বেশ ভাল কাজ চালাচ্ছেন। সেন মহাশয় তখন আম-দরবার করছিলেন, ড্যালহউসী স্কোয়ারে সাইকেল চাপছিলেন। চীনের এক থাপ্পড়ে সেন মহাশয়ের আম-দরবার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ। এখন পাকিস্তানের জন্যে দরদে আবার সেন মহাশয়ের আম-দরবার জমবে। সেই দরবারে কেবল পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘুদের প্রার্থনা শোনা হবে।

এবং সেই দরবারেরই দ্বার উদ্ঘাটন করতে নন্দার আগমন,—এইটুকুই শুধু বুঝল অরুণাভ।

তেরো

আরও দুশো বছর যদি ভারতবর্ষ পরাধীন থাকত তবুও পার্টিশান মেনে না নিত তাহলে ভারতের যা অবস্থা হত, ভারতবর্ষে বাঙালীর দুরবস্থা আজ গত ১৭ বছরে তার চেয়েও বেশি হয়েছে। গোখলে সেদিন বলেছিলেনঃ What Bengal thinks to-day India thinks to morrow: আজ গোখলে বেঁচে থাকলে বলতেনঃ Bengal suffers to-day for what India did yesterday. ১৭ বছরে মার খেয়েছে কেবল বাঙালী। হিন্দুস্তানে নয় কেবল; পাকিস্তানেও বাঙালী হচ্ছে দুয়োরাণীর পুত্র। এই দুই বঙ্গ যদি ভাগ না হতো,—ভারত ভাগ হলেও, তাহলেও বাঙালীর এ দুরবস্থা হত না। সেকথা যিনি বুঝেছিলেন, ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক সেই ধুরন্ধর ব্যবহারজীবী শরৎচন্দ্র বসুর কথাই আজ অরুণাভর সবচেয়ে বেশী করে বুকে বাজল। স্বর্গত শরৎচন্দ্র কেবল সুভাষচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন না। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী বিভাবতী ছাড়া সুভাষচন্দ্রের নেতাজী হওয়া শক্ত ছিল। শরৎচন্দ্র বসুর যা প্রাপ্য ছিলো দেশবাসীর কাছে তিনি তা পাননি। নেতাজীর গ্ল্যামারাচ্ছন্ন দেশ নেতাজীর সব চেয়ে বড় সহায় শরৎচন্দ্র বসুর দানের মর্ম উপলব্ধি করতে পারেনি কখনই। আজও বোঝেনি যে সেদিন শরৎচন্দ্র বসু যে ইউনাইটেড বেঙ্গল-এর কথা বলেছিলেন, আজ তার চেয়ে বাস্তবতর ভিত্তি দুই বঙ্গের বাঁচবার জন্যে আর একটিও নেই। নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

শরৎচন্দ্র বসু তাঁর এই দূরদর্শিতার জন্যে সেদিন নিন্দিত

হয়েছিলেন বাংলা দেশে। নন্দিত হয়েছিল তারা,—যারা বাংলা দেশকে ভাগ করে নেবার পক্ষে ছিল। শরৎচন্দ্র বসু এই প্রস্তাব নিয়ে দেখা করতে গিয়েছিলেন পাকিস্তানের জনক মহম্মদ আলী জিন্নাহর সঙ্গে। জিন্নাহ্ বুঝেছিলেন যে শরৎচন্দ্রের বক্তব্যের মধ্যেই অবাঙালী মুসলমানের নেতৃত্বের মৃত্যুবাণ। কিন্তু সে কথা বুঝতে না দেবার জন্যে দম্ভের মুখোস মুখে এঁটে মহম্মদ আলী জিন্নাহ্ বলেছিলেন: I don't discuss these things with a provincial leader. শরৎচন্দ্র বসুর বক্তব্যের মধ্যে কেবল অবাঙালী পাকিস্তানীর নেতৃত্বের নয়, অবাঙালী হিন্দুস্তানের নেতৃত্বেরও মৃত্যুবাণ আত্মগোপন করে ছিল। কংগ্রেস জানত যে অদ্য, কল্য, পরশু, দেশ স্বাধীন হবেই। অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা ইংরেজরা ঠেকাতে পারবে না আর। মণিপুরের প্রান্তরে নেতাজীর আঘাতের চেয়েও বড় কথা ছিল হিন্দু-মুসলমান ভেদ ঘুচিয়ে I. N. A. গড়া। সৈন্যদের মধ্যে যেদিন বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল সেদিনই জানত সাহেবরা যে, আর বেশিদিন নয়। এ ছাড়াও,—বিশ্ব পরিস্থিতি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অন্তিম পর্বের ভূমিকা তৈরী করছিল। তাই জাতির জনক গান্ধীর কথা অগ্রাহ্য করে বিপজ্জনক মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভাগ করা হল দেশ। যে নেতৃত্ব অবশ্যম্ভাবী ছিল নেতাজীর, তা করতলগত হল নেহেরুর। শরৎচন্দ্র বসুর সত্যভাষণ তাঁকে সাময়িক অজনপ্রিয় করল। তারপর সর্বভারতীয় নেতৃত্ব থেকে তিনি আস্তে আস্তে সরে যেতে বাধ্য হলেন। মন্ত্রিত্ব থেকে তাঁকে সরানো হল যে মুহূর্তে তাঁর প্রয়োজন ফুরল।

কিন্তু সত্য যা, তা যে কখনও মরে না তার প্রমাণ শরৎচন্দ্রের 'ইউনাইটেড বেঙ্গল' ক্রাই। সেদিন ডিক্রাই করলেও আজ বোঝা গেছে, হিন্দু ও মুসলমান বাঙ্গালীর হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানে

অপমানকর অবস্থিতির থেকে বাঁচবার পথ, 'ইউনাইটেড বেঙ্গল'—এর জন্যে সংগ্রাম। কংগ্রেস ও কম্যুনিষ্ট বাদে তৃতীয় একটি দলের নেতৃত্বে বাঙালীর হিন্দু-মুসলমান মিলিত বঙ্গের পুনরুজ্জীবন-মন্ত্র উচ্চারণ করতে হবে: WE WANT UNITED BENGAL।

পূর্ব-পাকিস্তানের মুসলমানদের বুঝতে হবে যে বাঙালী মুসলমানদের গায়ে এর পরেই হাত পড়বে। পূর্ব-পাকিস্তানে হিন্দু বাঙালী আর একজনও যখন থাকবে না তখন পশ্চিম পাকিস্তানের আক্রমণের লক্ষ্য হবে পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালী মুসলমান। এবং তাদেরও ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে আসতে হবে পশ্চিমবঙ্গে। আজ অথবা কাল।

তাই এখনই কংগ্রেস এবং কম্যুনিষ্ট বাদ দিয়ে চাই তৃতীয় একটি দল। সে দলের কাজ কেবল বাংলা দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে এখন। বাঙালীর প্রতি সর্বভারতীয় অন্যায়ের প্রতিবাদ করবার ক্ষমতা কংগ্রেস বা কম্যুনিষ্টদের নেই। তার প্রমাণ আসামে বাঙালী খেদা আন্দোলনের সময় পেয়েছি। আজ পূর্ববঙ্গে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর পাশবিক অত্যাচারের সময়েও দেখছি। এর কারণ, ভোট। আসামীকে ভোট না দিলে ভোট পাওয়া যাবে না। পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান ভোট চাই। তাই অন্যায় হোক যত বাঙালীর ওপর, দেশের চেয়ে যেহেতু দল বড় সেই হেতু বিচারের বাণীকে কাঁদতে দাও নীরবে প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে।

দলের চেয়ে দেশ বড়,—এই কথা বলবার জন্যে চাই তৃতীয় দল! ইউনাইটেড বেঙ্গল হবে এই দলের দাবী। ফিলসফি হবে: 'বাঙালী একটি স্বতন্ত্র জাতি।'

চৌদ্দ

নন্দ নয় শুধু। নিরানন্দ এই দেশের দুর্ভাগ্যের নিদারুণ দিনে এলেন জেনারেল জয়ন্ত চৌধুরী। একা রামে রক্ষা নাই সুগ্রীব দোসর, মনে মনে উচ্চারণ করলো অরুণাভ মজুমদার। জয়ন্ত চৌধুরী এসে ধমকালেন পুলিসের বড় কর্তাদের লাল বাজারের কণ্ট্রোল রুমে। ডেপুটি কমিশনারদের লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করলেন : Who are they ? তারা ডেপুটী কমিশনার শুনে বললেন, দাঙ্গার সময়ে এখানে বসে কেন তারা ? নিজের নিজের জায়গায় তারা নেই কেন ? এ সবই গুজবের উড়ো পাখায় ভর করে অরুণাভর কানে এল। তেমন গুরুত্ব দিল না তাকে সে। এমন কথাও দুষ্ট লোকে রটিয়েছে তখন যে, নন্দার মুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছে, মুক্কা মারকে মু' তোড় দেগা,—এমন অশালীন উক্তি। শোনা কথায় অরুণাভ মজুমদার কান দেয় না। কিন্তু সেকথা ওড়ানো গেল না, তা হচ্ছে, যা রটে তার কিছুটা বটে, এই জনশ্রুতি। কারণ, জনপ্রিয় পুলিশ কমিশনার দাঙ্গার দু একদিনের মধ্যেই ছুটি নিচ্ছেন বলে ঘোষিত হলো। কারণ কি এই ছুটির ? না,—পুলিশ কমিশনার শচীন্দ্রমোহন ঘোষ নাকি ক্লান্ত।

সরকার যখন আসল কথা না বলতে চান তখন এমন কথা বলেন, যাতে বোকারাও সবাই বুঝতে পারে যে, She pinches somewhere else। অরুণাভ মজুমদার—যার মত বোকা দুনিয়ায় দুটি নেই। (অরুণাভ এখনও নিজেকে সর্বাগ্রে বাঙ্গালী হিন্দু মনে করে), সেও বুঝলে যে আর যার জন্যেই পুলিস কমিশনার

ছুটি নিন এই সময়ে, ক্লান্তির জন্যে এ দুঃসময়ে ছুটি নেবার পাত্র শচীন্দ্রমোহন নন। গুরুতর মতভেদ হয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে সুনির্ঘাৎ। অরুণাভর সন্দেহ সত্য। শচীন্দ্রমোহন মসজিদগুলো সার্চ করতে চেয়েছিলেন। দাঙ্গার সময়ে মুসলমানদের কাছে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছিল, তাই তিনি চেয়েছিলেন মুসলীম জমায়েৎগুলি তল্লাস করতে। অরুণাভ মজুমদার নির্ভরতম সূত্র থেকে এ সংবাদ পেল।

জীবনের বিভিন্ন কুরুক্ষেত্রে আনাগোণা অরুণাভর ছেলেবেলা থেকে। তাদের কেউ কেউ বলেন যে, অগ্নিযুগের বাঙ্গালীদের দিন ফিরিয়ে আনতে হবে। নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। অরুণাভ হাসল। বিষণ্ণ হাসি। ক্ষুদিরাম, সত্যেন-কানাই, বিনয়-বাদল-দীনেশ যেদিন জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে ভারতের স্বাধীনতার জন্যে রুদ্ধদ্বার রাত্রি অবসানে বেরিয়েছিল এই বঙ্গে, সেদিন এই তরুণ যাত্রীদলকে সবাই নিন্দা করেছে। খুনে, গুণ্ডা, সমাজের আবর্জনা বলে। স্বয়ং কবিগুরু, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালী ব্রহ্ম-বান্ধবের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন চার অধ্যায়ের ভূমিকায়; 'রবি বাবু! আমার খুব পতন হয়েছে। যে ব্রহ্ম-বান্ধব বলেছিলেন, Remain a Bengali, Remain a Hindoo, সেই ব্রহ্ম-বান্ধব, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, বারীন, উপেন, ভবভূষণ দত্তকে (এখনও জীবিত) আজ লোকের মনে পড়ছে। তারা বলছে, ওদের মত মানুষ ছাড়া বাঙালীর দুর্ভাগ্য মোচন সম্ভব হবে না· সত্য সেলুকাস! কি বিচিত্র এই দেশ,—অরুণাভর মুখে তার বিখ্যাত মুদ্রাদোষ পুনরুচ্চারিত হয়।

এরই মধ্যে ইনতেলেকতুয়ালদের শান্তির বাণী কাগজে ছাপা হয়। স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে রয়েছে একগাদা ফিল্মষ্টারের নাম। বিখ্যাত

ফুটবল খেলোয়াড়, রেসুড়ে, ফাটকা বাজারের লোকদের নাম নেই কেন সেই তালিকায় ভেবে পেল না অরুণাভ মজুমদার। ভেবে পেল কেবল এইটুকু যে, ইনতেলেকত্-শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ঃ শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস।

একজন কেন্দ্রীয় মুসলমান মন্ত্রীও কলকাতায় ঘোরাঘুরি করছেন শুনে ছ্যাঁৎ করে উঠল অরুণাভর মন। তার বাঁ চোখের ওপর পাতা নাচতে লাগল আবার। কবীর নয়তো এই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী? হুমায়ুন কবীর? হ্যাঁ। অরুণাভর আশঙ্কাই ঠিক। তার বাঁ চোখের ওপরের পাতার নাচ কখনও ভুল বলে না। এবারও তা দুঃসময়ের সঠিক ভবিষ্যৎবাণী করল। হুমায়ুন কবীর কলকাতায় মুসলমান পল্লীতে ঘোরাঘুরি করছেন। কেন?

পনেরো

ওরা যখন অন্ধকারে
আঘাত করে বন্ধদ্বারে
চোরের মতো পালিয়ে এসে,
নকল দাঁতে করুণ হেসে
আমরা তখন এ ওর গায়
আবির ছড়াই ফাগুন বায় !

বন্য পশুর মোকাবিলায়
সহর গ্রামে এবং জিলায়,
ছিন্ন সতীর ভিন্ন দেহে
কলুষ স্পর্শ 'মা'-টির গেহে
রক্ত নদী,—অশান্ত নায়্ !
শান্ত বাণীর সান্ত্বনায়।

আমার ঘরে তখন জানি
সকাল থেকে আকাশবাণী
বলছে কেঁদে, "ছি বৎস
ও সব কথা বীভৎস ?
নেয় না কানে ভদ্রলোক ;
কীসের দুঃখ, কিসের শোক !

আসছে 'লতা' কোকিল-গলা ;
পাতলা জামা মা বগলা
দেখতে চলো 'রঞ্জি' গাঁয়
সংস্কৃতির পঞ্জিকায়
লিখবে নাকি নিজের নাম ?
("যাক্ না বাঙাল জাহান্নাম !")

রৌদ্র রুক্ষ পথের পরে
ওরা যখন লুটিয়ে পড়ে
আমরা তখন টিকিট ঘরে
ক্রিকেট খেলা সিজন ভরে
দেখব বলে দিচ্ছি কিউ
দুচোখ কালো গগল্‌স্-ভিউ।

ওরা যখন হচ্ছে সবাই,
নিজের ঘরে মুর্গী জবাই,
আয়ুব ভুট্টো দিচ্ছে জুতো :
সঙ্গে আছে চীনের গুঁতো,
আমরা তখন জাতি-বর্ণ
নির্বিশেষে কুম্ভকর্ণ।

ঘুমিয়ে আছি তক্তপোষে ;
গুপ্ত মাছি রক্তচোষে।
ঘুমিয়ে তবু 'নন্দ'-'লাল'
ডাকায় নাক সাঁঝ-সকাল।
ঘুম ভাঙায়,—কেউ আছেন ?
'আমি আছি',—ভূদেব সেন।

ষোল

জালের আড়ালে যক্ষপুরীর রাজার মতো সিগারেট নীল ধোঁয়ার আড়ালে অধ্যাপক অরুণাভ মজুমদারের মুখ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল আবার। তাঁর হাতে একখানা চিঠি। টেবিলের ওপর পড়ে আছে পাকিস্তানের ডাকঘরের ছাপমারা 'পার এভিয়নের' নীল পাতলা খাম। খামের ওপর লেখা: অধ্যাপক অরুণাভ মজুমদার, ২৭সি, চক্রবেড়ে রোড নর্থ, কলিকাতা কুড়ি। চিঠিটা পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আসা; একজন হিন্দু নাগরিকের লেখা। সেই চিঠি বলছে:

প্রিয় অরুণাভ বাবু,

"পূর্ব-পাকিস্তানের নিপীড়িত লক্ষ লক্ষ হতভাগ্য হিন্দুদের হইয়া আপনার মারফতে আমি পশ্চিমবঙ্গের ভাই-বোনেদের কাছে এই খোলা চিঠিখানা লিখিতেছি। প্রথমেই আমার পশ্চিমবঙ্গের ভাইদের কাছে একটি কথা জানাইতে চাই যে, পূর্ব পাকিস্তানে যে কিরূপ ধ্বংসকাণ্ড চলিয়াছে তাহার সামগ্রিক বিবরণ কোন অবস্থাতেই পান নাই। যে সব হতভাগ্য সব কিছু হারাইয়া কোনভাবে মাইগ্রেসান নিয়া বা চোরপথে প্রাণের ভয়ে ভারত সীমান্তে প্রবেশ করিয়াছে তাহারা আপনাদের কি বিবরণ দিয়াছে জানি না (The Statesman এবং লোকসেবক ব্যতীত কোন ভারতীয় কাগজ এখানে আসতে পায় না)। এখনো আমরা এখানে আছি এবং চোখের সম্মুখে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সব কিছু দেখিয়াছি। আমার কথা যদি বিশ্বাস করেন তবেই আমাদের আপনারা বাঁচাইতে পারেন। অতিরঞ্জিত কিছু বলিয়া উত্তেজনা বাড়াইয়া আমাদের কল্যাণ

নাই। আমরা চাই না ভারত মুসলমানরা নিগৃহীত হোক ; কিন্তু আমার মা বোনের ইজ্জৎ বাঁচাইয়া শুধু প্রাণটুকু নিয়া ভারতের মৃত্তিকাস্পর্শ করতে চাই। আমাদের সেই সুযোগটুকু আপনারা দিবেন আশা করি। এখানে আমাদের আর কোন ভবিষ্যৎ নাই।

চোখের সামনে প্রকাশ্য দিবালোকে বোনের ওপর বীভৎস অত্যাচার আমরা দেখিয়াছি। নয় মাসের গর্ভবতী মহিলাকে বিবস্ত্র করিয়া তাহার পেটের ওপর ক্রমান্বয়ে লাথি মারিয়া গর্ভপাতের কথা কোন মানুষ শুনিয়াছে কি ? একজন সুন্দরী হিন্দু মেয়ে একজন সহৃদয়া মুসলমান ভদ্রলোকের বাড়ীতে আশ্রয় পাইয়াছিলেন। রাত্রিকালে পুলিসের লোকেরা আসিয়া মুসলমান ভদ্রলোকটিকে ভয় দেখাইয়া মেয়েটাকে লুঠ করিয়া লইয়া যায় এবং তাহার উপর দল বাঁধিয়া পাশবিক অত্যাচার করে এবং অবশেষে মিলিটারী আসিয়া মেয়েটিকে উদ্ধার করে। ভদ্রলোকটি গিয়া সংবাদ দিয়াছিলেন। এমন অসংখ্য ঘটনা ঢাকা এবং নারায়ণগঞ্জে এবং আশেপাশে ঘটিয়াছে। আমি কলিকাতা আসিয়া আপনার সঙ্গে দেখা করিব এবং প্রতিটি ঘটনার বিবরণ জানাইব। আমার বর্ণিত কোন ঘটনা যদি মিথ্যা বলিয়া কেহ প্রমাণ করিতে পারে তবে আমি যে-কোন শাস্তি লইতে প্রস্তুত আছি।”

এই পর্যন্ত পড়ে, অরুণাভর এক চোখ ভরে জলে, আরেক চোখে আগুন জ্বলে। বাইরে আকাশের সূর্য দিনশেষের চিতায় জ্বলে যাচ্ছে। অরুণাভর মনে পড়ে এই পৃথিবীর রবি,—২২শে শ্রাবণের চিতায় জ্বলে যাবার আগে বলে উঠেছিলেন।...

শান্তির ললিতবাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস
বিদায় নেবার আগে তাই ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।

লোকে বলে, রবীন্দ্রনাথ কেবল নীল আলো জ্বেলে তিনতলার ঘরে রবীন্দ্রসঙ্গীত রচনা করেছেন। কেউ বলে কই, যে আমাদের কবি কেবল ফাগুনের পাড়া মাত করেন নি। আগুনের পাড়াতেও গেছেন। কেবল বিশ্বপ্রেমের কথা বলেননি, দানবের সাথে সংগ্রামের দিনে, শান্তির ললিতবাণী যে ব্যর্থ পরিহাস শোনাতে, এ কাণ্ডজ্ঞান তাঁর ছিল।

অরুণাভ আবার চিঠিতে চোখ নামাল।

সতেরো

পাকিস্তানের হিন্দু নাগরিকের খোলা চিঠির শেষ অংশে যা ছিল তা অনেক বেশি ভয়ের। মুসলমানরাই সেই রাষ্ট্রের যে শুধু হিন্দু নির্যাতনে মেতেছে তা নয়, হিন্দু মাইগ্রেশান অফিসার ভারত সরকারের পলায়নউদ্যত হিন্দুর সঙ্গে কী অমানুষিক হৃদয়হীন উদ্ধত ব্যবহার করছে, অরুণাভ মজুমদারকে লেখা এই চিঠি তার জ্বলন্ত জ্যান্ত প্রমাণ। চিঠিতে ভদ্রলোক লিখছেন, 'এখানকার ভারতীয় হাইকমিশনের লোকেরা প্রত্যহ জমায়েত হাজার হাজার নিঃসম্বল স্ত্রী-পুরুষদের সঙ্গে যে ধরণের ব্যবহার করে তাহাও কল্পনাতীত। গণ্ডগোলের পর আমার চাকরি গিয়াছে। আমার স্ত্রীর স্বর্ণালঙ্কার এক মুসলমান শুভাকাঙ্ক্ষীর নিকট জমা রাখিয়াছিলাম। বর্তমানে সে তাহা শুধু অস্বীকারই করে নাই, আমি রাষ্ট্রবিরোধী কাজে লিপ্ত এই মিথ্যা অভিযোগ আনিয়া আমাকে গ্রেপ্তার করানোর অপচেষ্টায় আছে। অলঙ্কারের আশা আমি ত্যাগ করিয়াছি, কোনপ্রকারে প্রাণটুকু লইয়া এখন ভারতে আসিতে পারিব কিনা সেই চিন্তায় আছি।

'আমি মাইগ্রেশানের দরখাস্ত করিয়াছিলাম। মাইগ্রেশান বিভাগে বহু লোক ইন্টারভিউ নেন। দোষের মধ্যে আমি ফর্সা জামাকাপড় এবং ছোট ভাইয়ের একটি নতুন সোয়েটার পরিয়া গিয়াছিলাম। অফিসার আমাকে ডাকিয়া নিয়া আমার দিকে তাকাইয়া কোন কথাবার্তা জিজ্ঞাসা করবার পূর্বেই জানাইলেন—আপনি 'এফেক্টেড' নন, আপনি মাইগ্রেশান পাইতে পারেন না।—

বলিয়াই আমার ফর্মে অভিমত লিখিতে সুরু করেন। আমি বহু দিন অপেক্ষা করিয়া অনেক কষ্টে ফর্ম যোগাড় করিয়া তারিখ পাশ করাইয়া খুবই আশা করিয়াছিলাম যে মাইগ্রেশান পাইব। তাহার এই সব কথা শুনিয়া প্রথমে আমি বিস্ময়ে ও দুঃখে কোন কথাই বলিতে পারিলাম না। পরে অনেক কষ্টে সাহস সঞ্চয় করিয়া আমার অসুবিধার এবং বিপদের কথা তাঁহাকে বলিলাম। তিনি বলিলেন আমাদের মতো শিক্ষিত ভারতে বহু আছে এবং ভারত সরকার আর বেকারের সংখ্যা বাড়াইতে চান না। যখন আমি বলিলাম যে, আমি তেমন বিশেষ কোন শিক্ষিত নই, মাত্রই ম্যাট্রিক পাশ, তিনি আমাকে ধমক দিয়া বলিলেন যে, বেশি কথা বলিলে আমার মাইগ্রেশান সার্টিফিকেট ছিঁড়িয়া জানালা দিয়া ফেলিয়া দিবেন এবং এখনই দারোয়ান ডাকিয়া আমাকে ঘাড়ে ধরিয়া বাহির করিয়া দিবেন। শেষ পর্যন্ত আমাকে বলা হইল যে, ভারতে যদি আমার কোন আত্মীয় আমার ভরণপোষণের দায়িত্ব নিয়া affidavit করিয়া পাঠান এবং তাহার nationality-এর certificate-photostat copy পাঠান তাহা হইলে আমাদের মাইগ্রেশান দিতে পারেন। বর্তমানে আমার case pending-এ রাখিয়াছেন।

শুনিয়াছিলাম এবং কাগজে ও রেডিওতে শুনিতেছি যে মাইগ্রেশান প্রথা সহজ করিয়াছে, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে বিপরীত। আপনাদের মতো যে কোন একজন নিরপেক্ষ সাংবাদিক দয়া করিয়া আসিয়া দেখিয়া যান কিভাবে সাধারণ অসহায় লোকগুলিকে তাহারা মরার ওপর খাঁড়ার ঘা দিয়া আশাহত করিয়া ফিরাইয়া দিতেছে। এই যদি মাইগ্রেশান দেওয়ার নমুনা হয় তবে পূর্বপাকিস্তানের ১০ লক্ষ হিন্দুও ভারতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। বাকী ৮০ লক্ষ

আমরা কি মুসলমান হইব? দেখিতেছি ইহা ছাড়া গতি নাই। আমাদের একান্ত অনুরোধ আপনাদের মতো একজন নিরপেক্ষ সাংবাদিক পাকিস্তানে আসিয়া নিজের চোখে আমাদের করুণ অবস্থা দেখিয়া যান। আমরা আজ সব কিছু হারাইয়া শুধু ভিক্ষুকেই পরিণত হই নাই আজ আমাদের মা-বোনেরা লজ্জা নিবারণ করিবার মতো নিরাপদ আশ্রয়টুকু হারাইয়াছে। আপনারা দেখিয়া যান, নতুবা বিশ্বাস করিতে পারিবেন না। আমার ও পরিবারের নিরাপত্তার প্রয়োজনে নাম গোপন রাখিতে বাধ্য হইলাম। আমি বোধ হয় এপ্রিল মাসে কলিকাতা আসিব। আসিয়া অবশ্যই আপনার সঙ্গে দেখা করিব। প্রীতি জানিবেন। ইতি—

পূর্ব পাকিস্তানের একজন হিন্দু নাগরিক।

চিঠিটা অরুণাভ মজুমদার পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার ফরোয়ার্ড ব্লকের ডাঃ কানাই ভট্টাচার্যকে দিয়ে পড়ালো। মুখ্যমন্ত্রী চিঠিটা চেয়ে নিলেন। অরুণাভ দর্শকাসন থেকে দেখল মুখ্যমন্ত্রী আগাপাশতলা চিঠিটা পড়ছে না কিন্তু কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টিতে ওই চিঠির আসল অর্থ ধরা পড়বে কী?

আঠারো

আমার নাম,—মমতা পাল,—১৪ বছরের মেয়ে বলছে বিধান-সভার সদস্যর কাছে কী ভাবে তাকে পশ্চিমবংগের পুলিশ ধর্ষণ করেছে। সে বলছেঃ আমার নাম মমতা পাল। আমার বয়স ১৪ বৎসর। আমি ঠাকুরনগর স্কুলে ক্লাস সিক্‌সে পড়ি। আমার পিতার নাম শ্রীকিরণচন্দ্র পাল। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টার সময় আমি ও শ্রীমতী সুমতি বিশ্বাস তাহার ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া ছিলাম, আর সবাই পলাইয়া যায়। তখন কয়েকজন কনেস্টবল আসিয়া আমাদের দরজা খুলিতে বলে। দরজা খুলিয়া না দেওয়ায় তাহারা লাথি মারিয়া দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলে। আমাকে জোর করিয়া টানিয়া বাহিরে লইয়া যায়। পাশেই ঢেঁকিঘর, আমাকে লইয়া যায় এবং আমার পরণের প্যাণ্ট জোর করিয়া খুলিয়া ফেলে। একজন কনস্টেবল আমাকে জোর করিয়া চাপিয়া ধরে, অন্য জন আমার উপর বলাৎকার করে। তারপর যে কনস্টেবল আমার হাত চাপিয়া ধরিয়াছিল সেও বলাৎকার করে এবং অন্য কনস্টেবল তখন আমাকে ধরিয়া রাখে। অসহ্য যন্ত্রণা বোধ করি এবং ঐ স্থান হইতে রক্তপাত হয়। শ্রীমতী বিশ্বাসের উপরও তারপর ৩ জন কনস্টেবল বলাৎকার করে।

মমতা পাল কনস্টেবলদের মধ্যে কয়েকজনের নামও বলেছিল।

বিধানসভায় এটি পেশ করবার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন, মমতা পালের লেখা আরেকটি পাণ্টা চিঠি পেশ করেন। তাতে মমতা পাল লিখছেঃ গত শনিবার তিনজন লোক ও একজন

মেয়েছেলে আসিয়াছিল। সেইদিন ১৯-২-৪৪ দুপুরবেলা তাহারা একখানা কাগজ আমাকে সই করিয়ে নেয়। ঐ কাগজে কি ছিল আমি জানিনা। কাগজের লেখা কেহ পড়িয়া শোনায় নাই।

পরবর্তী অধিবেশনে দর্শন-আসনে মমতা পাল এবং তার বাবা কিরণচন্দ্র পালকে দেখা গেল বিধানসভাকক্ষে। ছুঁচ পড়লে শোনা এমন নিস্তব্ধতার মধ্যে মমতা পালের তিন নম্বর চিঠি পড়া হল। মমতা পাল লিখছে বিধানসভার মাননীয় সদস্য অপূর্বলাল মজুমদার ও তাঁর সঙ্গীদের লক্ষ্য করে :

"আপনারা খোঁজ খবর লইয়া আমাদের কাছে আসিয়া সমস্ত জিজ্ঞাসা করিয়া আমাদের অর্থাৎ আমার ও কাকীমা সুমতি বিশ্বাসের উপর পুলিশ যে অত্যাচার ও বলাৎকার করিয়াছিল তাহার ঘটনা আমার কথামত লিখিয়া লইয়া আমার সই লইয়া যান এবং বলেন যে বিধানসভায় বলিবেন এবং প্রতিকার করিবেন। পরে পুলিশ আসিয়া ভয় দেখাইয়া প্রলোভন দিয়া এবং নানাভাবে উত্তক্ত করিয়া জোর জবরদস্তি করিয়া ধরিয়া লইয়া যাইবে বলিয়া ১৮ই এবং ১৯শে ফেব্রুয়ারি সাহেব বড়বাবু এবং অন্যান্য পুলিশ আমাকে এবং বাবাকে মিথ্যা কথা লিখাইয়া লইয়া যায়। এখন রোজ এমনভাবে ভয় দেখাইতেছে যে আমরা অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া কলকাতায় চলিয়া আসিয়াছি।···দুইজন পুলিশ ঘটনার দিন আমার উপর এবং কাকীমার উপর তিনজন পুলিশ বলাৎকার করিয়াছে ইহা সত্য। পাড়ার সকলে জানে···। আমি এই জঘন্য পুলিশদের শাস্তি চাই···।

এই পশ্চিমবঙ্গে,—পূর্ববঙ্গের হিন্দু নাগরিক পালিয়ে এসে বাঁচবে মনে করছে,—মনে মনে শঙ্কিত হয় অরুণাভ। পশ্চিমবঙ্গ থেকেও হিন্দুদের না পালিয়ে যেতে হয় শেষ পর্যন্ত সংখ্যালঘু আর পুলিশের অত্যাচারে—এই তার ভয়।

মমতা পালের চোখের জলে ধুয়ে যাওয়া চিঠির অক্ষর থেকে চোখ তুলল অরুণাভ চৌধুরী। যাঁর ছবির দিকে তার চোখ গিয়ে পড়ল ২৫শে বৈশাখ তাঁর জন্মদিন। মনে পড়লো আরেকটি ২৫শে বৈশাখ সমাগত। বাঙালী আবার সারা বছর বিস্মৃত রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে সাম্বৎসরিক হুজুগে মাতবে। রবীন্দ্রনাথ এই দিনটির কথা অনুমান করেই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন ঃ

সভাপতি থাকুন বাসায়
কাটান সময় তাসে পাশায়
নাইবা হোলো নানা ভাষায়
আহা, উহু, ওহো !···

২৫শে বৈশাখের কবির সতর্কবাণী উপেক্ষা করেই ২৫শে বৈশাখের হুজুগে মাতবে বাঙালী, অরুণাভ তা জানে। তা মাতুক। কিন্তু এই হুজুগে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে নতুন করে সেই পুরোণো ভুলের পুনরাবৃত্তি করবে অধ্যাপক থেকে সুরু করে ম্যাজিসিয়ান পর্যন্ত যে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপ্রেমিক, তাঁর চিন্তায় ন্যারো ন্যাশনালিসম অর্থাৎ বাংলাদেশের কথা ঠাঁই পেতো না, এই রবীন্দ্র-জীবনবিরোধী উক্তি পুনরুক্তিতে সত্য হয়ে উঠবে, এই ভয়ই অরুণাভকে আতঙ্কিত করে। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপ্রেম যে নিঃস্বপ্রেম ছিলো না, একথা অরুণাভ কাকে বোঝায়।

বাঙালী মা, বোন, বউদের ওপর পূর্ববঙ্গে অমানুষিক অত্যাচারের মুহূর্তে তিনি যে চুপ করে থাকতেন না, যেমন ছিলেন না বঙ্গভঙ্গের দিনে, যেমন ছিলেন না জালিয়ানওয়ালাবাগে ব্রিটিশ অত্যাচারের বর্বরতার দুর্দিনে। আজও তাঁর কলমে উচ্চারিত হতো ঃ

নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে
বিষাক্ত নিঃশ্বাস

শান্তির ললিতবাণী শোনাইবে
ব্যর্থ পরিহাস।
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।

রবীন্দ্রনাথকে কি ভুল ভাবে সাধারণ লোকের কাছে অসাধারণ লোকেরা উপস্থিত করেছে এতকাল যে অরুণাভর কাছে তা মৃত্যু-যন্ত্রণার তুল্য মনে হয়। মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ বেঁচে নেই তাই রক্ষে। নাহলে তিনি কেবল শান্তির দূত, বিশ্বপ্রেমিক, তিনতলার ঘরে নীল আলো জ্বেলে গান লেখাই তাঁর একমাত্র কাজ এই শুনতে শুনতেই তাঁর মৃত্যু হতো।

রবীন্দ্র-রচনা যে জীবনের প্রতি মুহূর্তে কাজে লাগাবার, ও যে কেবল সাজিয়ে রাখবার পুতুল নয়, প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদার মুহূর্তে মানুষের হাতে মহত্তম হাতিয়ার—একথা যে বোঝে কেবল সেই সে রবীন্দ্রনাথের পাঠক হতে পারে সেকথা বলা যাবে না। বলা যাবে না, কারণ শ্রীরামকৃষ্ণের মতো রবীন্দ্রনাথও আজ কয়েকজনের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তিতে পরিণত।

রবীন্দ্রনাথ যে কেবল শান্তির কথা বলেন নি, যুদ্ধের কথাও বলেছেন, সেকথা বলা অরণ্যে রোদন মাত্র। স্বয়ং ঈশ্বরকে প্রশ্ন করেছেন, 'যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু',—তুমি তাদের ভালোবেসেছ কি না; দুর্দিনের অশ্রুজলধারা মস্তকে যখন ঝরে পড়বে তখনও বীর এগুবে, মৃত্যুর গর্জনকে সে শুনবে সঙ্গীতের মতো —একথা আর কার? রবীন্দ্রনাথ যে পড়েনি সেই বলে, রবীন্দ্রনাথ

মানে ললিত কণ্ঠস্বর; রবীন্দ্রনাথ যে পড়েছে সে জানে; রবীন্দ্রনাথ মানে সেই পুরুষ যে বলতে পারে, 'তোমার কাছে আরাম চেয়ে পেলাম শুধু লজ্জা, এবার আমার অঙ্গ ছেয়ে পরাও রণসজ্জা।'

এই রবীন্দ্রনাথের কাছে একবার আলিপুর বোমার মামলার আসামী, বিপ্লবী, নির্বাসিতের আত্মকথার লেখক, দৈনিক বসুমতীর স্বর্গত সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গেছেন। ঘরে অনেক লোক। কবি তখন বাঙালীদের পরশ্রীকাতরতার এবং অন্যান্য বহুবিধ ত্রুটির নির্মম সমালোচনা করছিলেন। উপেন্দ্রনাথ সব শুনে বললেন: একটা কথা বলতে চাই। সভয়ে না নির্ভয়ে বলব? কবি হেসে অভয় দিলেন: দ্বীপান্তর-ফেরৎ লোকের প্রাণে আবার ভয় আছে জানতাম না তো। উপেন্দ্রনাথ বললেন; বাঙালী-চরিত্রের বহু ত্রুটির কথা বললেন; এখন বলুন তো মৃত্যুর পর আপনি যদি ধরাধামে অবতীর্ণ হন তাহলে কী হয়ে জন্মাতে চান? পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী, ওড়িয়া, মারাঠী, আসামী, গুজরাতি, হিন্দুস্থানী না বাঙালী?

একটু চুপ করে থেকে রবীন্দ্রনাথ উত্তর দেন: জানো উপেন—যৌবনে একটা গান লিখেছিলাম, মেনেছি হার মেনেছি।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি,—একথা ঠিক। কিন্তু তার চেয়েও যা ঠিক তা হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ বাঙলার সবচেয়ে বাঙালী কবি।

এবং এই হচ্ছে অরুণাভর রবীন্দ্রনাথ। অরুণাভর,—একার।

উনিশ

পথের পাঁচালী নয় ; রাজপথের পাঁচালী। কলকাতার রাজপথ। এখানে একটি ধানের শিষের ওপর একটি শিশিরবিন্দু দেখার আশা তামাসা মাত্র। এখানে বরং একটি ধেনোর শিশির ওপরে একটি 'দিশির লেবেল দেখতে পাবেন এদিক ওদিক সন্ধ্যে হতে না হতে। কিংবা দিবালোকেই খালি চোখেই। যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধ্যা হয় না এখানে। বাঘমার্কা বাসের তলায় চাপা পড়ার ভয় যেখানে বিজ্ঞাপন লটকানো : সন্ধ্যা রায়। এখানে ক'টি লোকের 'এয়ারকণ্ডিশান' ; আর প্রায় কোটি লোকের হেয়ারকণ্ডিশান' অর্থাৎ চুল সম্বল শুয়ে আছে নীল আকাশের নীচে, চট, কাগজ, নেকড়া বিছিয়ে পেভমেন্টের ওপর। বিদেশী সাংবাদিক নির্খচায় তার ছবি তুলছে। কখনও জলছবি, কখনও জালছবি। হ্যাংগেন এমনই একজন 'সং'-বাদিক যিনি তাঁর রসাল ভবিষ্যদ্বাণী, After Nehru, Who ?,-তে কলকাতার ওপর মন্তব্য করেছেন : 'And he (Karl Marx) certainly never saw anything like the nightmare city of Calcutta, where the pavements are the biggest housing project।

বহু যুগের ওপার থেকে হঠাৎ যদি ডি, এল রায়ের আলেকজেণ্ডার এই জেণ্ডারলেস শহরে হাজির হতে পারতেন তাহলে তাঁর মুখ দিয়ে বেরুতো : সত্য সেলুকাস, কি বিচিত্র এই শহর ! যে দিকে তাকাও, আলোক নেই, শুধু লোক। বাসে, ট্রামে, ট্রাকে, ট্যাক্সিতে, জলসায়, মালশায়, মোটর কারে, পার্কে, বাড়িতে হাঁড়িতে, শিকেয় ঝুলছে

মানুষ! বাসে-ট্রামে অলিখিত নির্দেশ : ৩২ জন বসিবেক, ৬৪ জন দাঁড়াইবেক, ১২৮ জন বাঁকিয়া দাঁড়াইবেক, ২৫৬ জন ঝুলিবেক। এরপর, কয়েক বছর অতঃপর দেখবেন, বাড়িতে কারখানার মতো শিফ্‌ট ডিউটি চালু হয়েছে। অর্থাৎ তিনটে থেকে ছটা একদল বাড়িতে থাকবে আরেকদল বাইরে; ছটা থেকে নটা বাইরে যারা ছিলো তারা ঘরে এবং ঘরে ছিলো যারা, তারা বাইরে। যারা ঘরেও নয় পারেও নয় সন্ধ্যেবেলায় কে ডেকে নেয় 'তারে' দেখবার জন্যে হাফগেরস্ত যারা তারা দাঁড়িয়ে ল্যাম্পপোস্টের তলায়। আলোর নীচেই যে সব চেয়ে অন্ধকার। সেখানে গাড়ি এসে দাঁড়ায় তাদের ওই হাফগেরস্তকে সোনার তরীতে তুলে নিয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরুবার জন্যে। এবং বলবার জন্যে : 'আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী'। বলো কোন পার ভেড়াব আমার সোনার গাড়ি!

কলকাতার রাজপথে ৩-৬-৯-এর ননস্টপ এনটারটেইনমেণ্টের, এনতার এন্‌টারটেইনমেণ্টের মওকা ছেড়ে লোকে কোন দুঃখে ছবিঘরে যায় জলছবি, জালছবি, সম্পূর্ণ অবাস্তবতায় পূর্ণ উজ্জ্বল ছবি দেখতে এবং দেখাতে বুঝি না।

কেবল বুঝি, যে, সবার ওপর মানুষ সত্য তাহার উপর নাই,—একথা সত্য। মেয়েমানুষের দিকে তাকান, ফিল্মস্টারের ছবির দিকেও, দেখবেন জামা এত ছোটো যে বুকের তলা থেকে কোমরের ওপর পর্যন্ত সব খালি। খালি নাভি 'নাই', অর্থাৎ নাভিদেশ দেখা যাচ্ছে। প্রমাণ করবে, সবার উপরে মানুষ সত্য নয়। সত্য মেয়েমানুষ। মেয়েমানুষের চেয়েও সত্য—'নাই'।

চাল, ডাল, তেল, চিনি, মাছ, যেদিকে চোখ দিন, দেখবেন লটকানো আছে,—'নাই'। বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা। বাঘমার্কা

সরকার ছুঁলে কত ঘা কে বলবে। সরকার যেই বললে, এবার চাল পাওয়া যাবে, সেই চাল উধাও। পি, সি, সোরকার-এর চেয়ে এ সরকার, এও আরেক পিসিরই সরকারই বটে, ভ্যানিস করবার কায়দা জানে। টাকাকড়ি, তেল, নুন, লকড়ি সব উড়িয়ে দেবার এই জাদু প্রদর্শনী। দ্য গ্রেটেষ্ট শো অন আর্থ, ছেড়ে কোন দুঃখে ন্যু এম্পায়ারে দশটাকার টিকিট কেটে ম্যাজিক দেখতে চায় লোকে, বুঝিনে!

ধনধান্যপুষ্প ভরা নয়। ধেনোধন্য বাষ্প ভরা! এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি! সকল দেশের রানী নয়; সকল দেশের কেরাণীর জন্মভূমি এই কলকাতা! দশটা-পাঁচটার প্রহসনে আমরা সবাই য়্যাকটার। একমাত্র দর্শক স্বচ্ছ ইতিহাস। রচয়িতা কংগ্রেস। ফুটনোট,—কম্যুনিষ্ট পার্টি অভ ইণ্ডিয়া। প্রহসনের মধ্যে ট্রাজিক রিলিফ,—বামপন্থী আন্দোলন। -ব মিলিয়ে,— ইট্‌স্ এ টেল টোল্‌ড্ বাই এন্ ইডিয়েট!

কুড়ি

মানুষ, গরু এবং গাধায়
মড়ার মতো গাদায় গাদায়
ডাঙায় জলে খানায় কাদায়
আর কোথায় ?—শেয়ালদায় !

শেয়ালদা নয়, শালদা। সত্যিই তাই। শাল দেয় সব চেয়ে মোক্ষম, সবচেয়ে বিশাল শাল দেয় ওই শেয়ালদায়। রাজপথের পাঁচালী সুরু হোক তবে শেয়ালদা থেকে। অয়মারম্ভ অশুভায় ভবতু। মংগলাচরণ নয়, অমঙ্গলাচরণ উচ্চারণ করি।

লেখা আছে হালখাতায়
মহাকালের, লাল পাতায়
হাসায় কাঁদায় নাচায় মাতায়
এমন করে আর কোথায় ?
—কলকাতায় !

কলকাতা কেবল দুঃস্বপ্নের নগরী নয়, নয় কেবল—চাল, ডাল, তেল, চিনি, কয়লায় কালো বাজারীর, ঝোঁটা চুল, চোংগা প্যাণ্ট, টপলেস বটমলেস তরুণ-তরুণীর ফ্রাসট্রেসানের কলিতীর্থ নয় কিছুতেই। কলকাতা শুধু আরেকটি নগর মাত্র নয়; একমাত্র অজগর, সে ফুঁসছে, ফণা তুলছে, দুলছে, আছড়ে পড়বার জন্যে আর একবার প্রমাণ করতে কলকাতা আজ যা ভাবে, তাই ভাবায় আগামীকাল ভারতের দুর্ভাগ্যবিধাতা, বহু গাঢ়োলের কীর্তিতে কালো

কংগ্রেসকে। কং [গ্রে] সকে বধিবে যে সে বৃন্দাবনে নয়, সে বাড়ছে, ভারতের নববৃন্দাবন,—কলকাতায়!

তাই কলকাতার মুখেই শুধু শুনি :

অশোক-অতুল-ফুল্ল শ্যেন
হঠায় মোদের কেউ আছেন?

—এ জিজ্ঞাসার উত্তরে কেবল কলকাতাই বলতে পারে : 'আমি আছি,—ভূদেব সেন।'

রকের নরকে যাদের দেখে এলেন শিস দিচ্ছে মেয়ে দেখে, চেয়ে দেখুন আরেকটু বাদেই তারা লক্ষ কণ্ঠে গাইছে গান। গান নয়, মেসিনগান :

আর না!
গরু বাছুরের কান্না।
দুমুঠো ভাতের জন্য
আমরা করব মা-বউ-বোনেরে পণ্য,
তোমরা লুটবে হীরে-জহরৎ পান্না,
আর না!

অথর্ব যত অতিকায়
পুড়ে ছাই হবে লংকায়
সেই ধ্বংসের ওপরে যে হবে নতুন কালের পত্তন
যতই করনা প্রাণপণ
জেনো নিশ্চয় জিতব এবার হার না,—
আর না!
যদি মরে থাকি হাজারে লাখে
পথের বাঁকে,

জন্মাই ফের কোটিতে-অযুতে
রক্তবীজের ঝাড় রাখি পুঁতে,
মার খেয়ে মরি। শুধু শুধু আর মার না,—
আর না!

কলকাতা শোভাযাত্রার সহর বলেছে কে? এর মধ্যে যাত্রা, থিয়েটার, সিনেমা, পাঁচালী, খেউড়, আখড়াই সব পাবেন। কলকাতার শোভা মানুষের জয়যাত্রায়! আজকের কথা বলছি না। এদেশ যখন মোসাহেবদের হাতে আসেনি, সাহেবদের হাতে ছিলো, তখন শুনেছি এই গল্প, কার লেখা তার নাম মনে নেই কিন্তু সেই রসিক লোকটিকে কোটি কোটি প্রণাম। তিনি লিখেছেন যে মিছিল বেরিয়েছে পরাধীন কলকাতায়। তাদের মুখে শ্লোগান হচ্ছে, একবার একদল বলবে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক। সঙ্গে সঙ্গে আরেকদল হাঁকবে, কংগ্রেস জিন্দাবাদ! মিছিল এত লম্বা হয়ে এত বেঁকে গেছে যে একদল আরেকদলের শ্লোগান শুনতে পারছে না। ফলে, এদল যখন বলছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, তখন ওদল বলে উঠছে, জিন্দাবাদ! ওদল যখন হাঁকছে কংগ্রেস, তখন এদল প্রতিধ্বনি দিচ্ছে, ধ্বংস হোক!

সেদিনকার সেই ভুল আজ কলকাতায় ফুল হয়ে ফুটতে চলেছে: কংগ্রেস ধ্বংস হোক! ভারতবর্ষের সব সহরকে কংগ্রেস পারবে বোকা বানাতে। fool করতে পারবে না কেবল কলকাতাকে। কারণ, ফুল ছাড়াই সে বিউটিফুল!

একুশ

হাওড়া আর 'শেয়ালদা স্টেশান, কলকাতার সূয়ো ও দুয়োরাণীর পুত্র। দিল্লী থেকে কলকাতা ততদূর নয়, যত দূরত্ব এই দুই স্টেশনে। হাওড়া স্টেশান হচ্ছে বাংলা দেশে অবাঙালী। দুধেভাতে আছে তারাই। শেয়ালদা স্টেশান হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে সব চেয়ে নিন্দিত, বাঙলাদেশে বাঙাল। অবাঙালীরা লাথি ঝাঁটা মারছে বাঙালীকে বাংলা দেশে বসে। বাঙালী সেই রাগ ঝাড়ছে বাঙালদের ওপর। অফিসে বড়বাবুর বকুনি খেয়ে ঘরে ফিরে বউয়ের ওপর মেজাজ দেখানোর মতোই এ ঘটনা নিত্যদিনের। ঘটি আর বাঙাল এই পৃথকাস্ত্রের সেন্স, ননসেন্স প্রতিপন্ন না হওয়া পর্যন্ত বাঁচার আশা তামাসা মাত্র। এই সাম্প্রতিকতম দুর্ঘটনার সময়েও, পূর্ববঙ্গে নূতন করে হিন্দু নির্যাতনের দিনেও, দুদিনেও শুনেছি, 'শালা বাঙালরাই যত দুর্গতির মূলে'। এই চিন্তাই সমূলে বিনষ্ট করবে এই জাতকে— এই বজ্জাতকে যারা একদা বাঙালী ছিলো, এখন কাঙালীতে পরিণত!

রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে আজ নিজের হাতে নিজের লেখা সেই লাইনটি কেটে দিতেন। সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালী করে মানুষ করনি ;—আজকে সংশোধিত হয়ে তাঁর হাতে হতো : সাত কোটি সন্তানেরে যে ক্রুদ্ধ জননি, মানুষ করেছ হায়, বাঙালী করনি। মানুষ হতে গিয়ে সাত কোটি সাড়ে তিন কোটিতে ঠেকেছে। এখনও, এখনই বাঙালী না হতে পারলে, এক কোটি নয়, একটি বাঙালীও আর টিকবে কিনা সন্দেহ।

হাওড়ামুখো হব না আমরা! শেয়ালদামুখো হই এবার। হাওড়া দিয়ে বাঙালীর টাকা অবাঙালীর দেশে চলে যায়। শেয়ালদায় আসে পূর্ববঙ্গ থেকে অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয়হারা বাঙালী। শেয়ালদায় আসে আসামী কর্তৃক ধর্ষিত বঙ্গ-রমণী। যেহেতু এই রমণীরা বগলকাটা বুকফাটা ব্লাউজ পরে ইডেনে এল বি ডব্লু হলে কেউ আইসক্রিম চুষতে চুষতে জিজ্ঞেস করে না, কে ক্যাচ করলে ভাই, সেই হেতু এই ধর্ষিতারা যে আমাদেরই মা-বোন, আমাদেরই আপন, সেকথা আমাদের মনে থাকে না।

মনে থাকলে, আসামী কর্তৃক বঙ্গ-রমণী ধর্ষিত হবার পর নেহরু যখন বললেন, 'আসামীরা দারুণ ভদ্রলোক',একজন বাঙালীও অন্ততঃ বলবার চেষ্টা করতো, যে, আপনার কন্যা ইন্দিরা ধর্ষিত হলে, তখনও কি বলতে পারতেন, 'আসামীরা দারুণ ভদ্রলোক'!

আসামে বঙ্গরমণী ধর্ষণের প্রতিকার হয়নি। প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কেঁদেছে। মনে হয়েছে সমস্ত অপরাধ বুঝি স্বাধীন ভারতে বাঙালী হয়ে জন্মানোই। মনে পড়ছে বহুবার শোনা সেই গল্প।

বাড়ির বড় বউকে ধরে নিয়ে গিয়ে পাশবিক অত্যাচার করেছে, বাড়ির সামনের বটগাছ তলায়, বাড়ির পুরোনো চাকর হরি। বড় ভাই তখন বিদেশে। ছোটো ভাই, বড় ভাইকে সব ঘটনা জানিয়ে, জানতে চায় চিঠিতে, যে অতঃপর কী করা উচিত। বড় ভাইয়ের পত্র আসে, পত্রপাঠ উত্তর আসে। বড় ভাই লিখেছে, দেখো, বাড়ির বড় বউ যখন, তখন ওকে কিছু বলা যাবে না। হরি,—পুরোনো লোক, ওকেও কিছু বোলো না। বরং পারো যদি তো বট গাছটা কেটে ফেলো।

ভারতবর্ষের বুক থেকে বাঙালী নামক এই বট গাছকে কেটে

ফেললেই ল্যাঠা চুকে যায়, এই যেন বড় ভাই কংগ্রেসের নির্দেশ ছোট ভাই কম্যুনিষ্টকে।

এ গল্প স্থূল। কিন্তু স্থূল গল্পই হলুস্থূল আনতে পারত যদি বাংলা দেশের চেহারা বাঙালীর চোখে পড়ত আজ, কংগ্রেস ও কম্যুনিষ্ট প্রেমে কানা বাঙালীর। বাংলা দেশের সেই চেহারা দেখা যাবে কেবল শেয়ালদায়।

সেখানে পূর্ব পাকিস্তান থেকে মুণ্ডুহীন বাঙালীর ধড় এসে পৌঁছয় ট্রেনে। যারা নিহত আত্মীয়র সন্ধানে যায়, তারা হচ্ছে কয়েকটি ধড়হীন মুণ্ডু। এসেম্বলিতে, পার্লামেণ্টে, বক্তৃতামঞ্চে, খবর কাগজের পাতায় তারা ধড়ফড় করে, বাঙালী বাঁচলো কি মরলো সে চিন্তায় নয়, তাদের বক্তৃতার রিপোর্ট, তাদের ছবি সুদ্ধ কাগজে উঠলো কি না সেই চিন্তায়!

এ জাতকে, এ বজ্জাতকে চিনতে হলে যেতে হবে শেয়ালদায় আর হাওড়ায়। দুয়োরানী ও সুয়োরাণীর দুয়োরে কলকাতার কাহিনী হচ্ছে আসলে এ টেল অফ টু স্টেশানস্!

বাইশ

আমরা যে স্বাধীন হয়েছি তা বুঝতে হলে শেয়ালদায় যেতে হবে। বিদেশী মাননীয় অতিথিরা যখন দুঃস্বপ্নের আর শোভাযাত্রার এই নগরীতে পদার্পণ করেন তখন তারা সাহেবদের আর মোসাহেবদের আমলের কোনও পার্থক্য কদাচ ধরতে পারেন। দমদম থেকে পিচ ঢালা রাস্তা দিয়ে ওঠেন রাজভবনের ঢালাও ব্যবস্থার মধ্যে। সেখানে লোকসঙ্গীতের নামে স্ত্রীলোক-সঙ্গীত শুনে, শিবপুরে বোটানিক্যাল গার্ডেন দেখে, ব্যারাকপুরে গান্ধী ঘাটে মালা দিয়ে, আবার উড়ে যান যেমন উড়ে এসেছিলেন চব্বিশ কি আটচল্লিশ কি বাহাত্তর ঘণ্টা আগে। তাঁদের হচ্ছে: 'হাইলিভিং, PLANE থিংকিং।' কিন্তু স্বাধীন হবার পর India that is Bharat কী হয়েছে তা দেখতে হলে চাই একবার শেয়ালদায় যাওয়া। এখানে অবাধ স্বাধীনতা। রেলযাত্রীর এবং রেল কর্তৃপক্ষের কারুর, কারুর কাছে অধীনতার বালাই নেই।

ট্রেন ছাড়বার যখন খুসি স্বাধীনতা আছে কর্তৃপক্ষের। সেই ট্রেন চেন টেনে থামাবার স্বাধীনতা যাত্রীদের। যেখানে একজন লোকের গাড়ি থামলে সুবিধে হয় সেখানে হাজার হাজার লোকের অসুবিধে করেও চেন টেনে ট্রেন থামাও যদি গাড়ি থামার জায়গা হয় একটু দূরে। ট্রেন ছাড়বার নয় শুধু, ট্রেন আসবার টাইমেরও বালাই ঘুচে গেছে। দুঘণ্টার পথ এখন সাড়ে তিনঘণ্টা সময় পেয়েও ট্রেন আর একঘণ্টা লেট। যেখানে থামবার কথা সেখানে তো বটেই, যেখানে থামবার কথা নয় সেখানেও থামা চাই। ইলেকট্রিফিকেশনের

দোহাই কখনও, কখনও লাইন ক্লিয়ার না পাবার জন্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাই তোলা। সব জায়গা নিরাপদে পার হলেও স্টেশনে ঢোকবার ঠিক মুখেই গাদার মুখে একবার দাঁড়ানো চাই। ও জায়গাটা অলিখিত 'স্টপ' হয়ে দাঁড়িয়েছে ফি মেলের জন্যেই।

এরাইভ্যাল এবং ডিপার্চারের এমন স্বাধীনতা, প্রকৃতিতে না থাকলেও রেলের এই হচ্ছে প্রকৃতি।

যাত্রীদের প্রকৃতিও এর সঙ্গে সমান সুরে বাঁধা। যেমন SONG তেমনই সঙ্গত হবে তো! ট্রেনে চাপব, টিকিট কাটব না; থার্ড ক্লাসের টিকিট কাটব, চাপব ফার্স্ট ক্লাসে,—এসব বাসি হয়ে গেছে তাই এখন কেবল ওইটুকু আমি ভালোবাসি না। এখন ট্রেন থামাই চেন টেনে কারণ বাড়ির একেবারে দোরগোড়ায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে, ফার্লংটাকও মাড়াতে হবে না হেঁটে। কিন্তু এহ বাহ্য এর পরেও, এর পরেই রাদার আসল মজা, সত্যিকারের মজানো।

ট্রেনের গদি কেটে, বাল্‌ব্‌ খুলে, তার ছিঁড়ে নিয়ে চলে যাওয়া শেয়ালদায় সব চেয়ে বেশি। এবং শেয়ালদায় বাঙালী যাত্রীর সংখ্যা অনেক বেশি।

কয়েকটি যাত্রীর বজ্জাতির জন্যে কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট,—জাতির নামে বজ্জাতির চূড়ান্ত। পূর্ব রেলওয়ে অপূর্ব প্রচার অভিযানে বলছে: ওদের নিরস্ত করুন......! কাদের? যারা এই বজ্জাতির নায়ক? কারা নিরস্ত করবে? যারা আইন-মানা সাধারণ নাগরিক? কেন করবে তারা? ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্ল্যাটফর্মে তীর্থের কাকের মতো যারা দাঁড়িয়ে, সারাদিন অফিসের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর এই ওভারটাইম-না-পাওয়া কেরানীকুল কেন সাড়া দেবে কর্তৃপক্ষের আকুল কান্নায়।

ফার্স্ট বা থার্ড ক্লাসের ভাড়া দিয়ে বিনা কিংবা কম ভাড়ার

যাত্রীর সঙ্গে গুঁতো গুঁতি করতে অন্ধকূপযাত্রী যারা, তারা কোন্ উৎসাহে সাড়া দেবে রেল কর্তৃপক্ষের অত্যন্ত ন্যায্য আবার অত্যন্ত বেশি অন্যায্য এই আবেদনে।

টাইমটেবলের সার্থকতা কি যদি একটা ট্রেনও টাইমে না আসে? একজন লেখক তার জবাবে অবশ্য বলেছেন যে, টাইমটেবল ছাড়া আমরা জানব কি করে যে কত লেট্ হচ্ছি।

একজন যাত্রীই শেষ পর্যন্ত রেলকর্তৃপক্ষের আবেদনে সাড়া দিয়েছেন। জেন্নুইন একজন যাত্রী। বেলকর্তৃপক্ষের রসিকতাঃ রেল—আপনার জাতীয় সম্পত্তি,—লিটারাল অর্থে গ্রহণ করে, কামরার আয়না খুলে নিয়ে সেখানে লিখে গেছে, অবলীলাক্রমে লিখে রেখে গেছেঃ আমার অংশ আমি লইয়া গেলাম!

তেইশ

ডেলি খবরকাগজ না পড়লে আমাদের ভাত হজম হয় না ; ডেলি প্যাসেঞ্জার হলে আধঘণ্টার মধ্যে কাঁকর হজম হয়ে যায়। মিথ্যে খবর পড়তে হলে কাগজ পড়াই চাই ; সত্য সংবাদের জন্যে লোকাল ট্রেনে হতে হবে ডেলি প্যাসেঞ্জার। ট্রু ফ্যাক্ট অভ লাইফ। সত্যিকারেরর লাইফ, ম্যারিকান ফর্টনাইটলি লাই [ফ্] নয়। ডেলি এক মুখ, কিন্তু ডেলি নতুন মুখরতা কেবল ট্রেনে-বাসে-ট্রামে। ফাস্ট ক্লাসে নয় ; থার্ড ক্লাসে। ফাস্ট ক্লাসে যারা চাপে তারা থার্ড ক্লাস গল্পের লেখক। থার্ড ক্লাসের আরোহী যারা তাদেরই হাসিকান্নার হীরেপান্না দিয়ে তৈরী হয় প্রথম শ্রেণীর গল্প [বল্ 'অভ ফ্যাট']।

এইমাত্র যে সাংঘাতিক মোটা লোকটি ট্রেনের কামরায় উঠবার সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেল তাকে দেখে আপনার না হেসে উপায় নেই। আপনি দাঁত বার করে হাসছেন দেখে মোটা লোকটা অধঃপতিত অবস্থাতেই বলছে ; মেঝেতে একই পোসে অবস্থান করেই বলছে স্থূলদেহ, বিপুল কলেবর হাস্যোদ্রেককারী সেই ব্যক্তি : আমি পড়ে গেলাম, তাই দেখে আপনারা হাসছেন ?—সঙ্গে সঙ্গে আপনার মুখ বন্ধ। কিন্তু তখনও আপনি জানেন না যে বক্তার ওটি মুখবন্ধ মাত্র। পড়ে যাওয়াটা পোস কেবল, আসল পার্পোস এবার শুনবেন, যখন সেই ব্যক্তি উচ্চকণ্ঠে আবার সুরু করেন : আমি পড়ে গেলাম, তাই দেখে আপনারা হাসছেন, আর আমি কি দেখে হাসতে পারছি না জানেন ? আমি দেখছি আপনাদের প্রত্যেকের দাঁতে পায়োরিয়া—

বক্তার পকেট থেকে দাঁতের মাজন এবং আপনার পকেট থেকে একটি চকচকে আধুলির পলায়নে, এই দৃশ্যের যবনিকা পতন।

যারা ক্যাসুয়াল প্যাসেঞ্জার তাদের বধ হতে দেখে এভাবে যেসব ডেলি প্যাসেঞ্জার ভুলেও দাঁত বার করেনি এতক্ষণ, এতক্ষণে তাদের দন্তবিকাশে আপনি 'রোষস্থ' হবেন এবং পরের দিন 'রসস্থ' হবেন আবার যখন নতুনতর কোনও প্যাসেঞ্জার হাসবার পর আধুলির শোকে কাঁদবার অবকাশ পাবে অল্প অথবা একেবারেই না। দেখবেন আপনিও তাকে সাবধান করতে ভুলে গেছেন। ক্ষতি করবেন বলে ভোলেন নি, ডেলি প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে ডেলি ক্যানভ্যাসারের এই চোর-পুলিশ খেলার মজা আগে বলে দিয়ে রসভঙ্গ করতে চাননি আপনি, তাই ভুলেছেন।

সিনেমা-শোর শেষে বিজ্ঞাপন দিতে হয়ঃ ক্লাইম্যাক্স কাউকে ফাঁস করবেন না। তাতেই হাঁসফাঁস করেন আপনি হল থেকে বেরিয়েই সেটি বন্ধুর কর্ণাধঃকরণের জন্যে। ডেলি ক্যানভ্যাসারকে এরকম বিজ্ঞাপন দিতে হয় না। কারণ তার খুলিতে আরও, আরও, মারণাস্ত্র আছে লুকিয়ে।

হঠাৎ দেখবেন, ট্রেনের এক কোণে একজন একই তেল ছআনায়, এবং আরেক কোণে আরেকজন, আটআনায় হাঁকছে। তারপর দুজনে একই কামরায়, ব্যবসা খারাপ করে দেবার অজুহাতে হাতে হাতে লড়ে যাচ্ছে। তাদের থামাবার জন্যে চারআনায় রফা করে এক শিশি তেল হাতে নেবার পর জানবেন আপনারই দফারফা করে গেছে ওরা দুজন। আসলে যারা দুভাই, একই কোম্পানীতে কাজ করে। যেদিন দুভাইয়ের এক ভাইও একটি শিশিও বেচতে পারে না, সেদিনই ওই দৃশ্যে দুজনে নেমে নতুন কোনও ঘাড়ে পুরনো এক শিশি ভেঙ্গে যায়।

এই দুই ভাই হচ্ছে কংগ্রেসী ও কম্যুনিষ্ট। যেদিন আলাদা আলাদা ভাবে ঘাড় ভাঙ্গা যাবে না, দেখবেন দুজনে ঝগড়ার পোস করে, পার্পোজ হাঁসিল করবে। খাদ্যের কিংবা অখাদ্যের ব্যাপারে সেই ভীষণ ও বিভীষণ দুই ভাই দেখবেন সে মুহূর্তে এক হয়ে গিয়ে বলছে: 'জনসাধারণ' নামক কামধেনুকে 'এসো আমরা দুই ভাই!' বঙ্গদেশের আজনীতিতে দুয়ে দুয়ে চার হয় না, দুয়ে দুয়ে এইভাবেই দক্ষিণ ও বামের দুধ দই, রাবড়ি, জোগাড় হয়!

চব্বিশ

দেবলোকে ৩৩ কোটির মধ্যে ৩টির নামডাক সব চেয়ে বেশি। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর। নরলোকে কোটি কোটি পেশার মধ্যেও ৩টির হাঁকডাকই সাংঘাতিক। উকিল, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার। ইন অর্ডার অভ ডিমেরিট অথবা ইন ডিসডার অভ মেরিট, বলব, জানি না। উকীলের রোজগার ডাক্তারের চেয়ে বেশি। সাকসেস-fool ডাক্তারের চেয়ে সাকসেস-fool উকীলের রোজগারের কথা বলছি। তবু, বিবাহযোগ্যা ত বটেই, বিবাহের অযোগ্যা মেয়েরও বটে, মায়েরা তাকিয়ে থাকে ডাক্তারের দিকেই বেশি; বেশিক্ষণ। আগে আইডিয়াল জামাই ছিল আই-সি-এস। এখন সানিনল হচ্ছে, ডাক্তার—যে বড়লোক রোগী দেখলে মনে মনে উল্লসিত হয়: I see ass বলে; মুখে বলে, আপনার রক্তটা একবার পরীক্ষা করানো দরকার। রক্ত-র পর বাজ্জে-পেচ্ছাব সবই পরীক্ষা করার কথা উহ্য আছে অবশ্যই! রোগীর রক্ত-বাজ্জে হবার সেই তো সুরু; সারা নয় তো তখনও···

তবু একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, রাজপথের পাঁচালীতে সব চেয়ে কালারফুল ক্যারেক্টার অবশ্যই ডাক্তারের। উকীলরা যদি ব্ল্যাক-এণ্ড হোয়াইটের ছবি হয়, ডাক্তাররা টেকনিকালার মোশান পিকচার।

ভালোয়-মন্দয় আলোয়-আঁধারে, সাদায়-কালোয় অনন্য চরিত্র, ডাক্তার মাত্রই ওবসারভেসানের বিষয়। এ-বিষয় কে অস্বীকার করবে যে কখনও কখনও, কোনও কোনও ডাক্তারের চেয়ে বড় ROUGUE আর নেই; আবার, এবিষয় স্বীকার করবে না কে যে কখনও কখনও কোনও যমের হাত থেকে মানুষকে সত্যি সত্যি ছিনিয়ে আনে। অবশ্য যমের হাত থেকে ডাক্তারের হাতে পড়া, ফ্রম ফ্রায়িং প্যান টু ফায়ার কিনা, সে স্বতন্ত্র কথা। (কংগ্রেস থেকে কম্যুনিস্টদের কবলিত হওয়া সম্পর্কে যা হচ্ছে রাজাগোপালাচারীর একমাত্র স্বতন্ত্র-কথা!)

মানুষের সুখে যার অসুখ, অসুখে যার সুখ, সে-ই ডাক্তার। সুখের চেয়ে স্বস্তির মতোই। অস্বস্তির চেয়ে অসুখ ভালো, একথা ডাক্তারের পাল্লায় না পড়লে বলা কঠিন। সুখে থাকতে লোককে ভূতে কিলোয়; অসুখে থাকতে ডাক্তার নামক অভূতে কিলোয়। শুধু কিলোয় না; তার আগে উপদেশামৃত বিলোয়। যেমন সেই লোকটিকে ডাক্তার দেখা মাত্তরই সুরু করে: তোমার অসুখ হচ্ছে বসে-শুয়ে কাটানো। দুবেলা একমাইল করে হাঁটা দরকার,—বুঝেছ?

চিঁ চিঁ কণ্ঠে মুমূর্ষু বলে হ্যাঁ—

হঠাৎ ডাক্তারের কি মনে পড়ে যায় যেন, জিজ্ঞেস করে আবার: কী করা হয় তোমার?

মুমূর্ষু কণ্ঠ প্রত্যুত্তর করে এবার জোরে: পিওনের চাকরি—

পিওনকে যারা হাঁটবার পরামর্শ দেয়, বস্তির লোককে বায়ু-পরিবর্তনের, বড় লোকের মাথা ধরলে কপালে স্টেথিসকোপ লাগায়, তারাই ডাক্তার।

নেটিভ স্টেটের পাগলা রাজার মায়ের অসুখ। রাজার লোক ঢেঁড়া পিটিয়েছে, সবচেয়ে কম লোক মেরেছে এমন ডাক্তার চাই। এলো একজন সেই ডাকে সাড়া দিতে।

কত রোগী মেরেছ আজ পর্যন্ত ?

—রাজার জিজ্ঞাসা।

পঞ্চাশ,—ডাক্তারের জবাব।

ডাক্তারের তরুণ কান্তিতে পাগলা রাজার সন্দেহ হয়। আবার প্রশ্ন করে পাগলা রাজা : প্র্যাকটিস কতদিনের ?

ডাক্তার তখনও সপ্রতিভ উত্তর করে : আজ্ঞে গত কাল প্র্যাকটিশ আরম্ভ করেছি।

দিনের সুরুতেই পঞ্চাশ জনকে নিকেশ করে যার যাত্রারম্ভ. বৈদ্যদের মধ্যে রাজবৈদ্য হতে পারে সেই। কালে সেই হয় ধন্বন্তরী !

পঁচিশ

যত মত তত পথ,—ধর্মের কথা নয় কেবল অধর্মের কথাও তাই। ডাক্তারীর কথাও তাই। মত এক পথের শেষ নেই। পথ নয়; প্যাথ। এ্যালেপ্যাথ, হোমিওপ্যাথ হাইড্রোপ্যাথ এ্যাচোরোপ্যাথ। কবিরাজি, হাকিমি, বায়োকেমিক, চাঁদসী। টোটকা, জলপড়া, দৈব, স্বপ্নাদ্য, ঝাড়ফুঁক এরাও কম যায় না। বড়ি, লিকুইড মালিশ, কবচ, জড়িবুটি, মাটি, মাকড়শা, আরশোলা, মত ও পথের শেষ নেই, রোগী শেষ না হওয়া তক্। এরই মধ্যে এ্যালোপ্যাথ ও হোমিওপ্যাথের লড়াই হচ্ছে দেখবার মতো। এ্যালোপ্যাথের মতে হোমিওপ্যাথি হচ্ছে অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা। এ্যালোপ্যাথির ভক্ত যারা, তারা অবশ্যই, প্রভু যত বলে পারিষদ দলে বলে তার শতগুণ স্টাইলে আরও বিশদ করে যে, যে অসুখ ওষুধ না দিলেও সারতো, হোমিওপ্যাথিতে কেবল তাই সারে। হোমিওপ্যাথির সঙ্গে হাতদেখা, ঠিকুজি দেখার তুলনাও চলে বৈজ্ঞানিক-চিকিৎসার অনুরাগী মহলে। অর্থাৎ, হাতদেখা ঠিকুজি দেখা যেমন কখনও মেলে, কখনও মেলে না, মিললে কাকতালীয়, না মিললে, উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা : জানতাম।

হোমিওপ্যাথরা কম যান না। এ্যালোপ্যাথির বিরুদ্ধে সমান সরব তারাও। এ্যালোপ্যাথি হচ্ছে পাশবিক চিকিৎসা; রোগীকে ফতুর করা। ফেঁড়ে ফেলে, তারপর বলা, ইনকিওরেবল। বাঘে ছুঁলে আঠারো। এ্যালোপ্যাথে ছুঁলে ঘায়ের শেষ নেই। চিকিৎসার আগেই চিরে ফেলো রোগীকে। রক্ত বার কর, হাগাও, মোতাও,

হার্টের ছবি নাও। তারপর না পাওয়া গেলে আবার নাও। তারপর চলো, স্পেশালিস্টের কাছে।

যে কথাটা কেউ বলে না, তা হচ্ছে, এ্যালোপ্যাথ কিলস্ এ ম্যান, আর হোমিওপ্যাথ লেটস্ এ ম্যান ডাই। তফাৎ কেবল এই।

যত তফাতই হোক, মিল আছে এক জায়গায় হোমিও ও এ্যালোপ্যাথে। হাতের লেখার গোঁজামিল। যত বড় ডাক্তার, হাতের লেখা তত খারাপ। মনে হয় ওষুধের নামগুলোর বানান এত গোলমেলে যে হাতের লেখার গোঁজামিল দেওয়া ছাড়া নান্য পন্থা বিদ্যাতে অয়নায়। এক ডাক্তার তার এক রোগীকে দেখা করবার জন্যে এক চিরকুট পাঠায় আরেক রোগী মারফৎ। তারপরেও সে দেখা করে না। বাজারে দেখা হয়ে যায় নিরুদ্দিষ্ট রোগীর সঙ্গে ডাক্তারের। ডাক্তার জিজ্ঞেস করল: তুমি আমার চিরকুট পাওনি?

আজ্ঞে হ্যাঁ, রোগী অম্লানবদনে জানায়, সে চিরকুটে লেখা ওষুধ তো ডাক্তারখানা থেকে আনিয়ে খেয়ে ফেলেছি—

মালের মুখে অথবা বানানের সমুখে না পড়লে কলমের মুখে এমন লেখা বেরুনো অসম্ভব।

গোদের ওপর যেমন বিষফোড়া, বোঝার ওপর শাকের আটি, তেমনিই জেনারল ফিসিসিয়ানের ওপর স্পেশালিস্ট। স্পেশালিস্টের পারে, স্পেশালিস্টের ওপারে অবশ্য যম ছাড়া আর কেউ নেই। এই স্পেশালিস্টের সম্পর্কে একজন ভিনদেশী হিউমার স্পেশালিস্ট বলেছেন, সাধারণ চিকিৎসকের সঙ্গে বিশেষজ্ঞের কি তফাৎ। সাধারণ ডাক্তার যদি বলে আপনার ফ্লু হয়েছে তাহলে আপনি ফ্লুতেই মারা যাবেন। কিন্তু স্পেশালিস্টের মতে আপনার যদি এনিমিয়া হয়ে থাকে তাহলে আপনি ক্যানসার অফ দ্য ব্লাডে মারা যেতে পারেন।

স্পেশালিস্টরা যে যে-বিষয়ে স্পেশালিস্ট, জগতের যা কিছু অঘটন তার মূলে জানবেন তিনি যার চিকিৎসা করেন সেই অসুখ। বৃষ্টি হচ্ছে কেন,—দাঁতের ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করুন, উচ্চারণ-পাঠ জবাব আসবে খারাপ দাঁতের জন্যে···

ছাব্বিশ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কলকাতায় গেরস্থ ছাড়াও যেমন নূতন এক শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে যার নাম হাফগেরস্থ, তেমনি ডাক্তার ছাড়াও পৃথিবী জুড়ে আরেক শ্রেণীর জন্ম হয়েছে যার নাম হাফ ডাক্তার। যেসব সাময়িক পত্র, রিডার্স ডাইজেস্ট করতে পারে না, সেই জাতীয় একগাদা বজ্জাতীয় কাগজ ও পকেট বুক, সুলভ লেটারেচার ছড়াচ্ছে যাতে আণবিক বোমা থেকে ফ্লু পর্যন্ত সব বিষয়ের ওপর বিশেষজ্ঞরা টাকার কিম্বা নামের লোভে একগাদা বিশেষ অজ্ঞ তৈরী করছে যাদের চেয়ে বড় Rogue স্বয়ং ডাক্তারও নয়।

রোগের চেয়ে এই Rogue-এরাই মারাত্মক। ঘুম না এলে স্লিপিং পিল খেতে অভ্যাস করে তারপর স্লিপিং পিল খেয়েও একদিন যখন ঘুমোতে পারেনা তখন স্লিপিং পিলে-এর মাত্রা বাড়ে; এবং ঘুমেরও। অর্থাৎ সে ঘুম আর ভাঙে না। গায়ে ফুসকুড়ি দেখা দিলে এরা ডাক্তার দেখায় না; পকেট বুক দেখে। সে পকেট বুক্-এ লেখা আছে: যেখানে দেখিবে আছে ফুসকড়ি ফুটিয়া,—জানিবে ক্যানসার তাহা, বিশেষ অজ্ঞ কাছে যাবে তখনি ছুটিয়া। বি ওয়্যার অফ পিক পকেটস নয়,—যে সাইন সর্বত্র নিয়ন সাইনে নিকোনো উচিত তা হচ্ছে: বি ওয়্যার অফ পকেট বুকস্।

সুখের মূল কি জানিনা। অসুখের মূল কি আমি জানি। সুখকে সমূলে ধ্বংস করে অর্ধেক অসুখ সৃষ্টি করার মূলে আছে এই জাতীয় এই বজ্জাতীয় সাময়িক পত্র, যা, রিডার্স ডাইজেস্ট করতে পারে না।

ডক্টরের চেয়েও মারাত্মক হচ্ছে আবার ডক্টর অফ লিটারেচার। ডাক্তার প্রেসক্রিপসান লেখে তার মানে হয়; চেক লেখে—তাতে Money হয়; ডাক্তার যখন ডাইরী লেখে তখন তা পড়ে পাঠকদের যে ডায়েরিয়া হয় তখন তা সব চিকিৎসার বাইরে। তবুও ডাক্তারের লিটারেচার যদি বা সহ্য হয়, লিটারেচারের ডাক্তার এক দুঃসহ চরিত্র। রবীন্দ্রনাথের দুরূহতম কবিতাও ডক্টর অফ লিটারেচারের ব্যাখ্যার চেয়েও বোঝা সহজ। তার একটু নমুনাই যথেষ্ট হবে। ধরুন, রবীন্দ্রনাথ বাচ্চাদের ইংরিজি থেকে অনুবাদ শেখাতে গিয়ে কোথাও লিখেছেন: "আই গো আপ এ্যাণ্ড উই গো ডাউন",—একজন ডক্টর অফ লিটারেচার হচ্ছে সে-ই. যে ক্লাসে এসেই ছেলেদের বুঝিয়ে দেবে যে, রবীন্দ্রনাথের মতো লোক কখনও এতো সহজ কথা বলতে পারেনইনা; অতএব এই উক্তির মধ্যে গভীরতর কোনো নিদিধ্যাসন নিশ্চয়ই আছে। এখন আমি তা ব্যাখ্যা করে সহজ করে বুঝিয়ে বলছি—রাইট ডাউন।

আই মানে চক্ষু, গো মানে গরু, অফ মানে সংস্কৃতে অপ্ ; অপ্ মানে জল। এ্যাণ্ড মানে অণ্ড, অণ্ড মানে ডিম। উই মানে উইপোকা, গোডাউন মানে গুদাম। টানা মানে হচ্ছে,—গুদামের ডিমেতে উইপোকা লেগেছে দেখে গরুর চোখ দিয়ে জল ঝরছে।

সাহিত্যের ডাক্তার থিসিস-এর আর থাইসিসের মূলে ডাক্তারের সাহিত্য। অরসিকের হাত থেকে বররুচি বাঁচতে চেয়েছিলেন; ডেভিলস্ ডিসাইপ্‌ল্, ডাক্তারের হাত থেকে বাঁচতে হলে হতে হবে,—'Shaw'-রসিক!

সাতাশ

অলৌকিকে ডাক্তারদের অবস্থা কম কিন্তু ডাক্তাররা সব চেয়ে বেশি অলৌকিক কইতে ভালবাসে। এক ভদ্রমহিলার ছাদে কাপড় তুলতে গিয়ে হাতদুটো ওপরে উঠে যায়, আর নামতে চায় না কিছুতেই। উর্ধ্ববাহু সেই মহিলার কোমরের কাপড় ধরে টান দেবার চেষ্টা করে এক ধন্বন্তরী। স্বাভাবিক লজ্জাবশতঃ কাপড় সামলাতে গিয়ে ইন্‌স্‌টিংক্‌ট কাজ করে। জানবার আগেই নেমে আসে হাত মাথার ওপর থেকে কোমরের কাছে। তখন ধন্বন্তরীর জয়জয়কার পড়ে যায়। প্রত্যুতপন্নমতিত্বের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয় সবাই। এ গল্প, এই ভূতের চেয়েও অদ্ভুত গল্প অনেককাল থেকে চলে আসছে। এ গল্প অলীক জেনেও এই অলৌকিক গল্পে মন মজে কারণ এ গপ্‌পো মুখরোচক। এবং সেই আর একটি, আরও একটি অবিশ্বাস্য হকিমির কথা আপনারাও শুনেছেন। সেই যে এক নববধূর শ্বশুরবাড়িতে এসেই অজ্ঞাত কারণে রোজ যার পেট ফুলতে থাকায়, ক্ষিদে না হওয়ায় মনমরা হয়ে পড়ায়, ধন্বন্তরী এক ডাক্তার বৌটিকে জোর করে বার করে নিলো কারণ, সে গপ্‌পো তো জানা? ধনন্বন্তরীর কাছে মেয়েটি স্বীকার করলো যে, বিয়ের আগে তার হুঁকোয় অভ্যাস ছিলো। নেশার বস্তু না পেয়েই তার এহাল! ডাক্তার তাকে তামাক খেতে দেওয়া মাত্তরই আবার ফুর্তির প্রত্যাবর্তন ফুলের মতো মুখে!

এ গপ্‌পোও বিশ্বাস করবার নয়, তবু ডাক্তারদের লেখা গপ্‌পোর চেয়ে ডাক্তারদের সম্পর্কে বলা এই গপ্‌পো অনেক সুস্বাদু!

কিন্তু পৃথিবীতে কটা গল্পই বা বিশ্বাসযোগ্য? বিশ্বের যাঁরা সেরা গল্প

বলিয়ে তাঁরাও তো বানিয়েছেন গল্প কিন্তু এমনভাবে বানিয়েছেন যাতে তা বিশ্বাস না করে উপায় থাকেনি। মপ্যাসাঁর 'নেকলেস',—বাস্তব জীবনের সংগে সম্পর্কহীন অবাস্তব গল্প; কিন্তু এমন হাতে হাতে লেখা যে ও গল্পের হতভাগ্য নায়িকার জন্যে ফিল্ না করে উপায় কি?

ডাক্তারদের লেখা গল্প সম্বন্ধে অপ্রিয় মন্তব্য করলেই জানি, প্রশ্ন উঠবে। জিজ্ঞেস করা হবে তৎক্ষণাৎ যে, জগতে ডাক্তার কি অবিস্মরণীয় ছোটো গল্পর রচয়িতা বলে স্বীকৃত হননি? হয়েছে। শেহভ। কিন্তু শেহব তো একজন লেখক যিনি পেশায় ডাক্তার। তিনি নিজেই বলেছেন 'মেডিসিন ইজ মাই লিগ্যাল ওয়াইফ এণ্ড লিটারেচার, মাই মিস্ট্রেস!' এবং কেনা জানে সিদ্ধ আনন্দের চেয়ে নিষিদ্ধ আকর্ষণের প্রেরণা অনেক বেশি দুর্বার!

লেখক ডাক্তার হলে ঠিক আছে; ডাক্তার লেখক হতে চাইলেই সব বে-ঠিক।

যদিও ডাক্তাররা জীবনকে যত 'র' অবস্থায় দেখবার সুযোগ পান এত আর অন্য কোনও পেশার লোক পান না। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিমুহূর্তে মানুষের মুখ থেকে মুখোস সরে যাওয়ার অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা ডাক্তারদের দৈনন্দিন ব্যাপার। এবং দৈনন্দিন বলেই তা থেকে জীবনের গল্প আহরণ করতে পারে না তারা। ডাক্তাররা মৃত্যুর মুখে পড়তে পারে না জীবনের বাণী। যিনি পারেন তিনি ডাক্তার নন; লেখক।

মানুষের মধ্যে কংকালটুকু ডাক্তারের চোখে পড়ে; কংকালের মধ্যে মানুষ ছিলো যে, তাকে যার চোখ দেখতে পায়, কেবল সে-ই লেখক।

তাই লেখক ডাক্তার হতে পারে; কিন্তু ডাক্তার কখনও লেখক হয় না।

বাজে লেখা

এক

শান্তি চাই না। শান্তি মড়ার কাম্য। জীবনভোর চাই যুদ্ধ। বুদ্ধদেবের নয়, ক্রুদ্ধদেবের ভক্ত হওয়াই মনুষ্যত্ব। জীর্ণ, পচা, পুরোণো এই পৃথিবীকে পদাঘাতে করতে চাই বিদীর্ণ। ঈশ্বরকে ভয়ে ডাকতে চাই না। ভালোবাসায় হারিয়ে দিতে চাই। যে ঈশ্বরকে মানৎ উদ্দেশ্য করি মামলায় জেতবার জন্যে, ছেলের চাকরি পাবার কারণে, নিজের জন্য এক্সটেনশান এবং মেয়ের জন্য পাত্রর প্রতিক্ষায়, সেই ঈশ্বর পরমেশ্বর নন। মানুষের দোষ ক্রুটি স্খলন পতনের দায় যিনি নিজের কাঁধে তুলে নেন, জগতের যতেক মানুষের প্রায়শ্চিত্ত যিনি একা করেন, কেবল সেই ঈশ্বরেরই নাম করি এবং নামের সঙ্গে সঙ্গেই প্রণাম করি তাঁকে। সে ঈশ্বর গড, আল্লা ভগবান নন ; নন ধর্ম বিবেক সংস্কার ; শাস্ত্র জ্ঞান বিজ্ঞান বুদ্ধি বীর্য ঐশ্বর্যের ওপরও আর এক ঈশ্বর আছেন যার নাম মানবহৃদয়। হৃদয়ের জয়গান কর। বল ঃ

আকাশ অসীম, সাগর অতল, পৃথিবী বিশাল,
তবু কেউ ততবড় নয়
যত বড় জানি আমি মানব হৃদয়।

মোটর-যানে চাপতে চাইনা, চাইনা উড়োজাহাজে উড়ে যেতে, সস্তার হারে ট্রেনের টিকিট কাটতে চাই না তাও। কেবল সকল মানুষের সঙ্গে যদি হাঁটতে পাই তাহলে হই কৃতার্থ। আমি জানি

জীবনের চেয়ে বড় তীর্থ নেই; মানুষের চেয়ে সতীর্থ নেই বড়। চাঁদে পাড়ি দিয়ে কি হবে, কি হবে হিমালয়ের মাথায় পা দিয়ে, যখন ক'টি লোক কয়েক কোটি মানুষকে পায়ের তলায় রাখছে দাবিয়ে। প্রগতির এত দূর গতি, এত দুর্গতি জানলে কে চাইত প্রগ্রেস! সভ্যতার নামে এতো অসভ্যতা, মানবিকতার নামে পরমানুবিকতার এই দানবিক দাপটের দুর্দিনে কালাপাহাড়ের কথা কেবল এই:

উড়ে যেতে চাও উড়ে যেতে পার
মেসিন পক্ষিরাজে,
যেতে চাও কাদা ছুঁড়ে যেতে পার
মোটর-যানে তা সাজে।
সস্তার হারে টুরে যেতে চাও
ট্রেনের টিকিট কাটো,
মানুষকে যদি কাছে পেতে চাও।
সবার সঙ্গে হাঁটো॥

দুই

দারিদ্র্য এবং অভাব, এ দুটো জিনিস এক নয়; যেমন অর্থবান ব্যক্তি বড়লোক নয় সমার্থক। দারিদ্র্যের মধ্যে যা আছে, অভাব মিটলেই তা ঘোচে না। একজন বড় লোকের অভাব না থাকতে পারে কিছুরই, তবু তিনি হতে পারেন এ দুনিয়ার সবচেয়ে দরিদ্র; একজন দরিদ্রের নিদারুণ অভাব সত্ত্বেও দারুণ বড়লোক বলে গ্রাহ্য হতে জগতের কোথাও কোন কালে বাধা নেই। অভাব বাইরের; দারিদ্র্য মনের। অভাব ঘোচে; দারিদ্র্য কখনও ঘোচে না। আর্নল্ড বেনেট একবার সমারসেট মমকে বলেছিলেন:

Once you are born poor, you remain so always.

অভাব কখনও দারিদ্র্যের লক্ষণ নয়; দারিদ্র্যই অভাবের লক্ষণ। অভাব,—গাড়ি বাড়ির অন্ন বস্ত্র আশ্রয়ের। এই সব বস্তুর নিদারুণ অভাবের মধ্যেও কেউ কেউ দারুণ খুশিতে মেতে থাকে এবং মাতিয়ে রাখে।

ঔপপত্তি বলতে তিনি খাবার-দাবার-এর অভাব বোঝেননি। কারণ, তেঁতুল গাছে যতক্ষণ পাতা আছে এবং গিন্নি যতক্ষণ চমৎকার তেঁতুলের অম্বল রাঁধতে জানেন, ততক্ষণ অভাব কোথায়? বুনো রামনাথের মত লোক কোন দেশে, কোন কালেই সংখ্যায় বেশি নয়। তার কারণ, বড়লোকের মধ্যে দারিদ্র্য যেমন সুলভ, দারিদ্র্যের মধ্যে বড়লোক তেমনই দুর্লভ।

আলেকজাণ্ডার যখন গ্রীক দার্শনিকের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন, বিশ্ববিজয়ী সম্রাট বিশ্ববিজয়ী দার্শনিকের জন্য কি করতে

পারেন, তখন দার্শনিক বলেছিলেন যে, সূর্যালোককে আসতে দেবার জন্যে আলেকজাণ্ডার স্বচ্ছন্দে একটু সরে দাঁড়াতে পারেন। এই নিঃস্ব দার্শনিকের সম্পদ এবং সম্পদশালীতম সম্রাটের নিঃস্বতা এই কাহিনীতে অনবদ্য উপস্থিত। রাজার মাথায় মুকুট কিছুকালের জন্যে ; আর চিরকালের জন্যে তাঁরা, যাঁরা এই জগতের মুকুটহীন রাজা!

রূপ, রূপো, খ্যাতি, প্রতিপত্তির দারিদ্র্য মনের দারিদ্র্য। এইজন্যে যথার্থ দারিদ্র্যের অভাব কখনও মেটে না। কুবেরের অর্থ, উর্বশীর যৌবন, ইন্দ্রের প্রতাপ, বিশ্বকর্মার খ্যাতি অভাব মেটায় না ; বাড়ায়। চৈতন্যকে যখন তাঁর সহপাঠী বললেন যে, একটি বিষয়ের ওপর একটি গ্রন্থ লিখে অমর হবার আশায় তাঁর বাদ সেধেছেন স্বয়ং নিমাই পণ্ডিত, তখন চৈতন্য জিজ্ঞেস করলেন, কিভাবে তিনি প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছেন ? বন্ধুটি বললেন যে, যেহেতু নিমাই পণ্ডিতও ঐ একই বিষয়ের ওপর একটি বই লিখেছেন, সেইহেতু তাঁর বন্ধুর লেখা বইকে কেউ মনে রাখবে না। চৈতন্য তৎক্ষণাৎ তাঁর লেখা পুঁথি ভাসিয়ে দিলেন গঙ্গার জলে। গঙ্গার জল সেই মুহূর্তেই বুঝি পূততর, পবিত্রতর হলো আরও একটু।

অর্থাৎ, খ্যাতির দারিদ্র্য থেকে যিনি মুক্ত ছিলেন তিনিই চৈতন্য-মুক্ত পুরুষ।

মানুষ যা কিছু পেলেই মনে করে দারিদ্র্য ঘুচবে, আসলে তা তার অভাববৃদ্ধি করে মাত্র। যেমন রৌদ্ররুক্ষ পথে হাঁটতে হাঁটতে সে মনে করে শীততাপনিয়ন্ত্রিত ঘরে পৌঁছতে পারলেই সে বেঁচে যাবে। সেখানে সে দেখে তার কাম্ফার্ট বেড়েছে কিন্তু অভাব ঘোচেনি। একদিন যে খেতে পেত না, আরেকদিন সোনার থালায় খেতে পেয়ে সে দেখে খিদে মরে গেছে। অর্থাৎ খিদেটা অভাবের হলে তা

মেটানো যায়, কিন্তু দারিদ্র্যের ক্ষুধা সর্বগ্রাসী। রাবণের চিতার মত সে কেবলই হা করে আছে—এ পৃথিবীতে দরিদ্র ব্যক্তি সত্যই করুণার পাত্র। সুখী কে, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তলস্তয় আমাদের যে গল্প বলেছেন, তা মানবজীবনের সবচেয়ে জ্যান্ত গল্প। রাজার অসুখ করেছে; রাজবৈদ্য রায় দিয়েছেন যে, পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী লোকের গায়ের জামা রাজাকে পরাতে পারলে এ রোগ সারবে। রাজপুত্র বেরিয়েছেন পৃথিবীর সেই সবচেয়ে সুখীলোকের সন্ধানে। দুর্গমগিরি কান্তারমরু দুস্তরপারাবার পার হয়ে চলেছেন রাজার ছেলে, এই আশা বুকে নিয়ে যদি দেখা মেলে। যদি দেখা মেলে এমন লোকের যে নির্দ্বিধায় বলতে পারে যে, সে সুখী। হতাশায় হাল ছেড়ে দেবার মুহূর্তে এক কুঁড়ে ঘরের সামনে থমকে দাঁড়ান রাজপুত্র। শুনতে পান ভেতর থেকে একটি লোকের উচ্চারিত স্বগতোক্তি। ঘুমুতে যাবার আগে এই লোকটি বলছেঃ সারাদিন মাঠে কাজ করেছি। পরিবারের সকলের এবং আমার খাওয়া জুটেছে, এখন ঈশ্বরের নাম নিয়ে শুতে যাব; আমার চেয়ে সুখী আর কে? রাজার ছেলে বিদ্যুৎতর গতিতে কুঁড়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে দেখেন, জগতের সবচেয়ে সুখী লোকের গায়ে কোন জামা নেই।

অর্থাৎ তলস্তয় বলতে চেয়েছেন যে দারিদ্র্য আর অভাব এক বস্তু নয়।

তিন

আমরা সবাই যে বিষয়ের ওপর চর্চা করি সেই বিষয়কে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বলে মনে করি। ইতিহাসের ছাত্র ইতিহাসকে, রাজনীতির ছাত্র, রাজনীতিকে, সাহিত্য-সংগীত-শিল্প-নৃত্য-ভাস্কর্য যার যা পেশা অথবা নেশা সে তাকেই মনে করে সবচেয়ে মূল্যবান। এবং সেই সব বিষয়ে নিজেদেরকে মনে করি অপরিহার্য। জগতে সবচেয়ে করুণার পাত্র যে কেরানী তাকে জিজ্ঞেস করুন অথবা না করুন তার মুখে শুনতে পাবেন যে সে একদিন অফিস না গেলে অফিস উঠে যাবে। এ দুর্বলতা সবচেয়ে বেশি কার বলা শক্ত তবে এ দুর্বলতা-মুক্ত পুরুষ আজও পর্যন্ত একজনকেই মাত্র মিট করেছি আমরা পুরাণে। তাঁর কথা আগেই বলেছি। কুম্ভকর্ণের কথা পুরান হলেও পুরাণো হবার নয় কখনও।

দাঁতের ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করুন কিম্বা না করুন তার মুখে শুনবেন, সব কিছুই হচ্ছে অথবা হচ্ছে না দাঁত খারাপ হবার কিম্বা না হবার জন্যে। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে কেন এ প্রশ্নের উত্তরও বাঁধা; ডেন্টিস্টের মুখে শুনুন,—আগে দাঁত বাঁধান তবেই বৃষ্টি শুরু অথবা বন্ধ হবে। এতে যুধিষ্ঠির ছাড়া আর কারুর বিস্মিত হবার নেই, কারণ আমরা সবাই নিজেদেরকেই একমাত্র মনে করি। আমরা একবারও মনে করিনা আমরা এখানে এলে অথবা এখান থেকে গেলে, এই পৃথিবী নামক গ্রহের বিন্দুমাত্র হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না।

দশটি কি বারটি লোক আজও পর্যন্ত সর্বসাকুল্যে এসেছেন এবং গেছেন যারা না এলে আমাদের এত যন্ত্রণা হত না। অলডাস

হাক্সলি বলেছেন, এই দশ-বার জনেরই মর্ত্যে আগমন সার্থক ; বাকি আমরা সবাই টিচেবেল এ্যানিমালস্। আমরা যদি টিচেবেল এ্যানিমালস্ না হয়ে আর একটু এবল্ কিম্বা আরও একটু বেশি এ্যানিমালস্ হতাম তাহলে আমাদের জীবন-যন্ত্রণা একটু কম হতো। বার্ণড শ একবার বলেছিলেন যে আলফ্রেড নোবেল ডিনামাইট আবিষ্কারের জন্যে যদি বা মার্জনীয় কিন্তু নোবেল পুরস্কারের জন্য তার অপরাধ অমার্জনীয়। আমি বলি, মানুষকে যারা কেটে কুচি কুচি করেছে তারা মানুষকে বাঁচিয়েছে : আর যারা মানুষকে উপদেশ দিয়েছে, চিরকাল মানুষকে মেরেছে তারাই। আমি বলি, ইচ্ছে হয় আমাকে হাঁড়িকাঠে কিম্বা ফাঁসিকাঠে কোরবানী করে দেবেন, কিন্তু দোহাই আপনার আপনি যে-ই হন, আমাকে বাণী দেবেন না। এ পৃথিবীতে এ্যাডভাইস যত ভাইস এ্যাড করেছে, মহাপুরুষের বাণীতে কাপুরুষ যত কোরবানী হয়েছে, নোবেল প্রাইজের নামে যত ইগনোব্ল সারপ্রাইস সংঘটিত হয়েছে, ইতিহাসে তার উদাহরণ অল্প অথবা একেবারেই নেই।

জ্যাক অফ অলট্রেড যারা তারা কেবল নিজেদের সর্বনাশ করে কারণ তারা মাস্টার অফ নান। কিন্তু সাহিত্য, সংগীত অর্থাৎ চৌষট্টি কলা থেকে শুরু করে জ্ঞান বিজ্ঞান দর্শন নীতি রাজনীতি অর্থনীতি ও দুর্নীতি, সকল ক্ষেত্রের মাস্টারদের আমার দারুণ ভয়। মানুষেব সর্বনাশের মূলে মেয়েমানুষ নয় ; রুট অফ অল ইভিল হচ্ছে তারাই যারা মহাপুরুষ বলে কথিত। মহাপুরুষদের মডার্ণ ভার্সান হচ্ছে এক্সপার্ট অর্থাৎ বিশেষজ্ঞ। সর্ব বিষয়ে যারা বিশেষ অজ্ঞ সেই সাধারণ প্রাণ নিয়ে তারা ছেলে খেলা করে যারা কোন এক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। আমাকে জন্ম জন্ম আমাকে সর্ব বিষয়ে অজ্ঞ করে রেখ হে জগন্নাথ, তবু দোহাই তোমার আমাকে বিশেষজ্ঞ কোরনা কখনও।

নিজের কাজকে সকল কাজের চেয়ে জরুরী মনে করা প্রত্যেক লোকেরই স্ত্রীলোকজনোচিত দুর্বলতা। কিন্তু এ ব্যাপারে সব সেরা বোধ হয় তারাই যারা নিজেদেরকে মনে করে শিল্পী। লেখক গায়ক আঁকিয়েরা ব্যবসাদার শিক্ষক কেরানী নানা পেশায় নিযুক্ত সং কর্মীদের চেয়ে নিজেদের মনে করে অনেব মহৎ। ভালো জুতো তৈরী করার চেয়ে যে কোনও একটা সাধারণ লেখা গাওয়া আঁকা মহত্তর কেন হবে সে জিজ্ঞাসার জবাব নেই কোন দেশে কোনকালে। আত্মার প্রয়োজনে আমি বিশ্বাস করি; কিন্তু দেহের প্রয়োজনকে বাদ দিয়ে করি নে। মনের ক্ষুধা মেটায় যে তার প্রয়োজন পরে; দেহের ক্ষুধায় যে খেতে দেয় মানুষের সবচেয়ে বড় বন্ধু সে-ও বটে। দুটি পয়সা জুটলে, একটি পয়সা আমি ব্যয় করতে রাজি আছি ফুলের জন্যে; কিন্তু দুটি পয়সাই কোন বিউটিফুলের জন্যেও হাত ছাড়া করতে আমি গররাজি। ফুল কেন ফলের চেয়ে মহৎ হবে, এই আমার জিজ্ঞাসা।

বাঁচার জন্যে রবীন্দ্রনাথ চাই। কারণ আমার মন আছে। কিন্তু মনেরও আগে নিঃসন্দেহে আছে আমার দেহের ক্ষুধা। আগে পেটে খাব তারপর কারপেটে গড়াব। তাই আমার রান্নার ঠাকুর সর্বাগ্রে। তারপর রবিঠাকুর এবং তার ওপর তেত্রিশ কোটি ঠাকুর দেবতা। আগে ব্রেড তারপর বাটার; বাটারফ্লাই তারও পরে।

চার

ভদ্রলোকের এক কথা,—একথা যদি সত্য হয় তাহলে বলতে পারি যে পৃথিবীর কোনও বড় লোক ভদ্রলোক নয়। বড় লোক অর্থে কেবল অর্থেই যে বড়লোক তার কথা বলছি না; চিন্তার ক্ষেত্রে যে বড় সেই লোকের কথা বলছি। গ্রেট মেন থিঙ্ক এ্যালাইক, ফুলস্ সেলডাম ডিফার। এটি একটি বিউটিফুল অসত্য। সত্যিকারের বড় লোক যারা তাদের মধ্যে একটি জায়গায় মিল, সে হচ্ছে সেলফ্ কন্ট্রাডিকশনের ক্ষেত্রে। কেবল জীবনে ও কাব্যে যে কন্ট্রাডিকশন তাই নয়, চিন্তার ক্ষেত্রেই এতরকম উল্টোপাল্টা কথা তাঁরা বলেছেন যে তার মধ্যে মিলের থেকে গোঁজামিল অনেক বেশি। বিবেকানন্দ একবার বলছেন, উত্তিষ্ঠত জাগ্রত; আরেকবার বলছেন, সকল কর্ম প্রচেষ্টা এককালে অন্তর্হিত হইয়াছে; বুঝিয়াছি তিনি যন্ত্রী আমি যন্ত্র। রবীন্দ্রনাথ একবার মৃত্যুকে শ্যামের সমান বলেই, সেই মৃত্যুকেই বলছেন, তবে মৃত্যু দূরে যাও। ভক্তরা বলেন, এগুলি কন্ট্রাডিকশন নয়; বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের মত এই আপাত বিরোধী বক্তব্যের পেছনে রয়েছে অভ্রান্ত একটি দর্শন। এই অন্ধ ভক্তি সম্পর্কেই রবীন্দ্রনাথের তিরস্কার: যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য নাহি মানে।

একবার বলা হচ্ছে পুরুষকার, আরেকবার বলা হচ্ছে ভাগ্য। একবার বলা হচ্ছে তিনি নিরাকার, আরেকবার সাকার; একবার বলা হচ্ছে, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মায়া; আরেকবার,—এ জগৎ স্বপ্ন নয়। যিনি এক তিনিই যদি বহু হয়ে থাকেন তাহলে পাপ এবং পুণ্য এ দুই-ই তিনি। তাহলে পাপ করলে কে তা করছে। মানুষের সবই

যদি পূর্ব নির্ধারিত তাহলে উপদেশ-তিরস্কারের প্রয়োজনটা কি ওমর খৈয়াম বলেছেন এই জন্যেই যে মানুষের কাছে মানুষের বিধাতার ক্ষমা প্রার্থনীয়। কারণ, মানুষকে অতল পঙ্কে যদি কেউ নিমজ্জিত করে থাকেন তিনি মানব ভাগ্য বিধাতা ছাড়া আর কে!

তবুও বলা হয় যে যতক্ষণ তুমি না জানছ যে পাপ-পুণ্য অকর্ম এবং কর্ম অবিদ্যা এবং বিদ্যা, এ সবই আসলে সেই একের বিচিত্র রূপমাত্র, ততক্ষণই ভালো মন্দ, কর্ম-অকর্ম পাপ পুণ্য বিচার। কিন্তু যেই তুমি অর্জুনের মতো বিশ্বরূপ দর্শন করলে, সেই জানলে যে তুমি নিমিত্ত মাত্র; যাকে মারবার তিনিই মেরে রেখেছেন!

এ যদি সত্যই হয় যে মৃত্তিকার পৃথী পরে আমরা যা করি তা আসলে আমরা করিনা, আর কেউ আমাদের দিয়ে করায়। তাতে এসে যায় কী ('আমি যাহা কিছু বলিবারে চাই বলিতে দিতেছ কই?') আমি জানি আর না জানি আমার জীবন যদি পুতুল নাচের ইতিকথা হয় তাহলে যিনি আমাদের নাচাচ্ছেন, তাঁর লেখা এই কাহিনী নিশ্চয়ই, Is a tale told by an idist, full of sound and fury slgoibying nothing:

কর্ণ বললেন, 'মদায়ত্তং হি পৌরুষম।' কিন্তু এই পৌরুষ সম্বল করে কাপৌরুষত্বের কাছে তিনি হারলেন কেন? তাহলে কুলই কেবল দৈবায়ত্তং' নয়; দেখা যাচ্ছে, জয় এবং পরাজয় সাফল্য এবং ব্যর্থতা, জন্ম এবং মৃত্যু, এর কিছুই নয় আমাদের করায়ত্ত। কর্ণের চেয়ে, সমস্ত কীর্তির চেয়ে যিনি মহৎ সেই একলব্যকেও তো তার ভাগ্য শুধু বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করল! তাহলে?

এই জন্যেই ভাগ্য এবং পুরুষকারের মধ্যে একটা গোঁজামিল দেবার চেষ্টা কেউ কেউ করেন। তারা কোষ্ঠি বিচার করেন, পাথর ধারণ করেন, এবং বলেন আমরা ফেটালিষ্ট নই। অর্থাৎ আমরা

ডুডুও খাই টামুকও খাই। ভাগ্যে যা আছে তা হবেই; তবুও পাথর পর, কেন? না, পাথর পরলে কালবৈশাখীর ঘন কৃষ্ণ মেঘ শরৎ-কালের লঘুপক্ষ মেঘের মতো যত গর্জাবে তত বর্ষাবে না। তবে ঐ সংগেই বলা যাচ্ছে যে শ্রাবণের ঘন বর্ষা হলে কোন পাথরেই তাকে আর ঠেকান যাবে না। অর্থাৎ সাবধানের যেমন মার নেই তেমনি মারেরও নেই সাবধান। অল্প আঘাতের সম্ভাবনা থাকলে, পাথর পরে তা আপনি এড়াতে পারেন; মাঝামাঝি বড় রকমের মার পার করে দিতে পারেন অল্পের ওপর দিয়ে, কিন্তু সুনিশ্চিত মৃত্যু কোনও পাথরের বর্মেই পারেন না ঠেকাতে।

অত্যন্ত যুক্তিবাদী লোককেও, আমি এরকম যুক্তিহীন কথা বলতে শুনেছি। একবার নয়, বারবার। পাথর পড়ে এরকম ভাবে কে বেঁচে গেছে তার গল্পও বলতে শুনেছি। সুনিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে কোনও পাথর না পরে বেঁচে যাবার দৃষ্টান্ত বিরল নয়; অত্যন্ত সামান্য আঘাতে উল্টো পক্ষে মারা পড়া, তাও ভুরি ভুরি দৃষ্টান্তিত।. এই বাঁচা মরার সঙ্গে ভাগ্য এবং পুরুষকারের কোন সম্পর্ক নেই। একটা মানুষের ছুটো মাথার মতো এও ফ্লুক অথবা ফ্রিক্।

আমরা সবাই সেই সমুদ্রের ঢেউ যার কিছু এসে যায় না আমরা বাঁচলে অথবা মরলে। গাছের একটা পাতা খসে গেলে প্রাণবন্ত গাছ তার জন্যে হাহাকার করেনা। কারণ সে জানে যে বিশ্ব প্রকৃতির সমুদ্রের সে ক্ষণিক বুদ্বুদ মাত্র। তাহলে আমাদের করণীয় কি? ভাগ্য এবং পুরুষকারের অর্থহীন দ্বন্দ্বে কালক্ষয় না করে, দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা যে, মানুষের ভালো কর। লেলিন বলেছিলেন, মরবার সময় তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়েছিল যে, 'মরতে আমার দুঃখ নেই কারণ সমস্ত জীবন আমি মানুষের মঙ্গল চিন্তা করেছি।'

পাঁচ

সোনার পাথর বাটি বস্তুটি কি, একথা যদি কেউ আমায় জিজ্ঞেস করে, তাহলে তার অবধারিত উত্তর হবে,—constructive criticism অর্থাৎ যার জোলো বাংলা হচ্ছে গঠনমূলক সমালোচনা। সমালোচনা মাত্রই Destructive। অজাতশত্রু মানুষের মতোই গঠনমূলক সমালোচনা হচ্ছে সেই বস্তু যা আসলে অপাঠ্য। পার্সোন্যাল বায়াস নেই এমন পার্সন রূপকথায় থাকতে পারে; জীবনের অপরূপ কথায় তার কোনো যায়গা নেই। নিরপেক্ষ আলোচনারই অন্য নাম কাঁঠালের আমসত্ত। মানুষের মতোই যে সমালোচনার রাইভ্যাল নেই তার এ্যারাইভাল সম্পর্কেই কেউ অবহিত নয়। ইম্‌পার্সোন্যাল বলে, আনবায়াস্‌ড্‌ বলে জগতের কোথাও কেউ কোনদিন ছিল না: কোনকালে সেরকম কিছু থাকবেও না।

জন্ম এবং মৃত্যুর মতোই কনস্ট্রাকসন এবং ডেসট্রাকসন একে অন্যকে ছাড়া অচল। মৃত্যু না হলে নবজন্ম কোথায়? ধ্বংস না হলে সৃষ্টি কেমন করে? কে বলবে, কবে বলবে, আর যে, সংহারই হচ্ছে সৃষ্টির যথার্থ একমাত্র উপসংহার। এই জন্যে ক্রিয়েটার এবং ক্রিটিক, একে অপরের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে চিরকাল। ভক্তের স্তব নয়, শত্রুর আঘাতই বাস্তব। সৃষ্টির প্রেরণা, বন্ধুর প্রেম নয়; বিচ্ছেদের শিখা। যে মানুষ সময়ে মরতে জানেনা তার চেয়ে হতভাগ্য আর কে? যে সৃষ্টি সমালোচনার ঊর্ধ্বে তার চেয়ে বড় অনাসৃষ্টি আর কী!

নিন্দা আর ডেসট্রাক্টিভ ক্রিটিসিসম্‌কে লোকে সমার্থক ধরে। আসলে প্রশংসাই নিন্দনীয় ; ডেসট্রাকসন হচ্ছে অনিন্দ্য। অমরতা মহাপুরুষের জন্যে, একাধিক মৃত্যু কাপুরুষের প্রাপ্য। যথার্থ পুরুষ কেবল সে-ই যে এসেই মারতে থাকে এবং আরেকদিন মরতে মরতেও হেসেই যায়। জীবনে এবং সাহিত্যে, সঙ্গীতে, শিল্পে, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, দর্শনে, চিরজীবী বলে কেউ নেই। 'সব লেখা লুপ্ত হয় বারংবার লিখিবার তরে'।

নদীর কোনো কোনো বাঁক এমন আশ্চর্য সুন্দর চেহারা নেয় যে তার দিকে তাকিয়ে চোখের পাতা পড়েনা। কিন্তু নদী তার জন্যে থামেনা। ধ্বংস এবং সৃষ্টি করতে করতে সে এগিয়ে চলে। কোথাও সে শীর্ণ, কোথাও সে স্ফীত। জীবনের নদীও তাই ; সৃষ্টির নদীও তাই। সমুদ্রের বুকে নদীর সংহারই হচ্ছে তার যথার্থ একমাত্র উপসংহার। কালিদাস-সেক্সপীয়ার-রবীন্দ্রনাথ, গেলিলিও-নিউটন-আইনস্টাইন, মাইকেল এঞ্জেলা-লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি পিকাসো, বুদ্ধ-শঙ্কর-শ্রীচৈতন্য,—এঁদের পরেও কথা আছে, নতুন লোক আছে, আছে নবতর আলোক। ফ্রয়েড-মার্কস্‌-মানবেন্দ্রনাথ,—এঁরাও যুগাবতার ; চিরযুগ-অবতার নন কেউ। যুগের নামকরণ সময় দিয়ে নয় ; বক্তব্য দিয়ে। বুদ্ধের পর যদি শঙ্করের আসতে কয়েক হাজার বছর দেরী হতো তাহলেও তা বুদ্ধের যুগই বিবেচিত হতো। শঙ্কর যদি নিছক ভদ্রলোক হতেন, তাহলে তিনি বুদ্ধের গঠনমূলক সমালোচনা করতেন। যেহেতু তিনি অজাতবন্ধু হতে চাননি, সেহেতু তিনি চিরপুরাতন কথাতেই নতুন সুর লাগালেন. সেইহেতু বুদ্ধের পর এলো শঙ্করের যুগ। শঙ্করের সময়ের লোকেরা নিশ্চয়ই তাঁকে ডেসট্রাকটিভ বলে আঘাত করতে চেয়েছে। কিন্তু শঙ্কর জানতেন ক্রিটিসিসম কখনও কন্‌স্ট্রাকটিভ হয়না।

আগে ডেসট্রাক্‌ট্ করো তারপর সেই ভূমির ওপর তৈরী করো নব সৃষ্টির ভূমিকা। ঈশ্বরের হচ্ছে রি-ক্রিয়েশন। এ দুয়ের মাঝখানে বিচ্ছেদের সেতু নির্মান হচ্ছে ক্রিটিকের কাজ। এবং একাজ ধন্যবাদের তোয়াক্কা রাখেনা বলেই,—এ ধন্য। ক্রিয়েশন না হলে ক্রিটিসিসমের যেমন অর্থ নেই, তেমনই ক্রিটিসিসম ছাড়া ক্রিয়েশন নিরর্থক। এবং এই ক্রিটিসিসম বন্ধুর প্রশংসা পত্র নয়; রুধিরাত্মক, ধ্বংসাত্মক এবং বন্ধুর। নবসৃষ্টির সে-ই সবচেয়ে বড় সহায়; অগ্রগমনের অগ্রদূত। ক্রিয়েশনকে লোকে মনে রাখে; ক্রিটিককে কেউ মনে রাখে না। জননী এবং তার সন্তান এই নিয়েই জগৎ। কিন্তু সন্তানকে যে জননীর গর্ভ থেকে বার করে আনে সেই ধাত্রীকে কেউ বিধাতৃপুরুষের সম্মান দেয় না। তার কারণ অনুধাবন করা এমন কিছু শক্ত নয়। যার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবার কথা আমাদের তার প্রতি কৃতঘ্নতা প্রকাশেই অসাধারণ মানুষ তার কীর্তির চেয়ে বৃহৎ।

ছয়

খোঁড়া লোকের পায়ে তেল দেওয়ার চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আর কিছু হতে পারে না।

*   *   *

কোন চাকর চুরি করে ধরা পড়লে কোনো মনিব যখন বলে যে, 'তুই দশটা টাকা চেয়ে নিলি না কেন, আমি এমনি দিতাম,'—তখন জানবেন সেই চাকরের চেয়েও সেই মনিব অনেক বড় অপরাধী। চাইলে যারা দশটা পয়সাও কখনও দেয়না, তারাই এরকম কথা বলে।

*   *   *

পৃথিবীর প্রায় সব মহৎ উপন্যাস আত্মজীবনীমূলক; এবং মহৎ আত্মজীবনী মাত্রই উপন্যাস জাতীয়।

*   *   *

ভূত নেই, কিন্তু তাকে দেখা যায়, ভগবান আছেন, কিন্তু তাঁকে দেখা যায়না।

*   *   *

প্রজাপতি কেন কিছুই সঞ্চয় করেনা এবং মৌমাছি কেন শুধুই সঞ্চয় করে, এ জিজ্ঞাসার জবার কোনো প্রজাপতির জানা নেই এবং সব মৌমাছিরই অজানা।

*   *   *

মানুষ যখন বাঘকে মারে তখন মানুষের ছবি খবরের কাগজে ছাপা হয়। কিন্তু বাঘ যখন মানুষকে মারে তার ছবি বনের পাতায়

মুদ্রিত হয়না। এ থেকে এই উপসংহার টানা যায় যে ইতিহাস মাত্রই বিজয়ী লোকের রচনা ; পরাজিতের কোনো ইতিহাস নেই।

* * *

নাসিরুদ্দীন রাস্তার আলোতে কি যেন খুঁজছিলেন। একজন তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাব দেন যে, বাড়িতে একগোছা চাবি তিনি হারিয়েছেন। বাড়ীতে যে চাবি হারিয়েছে সে চাবি রাস্তায় খোঁজা কেন, এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে নাসিরুদ্দীন বলেন যে, বাড়িতে আলো নেই ; আলো যেখানে আছে সেখানেই চাবি খোঁজার মানে হয়। অর্থাৎ নাসিরুদ্দীন কি এই বলতে চেয়েছিলেন যে জীবন জিজ্ঞাসার জবাব যে ঘরে বন্দী আছে সেই ঘর খুলবার চাবি আমাদের ঘরেই আছে কিন্তু কোথায় আছে দেখবার মতো চোখেরই শুধু অভাব।

* * *

নাসিরুদ্দীনের আর একটি। নাসিরুদ্দীনের স্ত্রী স্বামীকে বাজার থেকে মাংস এবং একটি রাঁধুনীর কাছ থেকে মাংস রান্নার প্রণালীটা আনতে বলেছিলেন। মাংস কিনে, প্রণালী জেনে নাসিরুদ্দীন যখন ফিরছেন তখন একটা চিল ছোঁ দিয়ে মাংসটা নিয়ে গেল। চিলটাকে উদ্দেশ্য করে নাসিরুদ্দীন চীৎকার করে বলে উঠলেন, 'ওরে বোকা মাংস নিয়ে তুই কি করবি, রান্না করবার কায়দা, এই ছাখ, আমার হাতের মুঠোয়'! অর্থাৎ উপকরণের অভাব নেই ; অভাব কেবল রাঁধুনীর।

* * *

সময়ের সমুদ্রতীরে স্বষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে, মানুষ বালির কণার চেয়েও ক্ষুদ্র-বই কিছু নয়,—বলেছেন জগতের যতেক মহাপুরুষ ;

আমরা কাপুরুষ তাই বলতে পারিনি যে, এই জ্ঞানও কিন্তু মানুষেরই আবিষ্কার।

*　　　　*　　　　*

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র,—এই চারবর্ণ যদি সমাজে না থাকে তাহলে ব্রাহ্মণ যুদ্ধ করে, ক্ষত্রিয় শস্য ফলায়, বৈশ্য দর্শন পড়ায় এবং শূদ্র ধর্মঘট করে। সমাজের বর্তমান ব্যবস্থা বোধহয় এরই প্রতিচ্ছবি।

*　　　　*　　　　*

সেক্সপীয়র সম্পর্কে প্রায় সব কথাই বলা হয়েছে, কেবল এই প্রয়োজনীয় কথাটি ছাড়া যে রবীন্দ্রনাথ এবং সেক্সপীয়র দুজনেই যেমন অনেক লিখেছেন, তেমনই অনেক কিছু লেখেননি। যা লিখেছেন তার মধ্যে অনেক কিছুই না লিখলেও পারতেন। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, অতি প্রসাধনের মতোই অতি কথনও ঈষৎ ভালগার।

সাত

অজাতশত্রু কথাটা বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়; হওয়া উচিত লজ্জার কারণ হিসেবে। কোন মৃত লোক, যার সম্পর্কে বলবার মতো কথা খুবই কম তার ক্ষেত্রেই কেবল অজাতশত্রু কথাটা আমরা ব্যবহার করতে বাধ্য হই। শক্তিমান পুরুষ সে-ই যে, অজাতবন্ধু। যার Rival নেই, পৃথিবীতে তার Arrival সম্পর্কে কে কবে অবহিত হয়। কালাপাহাড়ের জীবনের ব্রতই হচ্ছে লোককে বিব্রত করা। বন্ধু বৎসল হওয়া দুর্বলের ধর্ম; শত্রু বৎসল হওয়াই শক্তিমানের জীবনদর্শন। এই জন্যে ভক্ত রূপে ভগবানের দেখা পেতে যত দেরী হয়, রাবণ, হিরণ্যকশিপু কিংবা কংসের কৃষ্ণাচ্ছন্ন হতে সে তুলনায় সময় লাগে অনেক কম। জীবনের ধর্মই হচ্ছে শত্রুতা। জলে স্থলে নভোতলে, পাতালের অন্ধকার অতলে, অন্তরীক্ষ পার হয়ে অদৃশ্য অসীম অনন্ত শূন্যে পরমাশ্চর্য এই সৃষ্টির চরমাশ্চর্য প্রকাশ হচ্ছে জীবন রণরঙ্গভূমে গাণ্ডীব হাতে। ক্লৈব্য পরিত্যাগ করে শত্রুশূন্য করে এখান থেকে প্রত্যাবর্তনই পুরুষকারের পরিচয়।

মানুষের কোনো বন্ধু নেই। ভাগ্য নয়, প্রকৃতি নয়, গ্রহ-উপগ্রহ, বিগ্রহ কেউ নয় তার বন্ধু। মারতে মারতে মরতে মরতে শিরদাঁড়া সোজা করে উঠে দাঁড়িয়েছে যে, রুখে দাঁড়ানোই তার জীবন ও ধর্ম। সময়ের স্রোতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিজেকে আর পরিবর্তিত করতে পারবে না যেদিন, পৃথিবী নামক এই গ্রহ থেকে সেদিন বিদায় নিতে হবে তাকে।

বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। রৌদ্ররুক্ষ মাটির বুক বিদীর্ণ করে

পুরুষকারের ফলা চিরকাল ধনধান্যপুষ্পে ভরা করেছে বসুন্ধরাকে। বিশ্ব প্রকৃতির দেবদানবকে চুলের মুঠি ধরে নিজের ক্রীতদাসে পরিণত করেছে মানব। মানুষই মানুষের ভাগ্য বিধাতা। যত আঘাত সে বন্ধুর কাছ থেকে পেয়েছে, তার কণামাত্র কাঁটা শত্রুর হুল থেকে ফোটেনি। ভোলতেয়ার বলেছিলেন, 'God save me from my friends· I am quite capable of meeting my enemies'.

সত্য যেমন মিথ্যা, মিথ্যাই যেমন সত্য, তেমনই বন্ধুই শত্রু, শত্রুই বন্ধু। যে পুরুষের পৃষ্ঠদেশ শত্রু শরাহত নয়, তার জন্ম অসার্থক। শত্রুতাই হচ্ছে একমাত্র কীর্তি। শত্রুই শ্রদ্ধেয়। ভগবান এবং ভক্ত পরস্পরের বৈরী বলেই বন্ধু। এই জন্যেই পাখীকে তিনি ডানা দিয়েছেন উড়বার; আর মানুষের ডানা দিয়েছেন কেটে! ভাগ্যের ওপর কিম্বা ভগবানের ওপর নির্ভর না করে মানুষ নিজের পুরুষকার আর প্রতিভা দিয়ে ডানা মেলেছে দক্ষিণ মেরুর উর্ধে অজ্ঞাত তারার অজানা আলোকে। ভক্তকে, ভগবান দিয়েছেন মৃত্যু বিচ্ছেদ বিরহ বেদনার অশ্রুজল; ভক্ত তাকে রক্ত দিয়ে ধুয়ে ধুয়ে ফিরিয়ে দিয়েছে আনন্দ-শতদল করে। ভগবানের কাছে ভক্ত হার মানে নি; ভক্তের কাছেই ভগবান বারবার হার মেনেছেন।

প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে মানুষের সাময়িক হার, মহাকালের কণ্ঠে অপরাজিত মনুষ্যত্বের হার হয়ে দুলেছে প্রত্যেকবার। মহাভারতে অর্জুনের হাতে কর্ণের পরাজয়, অর্জুনের জয়ের চেয়ে কর্ণের পরাজয়কে দিয়েছে অনেক বেশি মহিমা। কর্ণের চেয়েও, রণগুরু দ্রোণের পায়ে একলব্যের গুরুদক্ষিণা, কুরুক্ষেত্র-কৌশলকে প্রদর্শন করেছে প্রচণ্ড বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ।

শান্তির বাণী যে বলে, বলে বন্ধুত্বের বাণী, সভ্যতার সে বৈরী।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত্ত,—এ বাণী যুঁই ফুলের গান নয়। মুক্তির পথ ক্ষুরধার দুর্গম। যে কৃষ্ণ বাঁশী হাতে বেণু কুঞ্জে বিরহবিবশ, সে কেষ্ট, যাত্রা দলের ধিনিকেষ্ট। জীবনকুরুক্ষেত্রে শঙ্খের মুখে অসংখ্যবার যাঁর ঘোষণা, 'সম্ভবামি যুগে যুগে',—রোদন ভরা বসন্তের রাতে দক্ষিণ সমীরে বিহ্বলা ধরায় তিনি ছলনা করতে আসেন। তিনি নন। জীবনকুরুক্ষেত্রের প্রলয়ের বজ্রাগ্নি শিখায় জ্বলে যাঁর মাথার মুকুট, সুদর্শন চক্রে যিনি শুভ-অশুভ সত্য-মিথ্যা আলোকঅন্ধকার মেঘ-রৌদ্রকে একই সঙ্গে বিনাশ করেন, তিনিই ভগবান। তাঁর ভক্ত আজও ভূমিষ্ঠ হবার অপেক্ষায়।

আট

যে মহাপ্রাজ্ঞ ব্যক্তি বলেছিলেন eat, drink and be merry, তিনি অশ্বত্থামা হতঃ ইতি গজ জাতীয় অর্ধসত্য বলেছিলেন মাত্র। আসল সত্য হচ্ছে, eat, drink and dont marry। যে লোক জীবনে গায়ত্রী জপ করে না, গলায় পৈতে দেয়না সে লোকও তার ছেলে কিম্বা মেয়ে অসবর্ণ বিবাহ করলে মর্মাহত হয়। এর মূলে কোন যুক্তি নেই; কেবল দুর্মর কুসংস্কার আছে! রেজেস্ট্রী বিয়েতে যাদের বাপ মা'র মান যায় তাদের কিছুতেই বোঝানো যাবেনা যে পুরোহিত ডেকে বিবাহ দিলেও কচিৎ সুখের হয়। They married and lived happily everafter,—এ হচ্ছে রূপকথার মতোই অলীক এবং অলৌকিক। বিবাহ সুখের জন্যেও নয়, অসুখের জন্যেও নয়। সমাজের সুবিধের জন্যে নিজেদের অসুবিধে করা। একদিন এর প্রয়োজন ছিল; আজ এর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে।

দৈহিক মিলনের সামাজিক সম্মতির নামই বিবাহ। এর চেয়ে মহত্তর উদ্দেশ্যে বিবাহের কথা মহাপুরুষের বাণীতেই শুধু বিধৃত আছে। প্রশ্ন উঠতে পারে যে বিবাহ ব্যতিরেকে দৈহিক মিলন সামাজিক ক্ষতির কারণ হতে পারে কি না, তার উত্তরে বলা যায় যে অবিবাহিত লোকের তুলনায় বিবাহিত লোকেরা অনেক বেশি সামাজিক শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী এ ব্যাপারে। বিবাহ মানুষকে বাধ্য করে শৃঙ্খল পরতে। যা সে মনে নেয়না তাকেও সে মেনে নেয়। বাধ্য হওয়া মানেই বধ্য হওয়া। তখন থেকেই সে মনে মনে

অবাধ্য হতে থাকে। বিবাহ করতেও পার, নাও করতে পার কিন্তু সন্তান মাত্রেরই বৈধ কিম্বা অবৈধ দায়িত্ব নিতে পিতামাতা বাধ্য, এই হওয়া উচিত আজকের আইন।

বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপারেও সবচেয়ে আপত্তিজনক যা তা হচ্ছে ছেলেমেয়েদের ওপর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য। আজকের বাপ মা দুজনেই যখন চাকরী করতে বেরয় তখনও তাদের ছেলেমেয়েরা যে ভাবে মানুষ হয় তা মনের স্বাস্থ্যের অনুকূল আবহাওয়া নয়। যে প্রয়োজনে একদিন বিবাহ আবিষ্কৃত হয়েছিল, যে প্রয়োজন মিটে যাওয়ার পরেও সে ইনস্‌টিটিউশনকে জোর করে যত খাড়া রাখবার চেষ্টা করা হবে, ততই সে হাতীর মতো চোরাবালিতে তলিয়ে যাবে। পৃথিবী জুড়ে বিবাহ এবং বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা সমান হয়ে এল যে তার কারণ বিবাহ এবং বিবাহ বিচ্ছেদ, এর কোনটাতেই কনভিকশন নেই; আছে কনভেনশন। সতীদাহ প্রথার মতোই ডিভোর্সও একটা অন্ধ কুসংস্কার মাত্র। একদিন লোকে সতীদাহকেই সতীত্বের সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ মনে করতো, যেমন আজ বিবাহ বিচ্ছেদকেই লোকে মনে করে প্রগতির পরাকাষ্ঠা।

বিবাহে অতৃপ্ত হয়ে যারা বিবাহ বিচ্ছেদ করে তারা বিবাহিত লোকেদের চেয়েও অতৃপ্ত। এর কারণ, তৃপ্তির মূল বিবাহের মধ্যেও নেই বিবাহ বিচ্ছেদের মধ্যেও নেই। এর মূল আছে নিজের মধ্যে। এই জন্যে ওদের দেশে বলেছে know thy self; আমাদের দেশে বলেছে, আত্মানং বিদ্ধি। নিজেকে জান। এর চেয়ে বড় কথা কোন দেশে কোনকালে আর কেউ বলেনি।

এই জানা বুদ্ধি দিয়ে নয়, নয় বিদ্যা দিয়ে। এই জানা আনন্দে এবং বেদনায় জানা। আনন্দের বেদনায় এবং বেদনার আনন্দে।

আমি এর আগে মনীষার কথা বলেছি। বিশুদ্ধ মনীষা দিয়ে জীবনের সকল সমস্যার সমাধান হয়। কেবল একটি সমস্যার হয়না। সে সমস্যা হচ্ছে, কেমন করে নিজেকে জানা যায়।

শরাহত ক্রৌঞ্চ মিথুনের কান্না শুনে, এই পৃথিবীর প্রথম কবি বাল্মীকির মনে যে শোক হয়েছিল তার থেকেই শ্লোকের জন্ম। এই শোকই পৃথিবীর সমস্ত অশোকের মূলে। দুঃখ না পেলে কেউ সত্যকে পায়না। সেই জন্যে আমাদের saddest thought-ই হচ্ছে sweetest song. ব্যথার প্রলেপেই কেবল জীবনের গোলাপে জাগে বাণী। চরম আঘাত থেকেই পরমাশ্চর্য এই উপলব্ধি হয় যে,

"আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না,
এই জানারই সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা।

এই জানা, জ্ঞান দিয়ে সম্ভব নয়। কারণ, 'দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে,—এর চেয়েও বড় সত্য হচ্ছে,—দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার জ্ঞানের ওপারে!

নয়

যে মানুষ এককথার লোক তাকে আমরা দারুণ তারিফ করি। মরদের বাত্ হচ্ছে হাতির দাঁত,—দেহাতী প্রবাদ হচ্ছে এই। কনসিস্ট্যনসির এতে আমাদের দারুণ ফ্যান্সি আছে। প্রকৃত ভদ্রলোক হচ্ছে সেই যার কথার নড়চড় হয়না। কথা দিয়ে কথা রাখতে না পারা দারুণ সামাজিক অপরাধ। উল্টো করে ভারতচন্দ্র তাই বলেছেন, 'সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর।' অর্থাৎ যে বেশী কথা বলে সে বাজেকথা বলে। আমরা জানিইনা যে পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যত স্মরণীয় উক্তি করেছেন অবিস্মরণীয় পুরুষরা, তার মধ্যে একটি কি দুটি বাজে কথাই শেষ পর্যন্ত কাজের কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজে কথা বলা যে কারুর পক্ষেই সহজ ; খেতে দাও পরতে দাও চাকরী দাও মেয়ের পাত্র জোগাড় করে দাও থেকে শুরু করে রূপ দাও যশ দাও শত্রু বিনাশের বর দাও,—একথা বলবার জন্যে মাথা গোবর ভরা হলেও আটকায় না। কিন্তু বাজেকথা বলতে পারাই শক্ত। 'বলার কথা না থাকলেও বলতে যে জন পারে, ওস্তাদ সে সেলাম করি তারে।'

বাচালতা আমাদের কাছে নিন্দনীয় অথচ ঈশ্বরের অনিন্দ্য রূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমরা বলি, তিনিই ঈশ্বর মূককে বাচাল করেন যিনি। আমরা নিজেরা নির্বোধ তাই জানিনা যে গর্দভই হচ্ছে এ পৃথিবীতে একমাত্র কনসিসট্যান্ট। গ্রেট মেন যারা তাদের কথা বলার ডিকশনই হচ্ছে কন্ট্রাডিকশন। 'মরণরে তুহু মম শ্যাম সমান' এবং 'তবে মৃত্যু দূরে যাও',—একই রবীন্দ্রনাথ একমুখে এই দুরকম

কেবল নয় কত হরেক রকম কথাই যে বলেছেন জীবনভোর, যার একটা আরেকটার এতদূর বিপরীত, উত্তর ও দক্ষিণমেরু, আকাশ এবং পাতালের, জীবন এবং মৃত্যুর চেহারা নয় যত বিসদৃশ। আসলে আমরা সবাই মেজাজের ক্রীতদাস। যখন যে রকম মুডে থাকি তখন সেই রকম কথা বলি। যখন মুড্ ভাল তখনকার কথা হচ্ছে, 'এমন দিনে তারে বলা যায়'; যখন মুড্ খারাপ তখনকার প্রলাপ হচ্ছে ; 'কা তব কান্তা কস্তে পুত্র' ইত্যাদি।

এক সময় কোনো একটা কথাকে সত্য বলে মনে হয়েছিল, এখন তার চেয়ে মিথ্যে আর কিছু আমার কাছে নেই, তবুও সেই এক কথা বলব কেন? আমি যদি কাপুরুষ হই তবেই আমি ভদ্রলোক, তবেই আমার কথা অনড় এবং অচল। আর আমি যদি পুরুষ হই তাহলে আমার সত্য ডিনামিক। যারা ভদ্রলোক যারা কাপুরুষ যারা Meek, তারাই কখনও Dynamic হয় না।

বিশ্ব প্রকৃতির দিকে তাকালেও আমরা দেখব তারা সকাল সন্ধ্যায় আকাশ পাতাল ফারাক। বর্ষার দিনে রোদের মতো শীতের আকাশে কালো মেঘের মতো, হ্যাঁ-কে না-করা, না-কে হ্যাঁ করার মতো। বিশ্বপ্রকৃতিই হচ্ছে প্রকৃতি বিরুদ্ধ কাজ করা। একদিন আমরা বলেছিলাম যে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে সূর্য আবর্তিত হচ্ছে, আরেকদিন বললাম, সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী ঘুরছে। এই একটা কথা বলবার জন্যে গেলিলিওকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হ'লো। যেখানে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন 'I plead guilty'. ; এবং আসামীর কাঠগড়া থেকে নেমে সেই গেলিলিওই বললেন, 'And I dont'.।

পরাধীন ভারতবর্ষ থেকে পলাবার আগে স্বাধীন ভারতবর্ষের পথে অগ্রসর প্রথম পদাতিক নেতাজী সুভাষ বৃটিশ জেল পেরলে

বাড়ি এসেছিলেন। অর্থাৎ তিনি কথা দিয়েছিলেন যে তিনি পালাবেন না। সে কথা তিনি যদি রাখতেন তাহলে সুভাষচন্দ্রই যে নেতাজী হতেন না তা নয়, ভারতবর্ষের স্বাধীনতাই পিছিয়ে যেত আরও কয়েকবছর। সুভাষচন্দ্র একজন লোকের মতো লোক না হয়ে, কেবল ভদ্রলোক হলে, ভুবনমনোমহিনী এই ভারতবর্ষের আকাশে স্বাধীনতার আলোক আজও এসে পৌঁছত কিনা কে বলবে।

সাংসারিক জগতে কথা দিয়ে কথা না রাখলে কাজ কর্মের অসুবিধে হয়। কিন্তু জগৎ সংসারে সব ব্যাপারেই সব কথা রাখতে হবে এমন কথা নেই। মতের ক্ষেত্রে একেবারেই নেই, ওই হচ্ছে আমার অভিমত। এবং এখনও পরের মুহূর্তেই আমি পাল্টাতে পারি, এমনও স্বাধীনতা আমার আছে। মৃত লোকের চেয়েও অপরিবর্তনীয় হ'লো জীবন্মৃত লোক। মরার চেয়ে জরা অনেক বেশি স্থবির। বীর কেবল সেই, যে মত বদলাতে ভয় পায়না। কেবল কাজের কথা যে বলে তার চেয়ে হতভাগ্য কাপুরুষ আর নেই। তার বাণী হচ্ছে ঃ সদা সত্য কথা বলিও। যথার্থ পুরুষ যে, তার জীবন ও বাণী হচ্ছে ঃ সত্যের মতো মিথ্যা এবং মিথ্যার মতো সত্য আর কিছু নেই।

দশ

দুটি অদ্বিতীয় বাজে কথা বলে বলে আমাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে গেছে। একটির নাম, জীবন-দর্শন; আরেকটির নাম,—জীবন যন্ত্রণা। গোঁফ দাড়ি ওঠাই প্রাপ্তবয়স্কতার একমাত্র নিদর্শন, তাই, না হলে আমরা জানতাম মানব জীবনের কোনো দর্শন নেই কারণ জীবন উদ্দেশ্যহীন। জীবনের কোনো পার্পোস নেই বলেই হরেক রকমের পোস দরকার হয়েছে। সবগুলি পোসের মিলিত নাম, সামটোটাল হচ্ছে জীবন-দর্শন। সাহিত্য সংগীত শিল্প যার মধ্যে জীবন দর্শন যত গভীর অর্থাৎ যার ধাপ্পা যত কনভিনসিং সে ততবড় সাহিত্যিক ও শিল্পী। জীবন থেকে মুখ ফিরিয়ে ঠাকুর ঘরে আমরা দেখি, রবি ঠাকুর যা দেখেন লেখার ঘরে বসে, চোখ বুঁজে সেই দেখার নামই জীবন দর্শন। জীবন যুদ্ধ কথাটার মানে হয় কারণ রাখতে প্রাণান্ত। উদয়াস্ত পরিশ্রম করে, মুখে রক্ত তুলেও জীবন-যুদ্ধে আমরা যখন পর্যুদস্ত, তখন ট্রুথ ইস বিউটি বিউটি ট্রুথ' কিম্বা 'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির মোর' অথবা 'ব্যথার প্রলাপে মোর গোলাপে গোলাপে জাগে বাণী,—এ সবই অন্তঃসার শূন্য রঙিন বুদবুদ ছাড়া আর কিছু মনে হয় না।

দৈহিক যন্ত্রণার মানে বুঝি, আর্থিক যন্ত্রণারও; জীবন যন্ত্রণার কোনো হদিস আমি পাইনি। জীবনও একটা যন্ত্র একথা আমি বিশ্বাস করি। ঘড়ির মত কখনও চলে, স্প্রিং কেটে গেলে সাময়িক অচল হয়, মাঝে মাঝে তেল দিতে হয় এবং বে-দম হলে আর কিছুতেই চলেনা। এর বাইরে আর যেসব গভীরতর যন্ত্রণার কথা

লেখক শিল্পী দার্শনিকরা আমাদের শুনিয়েছেন তা সোনার বাটি। মানব জীবনকে যারা দারুণ জটিল, সমস্যাসঙ্কুল ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করেছেন তাঁরা তা করেছেন নিজেদের স্বার্থে। অনন্ত যাদের অবসর, যারা স্থবির, ফ্রাসট্রেটেড যারা কাপুরুষ, অলস, অলীক ও অলৌকিক বিশ্বাসী এবং ইহকালে অবিশ্বাসী তাদেরই উদ্ভট চিন্তার এ্যাবর্সান হচ্ছে জীবন যন্ত্রণা।

এই পৃথিবীতে ষাট কি সত্তর, বড় জোর আশি নব্বুই বছরের জন্যে আমরা আসি। আসি অপরের ইচ্ছেয়, তাই কেন আসি এ প্রশ্ন তোলা অনর্থক। যাইও, নিজের ইচ্ছেয় নয় তাই কোথায় যাই এ নিরুত্তর জিজ্ঞাসাও অর্থহীন। জীবনকে পান্থশালা কিম্বা লাইফ ইস এ স্টেজ অথবা হেথা নয়, হেথা নয় অন্য কোথা অন্য কোনখানে বলে কেউ কাব্য করলে তা যতই শোনার মত বিষয় হোক, আসলে তা সোনার পাথর বাটি সুনিশ্চিত।

জীবনকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারাই সবচেয়ে শক্ত কাজ। পৃথিবীতে কমনসেন্সই সবচেয়ে আনকমন। এ বস্তু যার নেই সেই কবি শিল্পী দার্শনিক সাজে। চোখ বুঁজে জীবন দর্শন করে সেই, যে জীবনে যে সব মানুষের নেই তা নিয়ে অষ্টাদশপর্ব মহাভারত রচনা করতে বসে। যে হেতু শরীর ছাড়াও মানুষের মন নামক বস্তু আছে, সেই হেতু সেই মনের ক্ষুধাতৃষ্ণা মেটাবার জন্যেই সাহিত্য-সংগীত চৌষট্টি কলা দেখানোর আয়োজন অনিবার্য, একথা যদি ঠিকও হয়, তবুও যেকথা বেঠিক তা হচ্ছে, এ গুলির চর্চা যে না করে, সেই অমানুষ। সময় কাটানোর খেলনা যেমন কারুর ডাকটিকিট জমানো, তাস খেলা কিংবা খেলা দেখা। ঠিক তেমনই সাহিত্য শিল্প, দর্শন, কিছুক্ষণ সময় কাটানোর খেলনা ছাড়া আর কিছু নয়, একথা কে বলবে, কবে বলবে আর!

ভালো কবিতা, আশ্চর্য গান, অপরূপ ছবি আমাদের মনে এক্সট্যাসি আনে, স্বীকার করি। কিন্তু আনে বলেই তার মধ্যে গভীরতর জীবনদর্শন খুঁজে বার করতেই হবে, এই রুচিতে আমার সায় নেই। দৈহিক আনন্দও এই এক্সট্যাসিই দেয়। কিন্তু দৈহিক আনন্দ স্থূল অতএব তা বর্জন করো ; মানসিক উল্লাস সূক্ষ্ম অতএব তা নিয়ে কাব্য কর, এ হচ্ছে প্রাপ্ত বাক্য ; প্রাপ্ত বয়স্কর বক্তব্য নয় কখনই। জীবন দর্শন করবার জিনিস নয় ; ভোগ করবার উপচার। জীবনের রাজ ভোজ যার পাত পেড়ে বসবার যোগ্যতা নেই। সেই জীবন যন্ত্রণার নামে বেভুল বকে। এবং আমরা তার স্তবে গদগদ হই, বাস্তব বিস্মৃত হয়ে। এরই নাম এস্‌কেপ! জীবন থেকে যে পলাতক সে বেচারা জানেই না যে, মহত্তম সাহিত্য কীর্তির চেয়েও যে কোনও তুচ্ছতম জীবনও বৃহৎ!

এগারো

সত্যর চেয়ে মিথ্যে এবং মিথ্যের চেয়ে সত্য এ পৃথিবীতে আর কিছু নেই। সত্য কথা বলতে গিয়ে আমরা যে কেবল ভয় পাই তা নয়; সত্য কথা শুনতেও আমরা সবচেয়ে নারাজ। শাস্ত্রে বলেছে সত্য বলো; কিন্তু অপ্রিয় সত্য বোলো না। কিন্তু সত্য কখনও কারুর প্রিয় হয়না। যা অপ্রিয় তাই সত্য,—একথা বলছি না; কিন্তু যা সত্য তা-ই অপ্রিয়,—একথা বলছি। Child and Truth never come to this world without causing pain to some body। সত্য কথা কেউ কেউ তবুও বলে। ক্রুশে বিদ্ধ রক্তাক্ত কেউ কেউ, হেমলক হাতে নিঃশঙ্ক আর কেউ অথবা সূর্যের চারদিকে এই পৃথিবী নিত্য প্রদক্ষিণরত বলার জন্যে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয় কাউকে। তবুও তারা যা বিশ্বাস করে তাই বলে; যা বিশ্বাস করেনা তা কখনও বলেনা। কেন?

এর কারণ হচ্ছে এই, মৌমাছি যেমন গুঞ্জরণ না করে পারেনা, কোকিল ডাকলে যেমন পঞ্চমে ডাকে, প্রজাপতি যেমন সঞ্চয়ে অক্ষম, তেমনই কেউ কেউ স্বভাবেই সত্য কথনের অপরাধে অপরাধী। সত্য না বলেই পারেনা তাই বলে। এ পৃথিবীতে সে সবচেয়ে নিঃসঙ্গ। এবং সে কখনও দল গড়ে না। একশত দলে যা করতে পারে না, এক শতদলে তা করতে পারে,—সৃষ্টির চরম ও পরম বার্তা নিজেদের জীবন দিয়ে ঘোষণা করতে সে আসে। কেউ ভগবানের, কেউ শয়তানের দূত। আসলে সেই কোটিকে গোটিকেরাই সব; আমরা বাকি সবাই ভালগার রিপিটেশানের ক্ষণিক উৎসব মাত্র।

এই সত্য বাদী মানুষদের আমরা সর্বনাশ করি বাস্তব বিবর্জিত স্তবের মহিমায়। মানুষকে আমরা অবতার করে তুলি। অসৎ সঙ্গে যে সর্বনাশ হয়, পরম সৎ ব্যক্তির ধর্মনাশ হয়, এ দুনিয়ায় তার চেয়ে ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত আর যে কোন ক্ষেত্রেই বিরল। একটি লেকিকে ঘিরে একাধিক ফ্যানাটিক দল গড়ে। তারপর যে কোন দলের, তাই নিয়ে কোন্দলের সূচনা। পৃথিবীতে যত রক্তপাত তা সত্যের জন্যে শুরু হয় এবং অচিরকালের মধ্যে সেই সত্য থেকে শত হস্ত দূরে যারা সতত তারা মার পিট লাগায় নিজেদের মধ্যে। ধর্মের বেলায় যা, ধর্মঘটের বেলায়ও তাই। সব 'বাদ'-ই মানুষ বাদ, অনর্থক বাদানুবাদে অবক্ষয়িত।

গুরুকে নিয়ে বিপদ নয়। কারণ তিনি দ্বিপদ মানুষ। বিপদ হচ্ছে সেই শিষ্যদের নিয়ে যাদের ধর্ম হচ্ছে 'দুয়ে চার নয়, দুয়ে দুয়ে দুধ ক্ষীর ননি চর্ব চুষ্য লেহ্য পেয়র সন্ধান করা। গুরুর প্রথম দুচারজন চেলাও তত ভয়ংকর নয়, যত মারাত্মক পরবর্তী চামুণ্ডারা। গুরুর কোনো বক্তব্যের প্রতিবাদ করলেই চামুণ্ডারা চেলা কাঠ নিয়ে তেড়ে আসে। যে ধর্ম অহিংসার কথা বলে, তাদের দলের লোকই পরমত-অসহিষ্ণুতার পরিচয় দেয় বেশী। সেই জন্যেই যিশু খৃষ্টের পর আর একজনও খৃশ্চান জন্মায় না; কার্ল মার্কসের পর আরেকজন মার্কসিষ্ট।

শ্রীরামকৃষ্ণ শিবনাথ শাস্ত্রীর কাছে একবার অভিমান করে বলেন যে, 'তোমাকে এত দেখতে ইচ্ছে করে তুমি আসনা কেন? শিবনাথ বলেন, 'কি করে আসব, সবাই আপনাকে ঈশ্বর বলে ঘোষণা করেছে।' ঠাকুর অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন: 'নির্বোধের অশেষ দোষ; ঈশ্বরের কখনও ক্যানসার হয়?' রামকৃষ্ণ পরমভক্ত ঈশ্বর সাধক এ কথা তাঁর সমসাময়িক কালের সকল বড় মানুষই

স্বীকার করেছেন। কিন্তু রামকৃষ্ণকে আরেকটি ঠাকুর রূপে প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত আমরা মনে করি যে রামকৃষ্ণকে যথেষ্ট ভক্তি দেখানো হলনা। একে ভক্তি বলেনা। এরই বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য নাহি নামে ইত্যাদি।

ভক্ত সেই যে ধ্যান করতে জানে বনে, নির্জনে, গৃহকোণে। সাধনাকে যে গোপন করতে জানে সেই হচ্ছে সাধক। সে কখনও গুরুকে নিয়ে সোচ্চার হয় না। নিরবে নম্র সংযত স্বল্প বাক সেই ভক্ত জীবন ও সাধনাকে অচ্ছেদ্য অদৃশ্য সূত্রে গেঁথে তোলে। এবং প্রার্থনা করে: 'এই জীবনের আলোকেতে পারি তোমায় দেখে যেতে, পরিয়ে যেতে পারি তোমায় আমার গলার মালা।'

ভক্তি আর উচ্ছাস এক জিনিস নয়। ভক্তি হচ্ছে সত্য, উচ্ছাস অসত্য। সত্য কী? 'সত্য যে কঠিন বড় সে কখনো করে না বঞ্চনা' বঞ্চনা কী? বঞ্চনা হচ্ছে তাই, যা বিশ্বাস করিনা তাই বলা; এবং যা বলি তা বিশ্বাস না করা। এরই নাম কম্প্রোমাইস। কম্প্রোমাইস করতে হয় আমাদের কেননা আমাদের কোনো ক্যারেকটার নেই। ক্যারেকটার যার আছে, সেই আস্তিক অথবা নাস্তিক হতে পারে। ক্যারেকটার যার নেই সে আস্তিকও নয় নাস্তিকও নয়। এই জন্যে পৃথিবীতে আমরা প্রায় সবাই আস্তিকও নই নাস্তিকও নই।

দেবতা কে? না, তিনিই দেবতা যিনি স্তবে সন্তুষ্ট হন। এমন কি বাঁ হাতে পুজো পেলেও যিনি শাপ দেন না। আর চরিত্র কার? চাঁদ সদাগরের। সর্বরিক্ত হয়েও যে বলতে পারে মদায়ত্তং হি পৌরুষম। আমি শিবের ভক্ত, যে হাত দিয়ে শিবের অর্চনা করেছি সে হাতে মনসার পূজা চাঁদ সদাগর করবে না। এই হচ্ছে যথার্থ পুরুষের উক্তি। মহাপুরুষেরও নয় কাপুরুষেরও নয়।

বারো

এই লেখার পাশেই রেজেষ্ট্রী বিবাহ অফিসে এবং আয়রণম্যান নীরোদ সরকার প্রণীত পুস্তকের বিজ্ঞাপন আকস্মিক অথবা ভেবে চিন্তে বসানো, জানিনা। তবে একদা একটি কি দুটি ভালো ছোট গল্পের লেখক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের উপন্যাস লেখা উপসর্গ বিশেষ। গল্প লিখতে জানলেই উপন্যাস লেখা যায় না ; যেমন সাইকেল চালাতে জানলেই উড়ো জাহাজ চালানো যায় না,—একটি কি দুটি অসাধারণ গল্পের লেখক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কাছে এই সাধারণ বুদ্ধিটুকু আশা কি খুব বেশী ?

*　　*　　*

অমৃতয় ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারীর কাগজে পাচ্ছি ঃ

'আমাকে খুঁজেছিলে ?'

'কই না তো।'

বাস্তবিকই মনে পড়ছে না। অলকার, জীবনে কোনদিন বিতোষকেই খুঁজে পেতে চেয়েছে কিনা! বিতোষ তবু দাঁড়িয়ে থাকে। সে কেবল অপেক্ষা করে সেই মুহূর্তের যে মুহূর্তে অলকা তাকে ডেকে নেবে। বলবে ঃ এস!

বিতোষ ? আশুতোষ সন্তোষ, শিবতোষ, পরিতোষ শুনেছি; কিন্তু বিতোষ! বাবার জন্মে শুনিনি। কিন্তু বিতোষের তুলনায় অলকা বড্ড সাধারণ হয়ে গেল না ? অলকার বদলে নায়িকার নাম ফুচকা কি জমতো যদি বিতোষ দাঁড়িয়ে থাকতো সেই মুহূর্তের অপেক্ষায় যে মুহূর্তে ফুচকা বলবে ঃ এস, খাবে।

কর্ণ বলেছিলেন, "মদায়ত্তং হি পৌরুষম।" কিন্তু পৌরুষেও যে শেষ পর্যন্ত জীবনযুদ্ধে জয়লাভ করা যায় না, কর্ণের চেয়ে সেই মহত্তর পরাজয় ইতিহাসে আর কোথায়? জীবনে যে জয়লাভ করে সে ভাগ্যবান, কিন্তু সে যথার্থ পুরুষ কখনই নয়। মহাপুরুষ কিংবা কাপুরুষ, ভাগ্য সহায় কিংবা অসহায় হ'লে এর যে কোন একটা হওয়া অনিবার্য ভবিতব্য। কিন্তু যথার্থ পুরুষ যে—মহাপুরুষও নয়, কাপুরুষও নয়, জীবনে কোথাও সে ভাগ্যকে স্বীকার করে না। গ্রহ, বিগ্রহ, ঈশ্বরের অনুগ্রহ কারোর কাছেই তার জীবনের বাণী কখনই এ নয় যে;

"আমার মাথা নত করে দাও হে
তোমার চরণ ধূলার তলে।"

অহংকারই পুরুষের একমাত্র অলংকার।

এই পৌরুষেরই আর এক নাম চরিত্র। যার চরিত্র আছে, সে কখনই বলবে না, যে, "There is nothing unfair in love and war." সুখ আর সন্তোষ যেমন এক জিনিস নয়, জয়লাভ এবং বীরত্বের মধ্যে তেমনই জমিন এবং আসমানের ফারাক। ভাগ্য সহায় হ'লে কিংবা না হ'লে একজন জিততে পারে অথবা হারতে। কিন্তু যার চরিত্র আছে, সে জয় এবং পরাজয় কারোরই ভৃত্য নয়। জীবন এবং মৃত্যু, জয় এবং পরাজয়, স্বর্গ এবং মর্ত্যের সীমাহীন ঊর্ধে সে একলব্য। অর্জুন জয়লাভ করেছেন, কর্ণের রথ প্রোথিত হয়েছে মৃত্তিকায়; এই দুজনকেই পরাজিত করবার অসীম সাধনাকেও যা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে, স্বর্গে, মর্তে, পাতালে এই ত্রিভুবনে, এক সে-ই অপরাজিত। তারই নাম মনুষ্যত্ব।

আমি মানুষ;—দেবতা এবং দানব এই দুয়ের চেয়েই বড়। এই অহংকারই এই হুংকার দিতে সমর্থ "Man can be destroyed,

but not defeated." অর্জুন জয়ের কাঙাল, কর্ণ সূত পুত্র হওয়ার জ্বালা ভুলতে অক্ষম ; কিন্তু কুম্ভকর্ণ, দানবকুলে যার জন্ম, মানবকুলের বিরুদ্ধে যার চেয়ে বড় বীর রাবণও নন, ব্রহ্মার কাছে তিনি যখন বরপ্রার্থী হ'লেন, তখন দেবতারা প্রমাদ গণল বিনা বরেই যে কিনা দেব-মানবের সমান সংহারক, সে যদি আবার ব্রহ্মার বর পায় তাহ'লে উপায় ?

কিন্তু না। রাম এবং রাবণ এ তুজনের চেয়েই যিনি স্থিতবুদ্ধি অনেক বেশি, যিনি জানতেন যুদ্ধ করাটাই নির্বুদ্ধিতা, সেই কুম্ভকর্ণ ব্রহ্মার কাছে বর চাইতে গিয়ে বললেন : "আমাকে ঘুমোতে দাও।" পৃথিবীতে এর চেয়ে সেনসিব্‌ল্‌ বর আর কেউ কখনও চায় নি। কুম্ভকর্ণ জানতেন জীবনের কোন উদ্দেশ্য নেই। মহাপুরুষ, কাপুরুষ ; আদর্শবান, নিষ্ঠাবান এবং আদর্শহীন, নীতিভ্রষ্ট, এ তুই-ই সমান নির্বোধ। কুরুক্ষেত্র কাণ্ডের পর জয়ী যুধিষ্ঠির বুঝেছিলেন জীবনযুদ্ধে জয় এবং পরাজয় সমান হাস্যকর। কিন্তু তবু যুধিষ্ঠির জড়িয়ে পড়েছিলেন কুরু-পাণ্ডব নির্বুদ্ধিতার সঙ্গে। কারণ, ভাগ্য এই রকমই নির্দেশ করেছে। রাম-রাবণ যুদ্ধও শেষ পর্যন্ত কুম্ভকর্ণকে ঘুমোতে দেয় নি। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, রক্তমাংসের তুর্বলতা মানুষের বুদ্ধিকে শেষ পর্যন্ত ঠিক থাকতে দেয় না। অকাল নিদ্রা ভঙ্গের পর কুম্ভকর্ণ বলেছিল রাবণকে, "কার স্ত্রীলোক ধরে এনেছ ফিরিয়ে দাও।" কুম্ভকর্ণ জানতেন বাসনা অর্থহীন। বাসনাকে তিনি জয় করেছিলেন। কিন্তু একটি তুর্বলতা তিনি পারেন নি, সেই তুর্বলতার নাম স্নেহ। তাই রাবণের তুঃখে মহাস্থবির কুম্ভকর্ণ যুদ্ধকে নির্বুদ্ধিতা বলে জেনেও নিরুদ্বেগে ঘুমোতে পারলেন না।

কুম্ভকর্ণই এই পৃথিবীর প্রথম ও শেষ সেনসিব্‌ল্‌ পুরুষ।

তেরো

যেহেতু পুরুষের সমাজ আজকে অর্থনৈতিক কারণে বিশৃঙ্খল, সেহেতু পুরুষ আজ পতিতা-গৃহে যায়। নারী যেদিন অর্থনৈতিক কারণে পুরুষের সমান বিশৃঙ্খল হবে, সেদিন নারীর জন্যেও নির্মিত হবে পতিত-গৃহ। পৃথিবীর কোনও কোনও প্রান্তে এরকম এক বা একাধিক গৃহ প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে আছে। নারী এবং পুরুষ দুয়ের মধ্যেই বহু ভোগবাসনার বীজ সোচ্চার। পার্থক্যের জন্ম সুবিধে-অসুবিধের কারণে।

যারা অবিবাহিত থাকে তারা বিবাহিতের চেয়ে সুখী, এ ধারণাও উদ্দাম ভ্রান্ত। বিবাহ মানুষকে সুখ দেয়নি ; অ-বিবাহ মানুষকে দিয়েছে অস্বস্তি। কেন ? কারণ, বহুভোগের বাসনার মতোই, নরনারীর মধ্যে একটি ঘর বাঁধার ইচ্ছাও সমান উপ্ত। নরের চেয়ে নারীর মধ্যে এ ইচ্ছে প্রবল, তার কারণ নৈতিক নয় ; অর্থনৈতিক। বহুভোগের পর বিতৃষ্ণা থেকে ঘর বাঁধার তৃষ্ণা প্রবলতর হয়। বুড়ো বয়সে বিয়ের ভূমিকা হচ্ছে এই।

সুখী কেউ নয়। অঋণী গৃহবাসী, শাকান্নে তৃপ্ত যে, সেও সুখী নয়। সুখ কথাটা রূপকথার। জীবনের অরূপকথার জন্ম 'অ'সুখ থেকে চরম অ-সুখী লোকই জগতে বারবার 'সুখ'-সন্ধান দিয়েছে। অতৃপ্তি, অসুখ, অস্বস্তি থেকে জাত জ্ঞান, ধর্ম, বিজ্ঞান, জ্ঞান মানুষকে সাহস দিয়েছে, ধর্ম দিয়েছে সান্ত্বনা, বিজ্ঞান—কামফার্ট। শান্তি দেয়নি কেউ। শান্তি দিতে পারে কেবল শুদ্ধ মনীষা যার বাণী হচ্ছে, দুঃখে নিরুদ্বিগ্ন হও, সুখে বিগতস্পৃহ, বীতরাগভয়ক্রোধ। সে মনীষা আজও অ-দৃষ্ট।

আমরা যাদের চরিত্রহীন বলি কিম্বা চরিত্রবান, তাদের প্রায়ই যাবার বা থাকবার মতো চরিত্র কোনকালেই নেই। কমানসেন্স যেমন সবচেয়ে আনকমান চিজ এই দুনিয়ায় তেমনই চরিত্রবান পুরুষ কোটিকে গোটিক। চরিত্র বলতে আমরা চট্ করে যা বুঝি তা হচ্ছে নারী যার কাছে নরকের দ্বার সে চরিত্রবান; আর নারী যার জীবনের ধ্যান জ্ঞান সে চরিত্রহীন। বলা বাহুল্য যে চরিত্রের এমন ভুল ব্যাখ্যা তাদের পক্ষে করা সম্ভব যারা চরিত্রবান কিম্বা হীন নয়, যারা নিশ্চরিত্র পুরুষ। দলে তারাই ভারী যারা ম্যাসকুলিন বা ফেমিনিন নয়, আসলে নিউটার জেণ্ডার। পৃথিবীতে স্ত্রী এবং পুরুষ কম; কাপুরুষের সংখ্যাই সর্বাধিক।

রামায়ণে রাম এবং রাবণ দুজনেই চরিত্রবান; বিভীষণ চরিত্রহীন। পরস্ত্রী হরণকারী রাবণকে যখন বলা হয় যে রাবণ রামের ছদ্মবেশে সীতাকে ভোগ করলেই তো পারতেন, তখন যে কোন ছদ্মবেশধারণে সমর্থ রাবণ বললেনঃ রামের ছদ্মবেশ নিলে পরস্ত্রী ভোগের বাসনা কি করে থাকতো আর? রাবণের কেবল চরিত্র ছিলনা কমনসেন্সও ছিল। বিভীষণ স্ত্রীলোক হরণ করেননি, জগতের শ্রেষ্ঠ পুরুষের ভক্ত ছিলেন; তবু মেঘনাথ-বধে লক্ষ্মণকে মন্দির-প্রবেশের পথ দেখিয়ে আনার বিশ্বাসঘাতকতায় আজও জগতের অদ্বিতীয় অমর কাপুরুষ। বিভীষণ চরিত্রহীন হলে রাবণের হাত থেকে সীতাকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন নিশ্চরিত্র পুরুষ তাই ঘরের শত্রু বিভীষণ এই অপবাদের তিনি উৎস।

চরিত্র মানে হচ্ছে আপসহীনতা। সক্রেটিস বিষ পাত্র হাতে করেও প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন কিন্তু চরিত্র বিসর্জন দেননি। সাহিত্য, বিজ্ঞানে, জ্ঞানে, জীবনের সকল কুরুক্ষেত্রে চরিত্রবান কর্মী কম্প্রমাইস করতে জানেনা। লেডি চ্যাটার্লিস লাভারের লেখক লরেন্স একবার

তাঁর ঐ গ্রন্থ সংশোধন করতে চেয়েছিলেন সমাজের মুখ চেয়ে। পারেননি। কাটতে গিয়ে দেখলেন কাটা যায় না। কারণ, 'It bleeds'.। এই হচ্ছে জাত্ সাহিত্যিকের চরিত্র। বিশ্ববিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডার গ্রীক দার্শনিককে বললেন: আমি জগতের সম্রাট, আপনার জন্য কি করতে পারি বলুন? দার্শনিক বললেন: একটু সরে দাঁড়ান, সূর্যের আলোক আসতে দিন। সূর্যালোকের চেয়েও দীপ্ত এই দার্শনিক-চরিত্র। পৃথিবীর অদ্বিতীয় ঔপন্যাসিক বালজাক প্রকাশকের কাছে টাকা নিয়ে সময়ে লেখা দেননি, ধার করে শোধ দেননি ধার, একাধিক স্ত্রীলোকের সঙ্গে অভিনয় করেছেন প্রেমের, কিন্তু লেখার ক্ষেত্রে হয়েছেন রক্তাক্ত। পাণ্ডুলিপি থেকে তৈরী প্রুপ কেটে তচ্নচ্ করেছেন। যতক্ষণ না লেখা হয়েছে বিবেক সম্মত ততক্ষণ অর্থের, নামের, সময়ের কিছুর ক্ষতিকেই করেননি স্বীকার। কেন? কারণ বালজাকের লেখক-চরিত্র ছিল।

মহাভারতে আছে যে দুর্বাসা সশিষ্য একবার দ্রৌপদির আতিথ্য গ্রহণ করতে গিয়ে দেখেন যমুনা পার হবার উপায় নেই। দ্রৌপদি গোপী রমণী পরিবেষ্টিত কৃষ্ণকে স্মরণ করলেন। একজন গোপীনীকে কৃষ্ণ আদেশ করলেন: যাও, যমুনাকে গিয়ে বল, ব্রহ্মচারী কৃষ্ণ বলেছেন, তোমাকে দ্বিধা হতে। যমুনা দু ফাঁক হয়ে গিয়ে দুর্বাসাকে আসার পথ করে দিল। দ্রৌপদি-ভবনে চর্ব-চুষ্য-লেহ্য-পেয়র পর দুর্বাসা আর দাঁড়াতে পারেন না। মাটিতে বসে পড়ে বলেন: যাও যমুনাকে গিয়ে বল, অনাহারী দুর্বাসা বলছেন দ্বিধা হতে। দু ফাঁক যমুনার মাঝখান দিয়ে দুর্বাসা ফিরে গেল, গোপীবল্লভ কৃষ্ণকে গোপীনীরা জিজ্ঞেস করলেন: তুমি সারাক্ষণ রমণীর পরিবেশে রয়েছ, অথচ তুমি হলে, ব্রহ্মচারী; আর গুরুভোজনে দাঁড়াতে না পারা

দুর্বাসা হলেন অনাহারী,—এ কেমন কথা? কৃষ্ণ উত্তর দিলেন: আমার এবং দুর্বাসার একটা জায়গা আছে যেখানে আমরা অনাসক্ত এবং অনাহারী। সেই জায়গা থেকে কথা বলেছি। রমণী এবং আহার আমাকে এবং দুর্বাসাকে স্পর্শ করেনি। এবং তাই যমুনা তা মানতে বাধ্য হয়েছে।'

এ হ'ল চরিত্রেরও ওপরের কথা। চরিত্র হল আসক্তি; চরিত্রের ওপরে হল নিরাসক্তি। মহাভারতে 'চরিত্র' হলেন কর্ণ। আর নিরাসক্ত পুরুষ হলেন একলব্য। যুদ্ধে হেরে যাবেন জেনেও কর্ণ দুর্যোধনকে ছেড়ে যেতে পারেননি। একলব্য হাসতে হাসতে তরবারে কর্তিত করেছিলেন শক্তির উৎস বৃদ্ধাংগুষ্ঠকে। শক্তির চেয়ে নিরাশক্তি বড়। কর্ণের চেয়ে বড় চরিত্র মহাভারতে নেই। কারণ চরিত্রের চেয়েও বড় হচ্ছেন একলব্য।

কালাপাহাড় হচ্ছে ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ চরিত্র। হিন্দু দেবদেবী যবন-আক্রান্ত হলে নিজেদের রক্ষা করতে পারেন কি না পরখ করে দেখার দুঃসাহসে দীপ্ত কালাপাহাড়। আসলে কংস যেমন কৃষ্ণাচ্ছন্ন পুরুষ, কালাপাহাড়ও তেমনি দেবীর শ্রেষ্ঠ হিন্দু ভক্ত। মোগল এবং পাঠান অধিকৃত গৌড়বঙ্গে হিন্দুকে জাগ্রত করবার, ঐক্যবদ্ধ করবার দুঃসাধ্য সাধনায় স্বধর্ম ত্যাগ করে সে নিন্দাকে করেছিল জীবনের জয়মাল্য। হিন্দু দেব দেবীর মূর্তি চূর্ণ বিচূর্ণ করবার মধ্যে যবন-কন্যার পানি পীড়নের তৃষ্ণা ছিলনা; ছিল, জরাগ্রস্ত অবসাদগ্রস্ত হিন্দুর চক্ষু জ্ঞানাঞ্জন শলাকায় উন্মীলিত করার প্রয়াস। নিৎসে একদিন জার্মান জাতকে বাঁচাবার জন্যে উরোপের সমস্ত শক্তিকে জার্মানীর বিরুদ্ধে আক্রমণে আহ্বান করেছিলেন আক্রান্ত জার্মান ঐক্যবদ্ধ হবে; ক্লৈব্য পরিত্যাগ করে, 'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত—র মন্ত্রে হবে উদ্বোধিত,—এই ছিল সুপারম্যান

নিৎসের স্বপ্ন। হিন্দু কালাপাহাড়ের স্বধর্ম ত্যাগের মধ্যেও লুকিয়ে আছে সেই আত্মত্যাগ যার তুলনা নেই। কালাপাহাড় এই পৃথিবীর প্রথম সুপারম্যান।

চোদ্দ

জন্ম-মৃত্যু ছাড়া আরও এক মাথাব্যথা আছে মানুষের, তার নাম বিবাহ। কেউ এম-এল-শ'র মুখে বলেছে, বিয়ে হচ্ছে দিল্লিকা লাড্ডু, যা খেলে পস্তাবে, না খেলে আরও। কেউ বার্নাড শ'র মুখে শুনেছে, বিবাহ হচ্ছে লিগ্যালাইস্‌ড প্রসটিট্যুশান। দুটোই সমান অর্থহীন। বিয়ে আসলে একটা কনভেনশানাল সোশ্যাল কণ্ট্রাকট। একদা জোর যার মল্লুক তার—এর দিনে যাদের বাহুতে শক্তি কম তারা বললে, ঘর বাঁধবার জন্যে ঘরণীর প্রয়োজন; আর প্রয়োজন কারুর ঘরনী নিয়ে আর কারুর ঘর না করতে পারার আইন। না হলে পরস্পরের মাথা ফাটাফাটি গলা কাটাকাটি করতে করতেই দিন যাবে মানুষের; সভ্য তার অগ্রগতি হবে না অব্যাহত।

বিবাহর জন্ম হলো সেই। পরস্ত্রীকাতরতা হলো পাপ। ধর্ম, সাক্ষী, মন্ত্র, আইনের নাগপাশে অরণ্যের বুনো গন্ধ গা থেকে মুছে ফেলে বর্বর এসে ধরা দিলো সোনার খাঁচায়; বসলো—বর হয়ে। কিন্তু তার মনে রয়ে গেল, বহুভোক্তার বীজ। একটি নারীকে নিয়ে একটি পুরুষের, একটি পুরুষকে নিয়ে একটি নারীর জীবন কাটানোর বাধ্যবাধকতার খাঁচা প্রায়ই ভাংতে লাগলো। আইন সংশোধন হলো ক্রমাগত। চারটি পর্যন্ত বিয়ে করা চলবে, বললো কোনও ধর্ম; কোনও ধর্ম বাধা দিলো না বহু বিবাহে। আবার কারুর বিধান,

এক বউকে বা স্বামীকে আইনসঙ্গত উপায়ে সরিয়ে আরেক বউ বা স্বামীকে নিয়ে বাসে আপত্তি নেই। এরকমভাবে যতবার খুসী বদলাও বউ কিংবা বর। কিন্তু খবরদার, আবার বাড়ী-ভাড়া না চুকিয়ে, অন্য বাড়ীতে উঠতে যেও না।

কার সঙ্গে কার বিয়ে হতে পারবে এবং কার সঙ্গে পারবে না, তা নিয়েও নানা দেশের নানান মত ? রক্তের সম্পর্ক, অর্থাৎ এক গোত্রে বিবাহ চলবে না। এই নিয়মের পাশাপাশিই ফার্স্ট কাজিন অর্থাৎ নিজের মামাতো-পিসতুতো ভাই-বোনেও বিবাহ সিদ্ধ, রায়ও বাহাল রয়েছে। সহমরণ এবং বিধবা বিবাহ, একটা ওঠাবার এবং আরেকটা চালু করবার জন্যে একই দেশে কম হাঙ্গামা হয়নি। আবার বিবাহের চেয়ে বড়, অর্থাৎ পুরুষ ডেকে মন্ত্র পড়ে সাক্ষী মেনে বিয়ে করব না কিন্তু বিবাহিতর চেয়েও ঘনিষ্টতর সম্পর্কে সম্পর্কিত হবার দুর্ঘটনা, তাও দুর্লভ নয় আর।

আসলে বিবাহ মানুষকে স্বস্তি দিয়েছে, কিন্তু সুখ দেয় নি।

পতিতাগৃহে যারা যান তাদের হিসেব নিয়ে দেখা গেছে তারা বেশির ভাগ বিবাহিত ; ছেলে-মেয়ের বাপ। কেন যায় তারা নিজের পতিতা থাকতেও বারবণিতার ঘরে ? তার কারণ, বিবাহ মানুষকে শৃঙ্খলিত করেছে ; শৃঙ্খলা দেয়নি। নিষিদ্ধার প্রতি আকর্ষণ সিদ্ধপুরুষেরও পতন ঘটিয়েছে। স্বামী-স্ত্রীতে মনের অমিলই বিবাহ-বিচ্ছেদের কারণ নয় ; দেহের অমিলও দারুণ বিপর্যয়ের জনক।

পনেরো

আসলে যাঁরা এই প্লেটনিকপ্রেম, অহিংসা, ভূত, ভগবান ইত্যাদি বলেছেন তাঁরা সবাই ভূতগ্রস্ত নন। তবুও তাঁরা যে বারংবার পুনরাবৃত্তি করেছেন এই অলৌকিক অলীকের, তা সত্যের মুখ চেয়ে নয়; সমাজের মুখ চেয়ে। পৃথিবীতে এমনিতেই এত হিংসা যে অহিংসার বাণী প্রচার না করে উপায় নেই। পুরুষ এবং নারী উভয়েই এমনিতেই এত মাংসলোলুপ যে, নরনারীকে কিঞ্চিৎ বাঁধবার জন্যে কামহীন প্রেমের বাংকাম গাইতে হয়েছে। বিশুদ্ধ মণীষা তাই প্রেমে পড়ে না; নিজের ছাড়া। সে জানে, মরলোকে একমাত্র সত্য হচ্ছে: 'I exist'।

কা তব কান্তা কস্তে পুত্র,—হৃদয় দিয়ে এ সত্য অনুভব করা যায় না। পিওর ইনটেলেক্ট-ই বিশুদ্ধ মণীষাই এ সত্যের সম্মুখীন হওয়ার সাহস রাখে। সে জানে যে কান্তা এবং পুত্র প্রেম আসলে আত্মপ্রেমের নামান্তর মাত্র। আমার স্ত্রী, আমার ছেলে, আমি ভালবাসি,—এই আমি-ই একমাত্র সত্য। এই সত্য যখন কেউ জানে তখন সে জানে যে মুক্তি একটা প্রিটেনশান এবং বন্ধন একটি টেনশান। এবং এই দুই-ই মায়া। জগৎ মায়া ব্রহ্ম সত্য যাঁরা বলেছেন তাঁরা আংশিক সত্য বলেছেন। পূর্ণ সত্য হচ্ছে শুধু এই যে জগৎ এবং ব্রহ্ম দুই-ই মায়া। শুদ্ধ মণীষায় এই আংশিক সত্যকে পাওয়া গেছে। শুদ্ধতার মণীষায় জানা যাবে যে আমার বন্ধনও নেই তাই আমার মুক্তিও চাই না। জন্ম মুহূর্তে আমি সব; মৃত্যু মুহূর্তে আমি শব। এর মাঝখানে যে সময় তাতে আমি যাই করি

তাই-ই ঠিক। কারণ রাজা অথবা ফকির ; সাধু কিম্বা পাপী, জ্ঞানী কিম্বা মূর্খ, জন্মের আগে কিম্বা মৃত্যুর পর, কারু কাছে এর কাণা-কড়ি দামও নেই। বিশুদ্ধ মণীষী-ই শুদ্ধ মুক্ত-পুরুষ।

ষোল

সবাইকে নিয়ে কি বল বানিয়ে
খেলছে কে পিং পিং ?
জীবন-নাট্যে কোন নেপথ্যে
ঘণ্টা বাজছে ঢং !

*　　　*　　　*

ঘণ্টা বাজছে এক, দুই, তিন,
স্টেশনে ছাড়ছে মেল ;
মেল নয় বুঝি, লম্বা কফিন ;
ক্যালকাটা-ব্যাণ্ডেল।
যাত্রী ক-জন ? রাত্রি ক-টা যে ?
বলবে কে বলো ? ধোঁয়ার ঘটা যে
একটি রাতের সঙ্গী সবাই
এক-কামরার যাত্রী,
তবুও ভাগ্যে ভোর হবে কার,
কার শুধু অমারাত্রি !
প্রথম ফুটবে কার মুখে বুলি,
কার বা swan song।
জীবন-নাট্যে কোন নেপথ্যে
ঘণ্টা বাজছে ঢং !

*　　　　*　　　　*

সাধারণ লোককে অসাধারণ লোকরা প্রকাণ্ড ধাপ্পার মধ্যে শাটল ককের মত ব্যবহার করেছেন। একটির নাম প্রিটেনশান আর একটির নাম,—টেনশান। অহিংসা, নিষ্কাম কর্ম, প্লেটনিক লাভ, জীবাত্মা পরমাত্মা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্ম-অধর্ম, পাপ-পুণ্য, স্বর্গ নরক, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের হচ্ছে প্রিটেনশান। আর টেনশান হচ্ছে, সারভাইভ্যাল অফ দ্য ফিটেস্ট, আর্য-অনার্য, সাম্য-অসাম্য, রোমান্টিসিসম-রিয়ালিসম, জীবন, মৃত্যু, ওয়ার এ্যাণ্ড পিস, অবচেতন-অতিমানস ইত্যাদি। রিয়ালাইসেসন যদি হৃদয় দিয়ে হয় তাহলে তা হয় প্রিটেনশান, নয় টেনশান হতে বাধ্য। শুদ্ধ মনীষা দিয়ে আমরা যা বুঝি তাই একমাত্র রিয়েল। সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তে আমরা যে আনন্দ এবং বেদনা অনুভব করি তা অলৌকিক তাই অলীক। বিশুদ্ধ মনীষা জানে সূর্য ওঠেও না সূর্য অস্তও যায় না। কিন্তু এই সত্যকে সে অনুভব করেনা, অনুভব করাতেও পারেনা। কারণ খালি চোখে অসত্য দেখা যায় না, দেখানোও যায় না। এমনকি যন্ত্রের সাহায্যেও এ সত্যকে এক সঙ্গে বিশ্বমানবের গ্রাহ্যে আনা অসম্ভব।

অনুভূতি হচ্ছে তাই যা বুদ্ধিকে গোলায়, মানুষকে ভোলায়। যেমন জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য, এটি অনুভূতির কথা নয় ; শুদ্ধ মনীষার কথা। অদ্বিতীয় মনীষী শঙ্করাচার্য তাই এ জ্ঞান অন্যকে দিতে পারেননি ; এমন কি নিজেও পদে পদে বিপদে পড়েছেন। শঙ্করাচার্যের চেয়ে বিশুদ্ধতর মনীষা যদি কখনও সম্ভব হয় তাহলে সে বলবে জগৎও মিথ্যা ব্রহ্মও মিথ্যা। কারণ সেই বিশুদ্ধতর মণীষার কাছে জগৎ এবং ব্রহ্ম দুই-ই অনুভূতির বিষয় বলে গণ্য হবে। এবং অনুভূতি মাত্রই আলৌলিক, তাই অলীক।

এই অনুভূতি তেমন তীব্র হলে রজ্জুতে সর্প এবং সর্পে রজ্জু ভ্রম হয়। এই অনুভূতিতাড়িত হয়ে মানুষ ভূত ও ভগবান দর্শন করে। এবং অন্যলোকের কাছে তা যদি যতই অ-দৃষ্ট হোক তার কাছে ভূত ও ভগবান অটুট সত্য। এরকম কোনো লোক যদি বলে যে তার সঙ্গে ভূত অথবা ভগরানের কথাবার্তা হয় তখন লৌকিক অর্থেও সে মিথ্যাবাদী নয়। কারণ সে জেনে শুনে মিথ্যা কথা বলে না।

যত পরলোকগত আজ পর্যন্ত দেখা দিয়েছে তারা নির্জনে, পোড়ো বাড়িতে, গ্রামের শ্মশানে দেখা দেয়। ট্রাম রাস্তার ওপরে, দিবালোকে, শহরের বিদ্যুতালোকিত শ্মশানে তারা দেখা দেয় না। এই দেখা না-দেখার যে ব্যাখ্যাই দেওয়া হোক না কেন অতি সাধারণ বুদ্ধির কাছেও তার আবেদন স্বতঃই ব্যর্থ। শুধু ভূত আর ভগবান কেন, এর চেয়েও অলীক এবং অলৌকিক আর অনির্বাচ্য যার নাম ভালোবাসা তার বেলাতেও তাই শুনি 'হৃদয় দিয়ে অনুভব'। প্লেটনিক প্রেম অর্থাৎ যে প্রেমে কামগন্ধ নেই সেই নিকষিত হেম হচ্ছে সোনার পাথর বাটি। একটি পুরুষ যখন আর একটি মেয়ের মধ্যে, একটি মেয়ে যখন একটি পুরুষের মধ্যে নিজেকে আবিষ্কার করে তখন দেহই তার মাধ্যম। প্রতি অঙ্গের জন্যে প্রতি অঙ্গের কান্নাই হচ্ছে প্রেম। নাহলে, আত্মার জন্যে আত্মার কান্না প্রেম হলে, মেয়ে পুরুষের প্রয়োজন হত না। আত্মা নির্লিঙ্গ!

সতেরো

জীবনে তুঃখ, মৃত্যু, লাঞ্ছনা এইগুলিই সত্য ; কিন্তু কাব্য করে বলা হ'ল যে সবার উপরে সত্য হচ্ছে মনুষ্যত্ব। এই মনুষ্যত্ব কি ? না আপনার যদি অতিরিক্ত থাকে তাহলে তার থেকে তু এক টুকরো রুটি যদি ছুড়ে দেন তাদের প্রতি যারা অতিরিক্ত অব্যস্থার মধ্যে দিন কাটায় তাহলেই আপনি প্রতঃস্মরণীয় পুরুষ। মহাভারতে মনুষ্যত্বের প্রতীক হচ্ছে পঞ্চপাণ্ডব, এবং কুন্তি-দ্রৌপদী। কর্ণকে দ্রৌপদী-বঞ্চিত করবার জন্যে এবং যুদ্ধে হারাবার জন্যে পুরুষোত্তম কৃষ্ণের পরামর্শে যে:কাণ্ড ঘটানো হ'ল তাতে প্রমাণ হয় যে শুধু প্রেমযুদ্ধে নয়, জীবনযুদ্ধেই 'দেয়ার ইস নাথিং আনফেয়ার' ; মনুষ্যত্ব নয়, জীবনের একমাত্র সত্য হচ্ছে জয়ী হওয়া।

সন্তানের মৃত্যুতে যে চোখের জল ফেলেনা সে মহাপুরুষ নয় ; সে কাপুরুষ। যিনি সন্তানকে দিয়েছিলেন তিনিই ফিরিয়ে নিয়েছেন, এই সান্ত্বনাবাক্য কেবল নিরর্থক নির্বোধ নয়, অত্যন্ত হৃদয়হীন। যেহেতু রূপ রূপো যৌবন এমন কি এই জগৎ অনিত্য, সেহেতু কা তব কান্তা কস্তে পুত্র বলে মোহমুদ্গর আওড়াবে, সন্তান মৃত্যুতে, পরমাত্মীয় বিচ্ছেদে, জগৎ মিথ্যা ব্রহ্ম সত্য বলে প্রস্তরবৎ, জড়বৎ, পিশাচবৎ অনুভূতিহীন হব,—এরচেয়ে বড় অসত্য, অমনুষ্যত্ব অকল্পনীয় !

প্রিয়জনকে ভালবেসেই আমরা সত্যি সত্যি বাঁচি। জীবন অনিত্য জেনেও আমরা যে মরতে চাইনা, এর নাম মোহ নয় ; এই হচ্ছে লাইফ ফোর্স, ইলান ভাইটা। যতক্ষণ আছি ততক্ষণও না

থাকার নামই হচ্ছে, দুঃখেষু নিরুদ্বিগ্নমনা সুখেষু চ বিগতস্পৃহ; বীতরাগভয়ক্রোধ। এ অবস্থায় যে পৌঁছেছে সে পুরুষ নয়; সে কাপুরুষ। জীবনকে যে ভালবেসেছে, সে দুঃখ পাবে এবং দুঃখ দেবে। সে জানবে যে জীবন সত্য নয়; মৃত্যুই একমাত্র সত্য। তবুও জীবনের প্রেমে সে মৃত্যুর মহিমাকে অস্বীকার করবে। এরই নাম বাঁচা, এরই জন্যে মানবজীবন, এরই নাম মনুষ্যত্ব।

মরি বলেই আমরা বাঁচি। অমরত্ব আশীর্বাদ নয় অভিশাপ। দীর্ঘ জীবনের আরেক নাম প্রলম্বিত জরা। মৃত্যুদীপ্ত জীবনই জীবন। জীবনের আরেক নামই যৌবন। জীবন হচ্ছে রঙ্গ; মৃত্যু হচ্ছে যবনিকা। যবনিকা পড়ে বলেই নাটক দেখা যায়। জীবন নাট্যে যে কোন মুহূর্তেই যবনিকা পড়তে পারে বলে যতক্ষণ আছ ততক্ষণ বাঁচ।

জীবন-নাট্যে কোন্ নেপথ্যে
 ঘণ্টা বাজছে ঢং!
একটি রাতের রঙ্গমঞ্চে
 কেউ রাজা কেউ সং।
ঘণ্টা বাজছে ঢং-ঢং-ঢং;
সেয়ানা কিম্বা নেশায় যে টং
 শেষের এ-রাতে সবার বরাতে
 বাজে বারোটার ডং!
পাপ ও পুণ্য দুয়েই শূন্য,
 সবার জবাব wrong।
শুধু নিশীথের নষ্টচন্দ্র
 তখনো মাখছে রং;

জীবন-নাট্যে কোন নেপথ্যে
ঘণ্টা বাজছে ঢং !

* * *

দুঃখ সুখের দোলনরঙ্গে
জীবন-ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে
এখানে-সেখানে কোথায় কে জানে
পড়ছে কেবলি গং ;
এ-খেলা খতম, পয়সা হজম,
মিথ্যে এ রং-চং !

আঠারো

বাজেকথার রাজা-রাণী হচ্ছে ট্রুথ এ্যাণ্ড বিউটি। প্রতীচ্যের এই যমজ প্রাচ্যে ভিন হয়ে দেখা দিয়েছে। সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্। যে কোন বাজে কথাকে গালভরা শোনাতে হলে প্রতীচ্যে ইংরেজীর বদলে গ্রীক্ এবং প্রাচ্যে বাংলার বদলে সংস্কৃত লাগাতে হয়। যেমন, "Know thy self" বললে বড্ড ন্যাড়া ন্যাড়া লাগে; কিন্তু Gnothi scanton বললে সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় এর চেয়ে গভীরতর সত্য কদাচ কেউ বলে থাকেন। কিম্বা সত্য শিব সুন্দর বললে যেন বলাই হয়না; কিন্তু সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ বললে লঘুপক্ষ প্রজাপতি যেন গুরুভার গন্ধমাদন হয় মুহূর্তে। ঠিক এইরকমই, গদ্য হচ্ছে দিবালোক, পদ্য হচ্ছে কনে দেখা আলো। অর্থাৎ গদ্য করে বললে যা বাজে কথা বলে প্রতিভাত হয়, পদ্যে সেই একই কথা বললে বুকে বাজে। গোধূলির নরম আলোকে অতি সাধারণ রমণীকে রমণীয় মনে হয়; দিবালোকে এই আলো-কেই জানি আলেয়া বলে।

'ট্রুথ বিউটি, বিউটি ট্রুথ',—এর বিন্দুতে আপনি যদি সিন্ধু দর্শন না করেন সঙ্গে সঙ্গে বররুচি বলবেন যে, আপনি অরসিক এবং অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্ শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ। অর্থাৎ আপনার রুচির সঙ্গে আমার রুচি না মিললে, আপনার রুচিই বড়; আপনিই বররুচি। আজকেও কমিউনিসমে রসস্থ হতে না পারলে রাজনৈতিক বররুচিরা সঙ্গে সঙ্গে রোষস্থ হবেন। বলবেন যে আপনি প্রগতিশীল নন্ প্রতিক্রিয়াশীল। নিরবধিকাল ধরে বিপুলা এই পৃথ্বি জুড়ে সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। পুরনো

কনভেনশনে আস্থা রাখতে না পেরে আজও যদি কেউ নতুন কন্‌ভিক্‌শনের কথা ব্যক্ত করে তাহলে তার নতুন করে কন্‌ভিক্‌শন হয়ে যাবে।

যা চলে আসছে তাকে মনে নিতে না পারলেও শুধু মেনে নিতে পারলেই আপনি রসিক। 'ট্রুথ্‌ বিউটি, বিউটি ট্রুথ্‌' শোনামাত্র, একে খাঁটি সোনা বলে চিনতে না পারলেই রসিকসভা থেকে আপনার নাম কাটা গেল। আপনি একঘরে হলেন। গ্যালিলিও যখন বলেছিলেন যে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে তখন তাঁকেও একঘরে করারই রায় দিয়েছিলেন সমাজপতিরা। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেহেতু অংকের তত্ত্বকে যন্ত্রের সাহায্যে নির্ভুল সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করা যায় সেইহেতু 'একঘরে' গ্যালিলিও আজ ঘরে ঘরে মূর্তিত।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রমাণ করে দেখাবার উপায় নেই যে নিরস তরুবর পুরত ভাতি-র চেয়ে শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে,—কিছু কম কাব্য কিম্বা অকাব্য নয়। রসাত্মক বাক্য মাত্রই কাব্য, অনাদিকাল ধরে কাব্যে এই আদি ব্যাখ্যা আমাদের শুনে শুনে এমন অভ্যেস হয়ে গেছে যে, একে চ্যালেঞ্জ করতে ভরসা হয় না। ব্রহ্মের মতই রসনামক বস্তুটিও সংস্কার অতীত। কিসে যে রস হয় আর কিসে যে রস হয় না, রসবিচারের মাপকাঠি কি, কে বলবে কবে বলবে আর।

মহাকাব্যে শেষ পর্যন্ত ধর্মের জয় এবং অধর্মের পরাজয় হতেই হবে। মহৎ উপন্যাসেও শেষ পর্যন্ত অশেষ আশার বাণী শোনাতে হবে। 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানোর পাপ' কিম্বা "Man can be defeated but not destroyed."—এ জাতীয় অর্থহীন আশা কি মানব জীবনের প্রতি অর্থপূর্ণ তামাশা নয়?

উনিশ

প্রাগৈতিহাসিক মানুষ যেদিন সমাজ বাঁধল, সেদিন একটি লোক একটি স্ত্রীলোককে নিয়ে সন্তুষ্ট হতে বাধ্য হল। যদি প্রাগৈতিহাসিক মানুষরা সমাজ গঠনের আগেই একটি স্ত্রীলোককে নিয়ে থাকত তাহলে দেখা যেত সমাজে বাসকরবার জন্যে আইন হত, একস্ত্রীলোক বা স্ত্রী চলবে না। অর্থাৎ সমাজ বিবর্তন একটা ফ্যাশান মাত্র। যা হয়েছে তার উল্টোটা করার নামই প্রগতি। আজকে টপলেস, কাল বটমলেস, পরশু পুনরায় বুরখাতে প্রত্যাবর্তন করা যেমন অনিবার্য ফ্যাশান। সতীদাহপ্রথা রোধ করার মধ্যে ফ্যাশানের চেয়ে মহত্তর কোন সত্য নেই। আজকে ম্যারিকার মত কোন শক্তিশালী কিম্বা মার্কস্-ফ্রয়েডের মত কোন ফ্যানাটিক যদি একটা ব্যালিহু সৃষ্টি করতে পারে যে কারুর স্ত্রী মারা গেলেই তার স্বামীর সহমরণে যাওয়া উচিৎ তাহলে কাল্ না হলেও কালে তা চালু হয়ে যাবে কারণ তখন সেইটিই ফ্যাশান। ফ্যাশানের আরেক নামই প্রোগ্রেস।

বিঠোফেনের বাজনা, শেক্সপীয়ারের নাটক, রবিঠাকুরের গান কিম্বা য়িহুদী মেনুইনের বেহালা, পিকাশোর ছবি, পোল রবসনের গলা অথবা কমুনিষ্ট দর্শন, ফ্রয়েডের সাইকো এ্যানালিসিস,—এসবই হুজুগ। এগুলোর কোনটাতেই ফ্যাশানেব অতিরিক্ত কিছু নেই। কম্যুনিসম মানুষকে মুক্তি দেবে, শ্রেণীহীন সমাজ হবে মানুষের স্বর্গলোক, এ যারা বিশ্বাস করতে ভালোবাসে তারা তাদের চেয়েও রি-য়াকসানারী যাদের ভূতে ভয় করা, স্বপ্নাদ্য ঔষধ, অবতারত্বে বিশ্বাস।

ব্যক্তিগত পাগলামী যখন সমষ্টিগত পাগলামীতে পরিণত হয় তখনই জন্ম হয় ইসম বা বাদের। মানুষ বাদে এইসব ইসম বা বাদে আর সবই আছে। এবং সর্বরোগহর মাদুলি, দৈব ওষুধ, মিরাকল-এর মতই এগুলিও আলৌকিকের মতই অলীক। আসলে নিরবধি-কাল বিপুলা পৃথ্বীজুড়ে কোননা কোন পাগলামীতে মানুষকে পেয়েছে। এর কারণ সময় কাটানোর জন্যে খেলনা চাই। এই খেলনার নাম ধর্ম, বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজবাদ, দর্শন, সঙ্গীত, চিত্র, সাহিত্য, শিল্প ইত্যাদি। এদের যে দাম পাওয়া উচিৎ তার চেয়ে বেশী তো এরা পেয়েছেই, কেউ কেউ আবার একে অমূল্য জ্ঞান করেছে। মানুষ কিন্তু খেলা শুরু হবার আগেও যে অন্ধকারে, খেলা শেষ হবার পরেও সেই অন্ধকারেই। এর কারণ মানুষের সর্বনাশের মূলে আছে একটি দুরারোগ্য কুসংস্কার যার নাম,—মন। এ মন এমন এক সংস্কার যাকে সংস্কার বলে চিনতে পারা প্রায় অসম্ভব। ভালোবাসা, সুখ, দুঃখ, পাপ, পুণ্য, স্বর্গ, নরক, আস্তিক্যনাস্তিক্য, এসব বিপজ্জনকেরই জনক হচ্ছে মানুষের মন।

শরীর অতিরিক্ত এই অনির্বাচ্য মন-এর সারমন-ই মানুষের কাল্ হয়েছে। স্মরণাতীতকাল থেকে কতকগুলো কথা শুনে শুনে, কতকগুলো ব্যবহার দেখে দেখে আমরা আজ সত্যি সত্যি মনে করি যে মন বলে সত্যিই কিছু আছে। আর কিছুদিন বাদেই যন্ত্রও ভাবতে শুরু করবে যে তারও মন আছে। আর সেই শুরু হবে যন্ত্রণা। যা যন্ত্র তার যন্ত্রণা প্রমাণ করবে কে? পঞ্চাশ ষাট, বড় জোর একশো বছরের মেয়াদ এই পৃথিবীতে মানুষের। তারমধ্যে জীবিকার্জনের, দেহের যন্ত্রণার বোঝার ওপর আবার মনের যন্ত্রণা হচ্ছে শাকের আঁটি। উটের পিঠ এইতেই ভাঙে। পৃথিবী নামক এইগ্রহ একটা এ্যাক্সিডেন্টের ফল; আরেকদিন আরেকটা এ্যাক্সি-

ডেণ্টে এর ফলাফল শূণ্যে এসে মিলবে, এবার্তা জ্ঞাত হবার পরেও মন নামক অজ্ঞাত কুসংস্কারের প্ররোচনায় আমরা মানব সভ্যতা বিপন্ন বলে হাহুতাশ করছি। আমরা জানি এর আগেও সভ্যতা বিপন্ন হয়েছে, মাটিতে গুঁড়িয়ে গেছে, এরপরে একদিন পৃথিবী নামক এই মাটির ঢেলাও আবার মাটি হয়ে যেতে পারে ; তবুও আমরা বল্‌বই যে আমাদের ওপর নির্ভর করছে এই সভ্যতা, এই মনুষ্যজাতির বাঁচা-মরা। একটা পিঁপড়ে মরে গেলে আমাদের যেটুকু লাগে, এই পৃথিবী সরে গেলে প্রকৃতির যে ততটুকু অভাবও বোধ হবেনা, একথা কে বলবে, কবে বলবে আর।

কুঁড়ি

কোনও মতবাদ, কোনও ইসম্, কোনও দর্শন, আদর্শ বাণী, কোনও উপদেশ, নির্দেশ মানুষকে এখনও পর্যন্ত এমন কিছু দেয়নি যা তাকে চিরকালের সমাধান বাৎলে দিয়েছে, তার যাবতীয় সমস্যাকে সাহায্য করেছে মানুষের মুঠোয় আনতে। যারা ভাবে যে এই পথেই মিলবে পথের শেষ, তারা জানে না যে যত মত্ তত পথ নয়, যত মত্ তত বিভ্রান্তি। কোনও মত কোনও পথই অন্ধকার আলো করে না। মার্কস্-এর পথেও যে মানুষের একটা বন্ধন-মুক্তির বিনিময়ে রেজিমেন্টেসানের নতুন বন্ধন দেখা দেয়, আজ তা অন্ধ-কম্যুনিস্টদেরও আঁখিপদ্মে প্রতিভাত হচ্ছে না কি? আদর্শ মাত্রই য়ুটোপিয়া। এবং য়ুটোপিয়া কোনও দিন বাস্তবে পরিণত হলে দেখা যাবে কোনও আদর্শই ধোপে টেকে না। একবিশ্ব, একজাতি, একধর্ম, এ য়ুটোপিয়াও কালে দেখা যাবে প্রবর্তিত হলে, অকালেই তার মৃত্যু হয়েছে। মানুষের চেয়ে আহাম্মক এখনও পর্যন্ত প্রাণীজগতে অজ্ঞাত।

সার্ত্র-এর একসিসটেনাশিয়ালিসমও আর এক হুজুগ মাত্র যাতে ইতোমধ্যেই ছাতা পড়তে আরম্ভ করেছে।

আজ তক্ যত মহাদানব বা মানব যত মত্ চালু করবার জন্যে বিশ্ববরেণ্য হয়েছেন তারা সবাই মস্ত রাজনৈতিক নেতা। সাধারণ লোকের কোনও নিজস্ব মত্ নেই, এই একমাত্র তথ্যের ওপর নির্ভর করে, তারা বলেছেন : এই হচ্ছে পথ। নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। বুদ্ধদেব, শঙ্কর, চৈতন্য, কিংবা স্পিনোজা, কান্ত্, হেগেল, এরা সবাই

সাধারণকে অভিভূত করেছেন। ফলে, সাধারণ মানুষ এদের কারুর কথাই জীবনের কাজে লাগায়নি। যীশু খ্রীষ্টের পর তাই আর একজন ক্রীশ্চানও জন্মায়নি; কাল মার্কস্ ছাড়া মার্কসিষ্ট সম্পর্কে কার্ল মার্কসই আমাদের সতর্ক করেছেন। বুদ্ধদেব প্রবর্তিত ধর্মে ছেয়ে গেছে জগৎ, জগতে আজও রক্তপাত বন্ধ হয়নি। শংকর হিন্দুধর্মের পতাকা তুলে ধরেছেন কিন্তু সবাই ব্রহ্ম এ বিশ্বাসে জাতের লড়াই বন্ধ হয়েছে কি জগতের কোথাও? তা হয়নি; তা হয়না।

মানুষ এ জগতে আসে সময়কে হত্যা করতে; শেষ পর্যন্ত নিহত হয় অসময়ের হাতে। এর চেয়ে মহত্তর আর কোনও উদ্দেশ্য জীবনের নেই, একথা কে বলবে? কবে বলবে আর?

যতক্ষণ সময়ের হাতে নিহত না হচ্ছে মানুষ. ততক্ষণ তার সহায় হচ্ছে জোর। করজোড়ে নয়, গায়ের জোরেই বাঁচা। মাইট-এর চেয়ে রাইট্, জগৎ-সংসারে কোনওকালে কিছু ছিলো না; আজও নেই; ভবিষ্যতেও থাকবে না। বসুন্ধরা যেদিন বীরভোগ্যা ছিলো সেদিন শেষ কথা বলতো গায়ের জোর, বসুন্ধরা যেদিন থেকে তদ্বির-ভোগ্যা হয়েছে সেদিন থেকে অশেষ জোর,—টাকার। সুদর্শনচক্র আজ রজতচক্র; নারায়ণ আজ নগদনারায়ণ।

ব্যক্তি মানুষের জোর আজ সমষ্টি-মানুষের জোরের কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ ইণ্ডিভিজ্যুয়াল আজ পার্টির পায় দাসখত্ লিখে দিয়েছে। 'আজ' বললাম বটে কিন্তু এ রেওয়াজ চিরকালের। ধর্মীয় নেতারাও চিরকাল নানা নামে দলই করেছেন। বুদ্ধদেব থেকে কার্ল মার্কস পর্যন্ত প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে নিজের মত চালু করতে গিয়ে যে যন্ত্রকে কাজে লাগিয়েছেন তা হচ্ছে ঐ পার্টি-মেসিন। বুদ্ধিষ্ট এবং মার্কসিষ্ট, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের নামসংকীর্তন

আর মহাত্মা গান্ধীর প্রার্থনা সভা পোসে আলাদা পার্পোসে এক। রাজার বিরুদ্ধে জনতাকে জাগানোই সকল ধর্মের এবং ধর্মঘটের লক্ষ্য। এদের মৃত্যুও অনেক ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক হত্যার সমগোত্রীয়। রাজার লোক কিম্বা প্রতিদ্বন্দ্বী দলের চক্রান্তই কখনও ক্রুসে বিদ্ধ করে, কখনও বিষ দিয়ে, কখনও অস্ত্রাঘাতে এদের অকাল তিরোভাব আসন্ন করেছে।

গীতার শ্রীকৃষ্ণ ধুরন্ধরতম রাজনৈতিক নেতার চেয়েও কৌশলী। বর্তমান পৃথিবীর বিচক্ষণতম কৌশঁলীর [কাউন্সেল] চেয়েও অনেক বড় বুদ্ধিজীবী। মহাভারতও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কেবল ধর্ম-পুরাণ-ইতিহাস কিম্বা দর্শন নয়; এতবড় রাজনৈতিক গ্রন্থ আজ পর্যন্ত লেখা হয়নি।

ব্যক্তিমানুষ পার্টির পায় নিজেকে বিকিয়ে দিলেও, পার্টিকে চিরকাল চালিয়েছে একটি কি তুটি 'ব্যক্তিত্ব'। পার্টি মানে অসংখ্য পার্সন; পার্টির লিডার হচ্ছে পার্সোনালিটি। বসুন্ধরা যেদিন বীরভোগ্যা ছিল সেদিন গায়ের জোরই ছিল পার্সোনালিটির প্রতীক। বাহুবলই ব্যক্তিকে ব্যক্তিত্ব দিত; আজ অর্থবল অর্থাৎ পার্স জন্ম দেয় পার্সোনালিটিকে। সেই একই মদ আজ নতুন পাত্রে পরিবেশন করা! সারভাইভ্যাল অফ দ্য ফিটেস্ট,—গায়ের জোরে একদিন তার টেষ্ট হত, আজ তার টেষ্ট হয় টাকার জোরে।

নারায়ণী সেনার চেয়ে নারায়ণ বড়। নারায়ণী সেনা হচ্ছে ম্যাস্, নারায়ণ হচ্ছেন লীডার অফ দ্য মাসি। আজও সেই একই অবস্থার মধ্যে, একই তুরবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে কোটি কোটি সাধারণ ব্যক্তি; তাদের চালাচ্ছে কখনও ধর্মের নামে কখনও ধর্মঘটের বেনামে তুটি একটি 'নগদ'-নারায়ণ।

আমরা সবাই fool। মেয়ের খোঁপায়, ঠাকুরের পায়,

ফুলদানীর গর্তে ফুলকে যে ভাবেই রাখ তাতে ফুলের নিজের কোন স্বার্থ সিদ্ধ হয়? foolকে যে নামেই ডাকো, ডেমোক্র্যাট, সোসালিস্ট্, কম্যুনিস্ট, কিম্বা একসিসটেনসিয়ালিস্ট, fool চিরকাল foolই থাকে।

একুশ

ঈশ্বরের পরেই, কারুর কারুর মতে ঈশ্বরের ওপরেও হচ্ছে ভাগ্য। মানুষ যা কিছু করছে, তার হারজিত ভালোমন্দ, আহার অনাহার, পীড়ন করা কিম্বা পীড়িত হওয়া এর সব কিছুর জন্যেই তার ভাগ্য দায়ী। ঈশ্বরের মতই ভাগ্যও অ-দৃষ্ট এবং সর্বশক্তিমান। ঈশ্বরের ক্ষেত্রে যেমন আস্তিক্য ও নাস্তিক্যর লড়াই, তেমনই ভাগ্য বনাম পুরুষকার, এ-দ্বন্দ্ব আবহমান কাল ধরে অব্যাহত। আমার বক্তব্য হচ্ছে আস্তিক্য-নাস্তিক্যবাদীদের মতই ভাগ্য ও পুরুষকারবাদীরাও সময়ের অনর্থক অপব্যয়কারী।

ভাগ্যই যদি সর্বশক্তিমান হয় তাহলে মানুষ যা করছে সবই ঠিক। অর্থাৎ হত্যাকারী এবং নিহত ব্যক্তি এদের কারুরই পাপ পুণ্যে নরক স্বর্গে নিজেদের কোন অকৃতিত্ব বা কৃতিত্ব নেই। ভাগ্য যারা মানে তারা কেউ চুপ করে বসে থাকে না। জ্যোতিষীর কাছে যেমন কি হবে জানবার জন্যে, ঠিক তেমনই চাকুরী, কণ্ট্রাক্ট-দাতার কাছেও দৌড়দৌড়ি করে। অর্থাৎ কোনওটিতেই পুরো বিশ্বাসও করে না।

ভাগ্য যারা মানে না তারা যখন শোনে জ্যোতিষীর মুখে অমুক তারিখে তার বিদেশ যাত্রা ঘটবে তখন অবিশ্বাসের হাসি হাসে, যখন

সেই ভবিষ্যতবাণী মিলে যায় তখন জ্যোতিষীর পা জড়িয়ে ধরে কাঁদে। এবং জ্যোতিষীর কাছে অন্ধবিশ্বাসে আত্মসমর্পণ করে, ভবিষ্যতে কি কি ঘটবে তা জানতে চায়। সেগুলি যখন মেলে না তখন আবার মত পাল্‌টায় ; তখন বলে, জ্যোতিষ হচ্ছে এমপেরিক্যাল সায়ান্স। অর্থাৎ মিলতেও পারে নাও মিলতে পারে। অর্ধেক নারী ও অর্ধেক নরের মতই জ্যোতিষ হচ্ছে অর্ধেক বিজ্ঞান অর্ধেক কল্পনা।

ভাগ্য বলে যদি কিছু থাকে তাহলেও জ্যোতিষীর কাছে যাওয়ার কোন মানে হয় না, কারণ জ্যোতিষী বলছে বলে কিছু ঘটে না ; যা ঘটবে তারই কিছু কিছু জ্যোতিষে কখনও বলে কখনও বলে না। আসল কথা আমরা যখন ক্ষমতায় আসীন থাকি তখন পুরুষকারে, যখন আসন টলমল করে তখন ভাগ্য বিশ্বাসী। ঈশ্বর-বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর মতই ভাগ্য বিশ্বাসী-অবিশ্বাসীদেরও কোনও 'চরিত্র' নেই। তারা যখন যেমন, তখন তেমন বলে। এইটেই স্বাভাবিক ; কারণ মানুষ মাত্রই ক্রিচার অব সার্কামস্ট্যানসেস্।

নেপলিওঁ যখন দিগ্বিজয়ের ওপর দিগ্বিজয় করছেন তখন তাঁর বাণী হচ্ছে, "Impossible is a word, found in the dictionary of fools." ; যখন সেণ্ট হেলেনায় 'মনে কর শেষের সেদিন কি ভয়ঙ্কর' গাইছেন, তখন তাঁর বক্তব্য হচ্ছে যে, একসময় তাঁকে কোনও অ-দৃষ্ট শক্তি কিছু ক্ষমতা দিয়েছিল যখন তিনি মনে করতেন তিনিই সব, এখন সেই ক্ষমতা তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নেওয়ার পর তিনি দেখছেন তিনি এখন জীবন্মৃত শব মাত্র।

মুসলমানরা হিন্দুদের যে মন্দির ভেঙ্গে দিয়েছে সেই মন্দির নিজের চেষ্টায় ও অন্যের সহযোগিতায় নতুন করে সংস্কার করবার সংকল্পমুহূর্তে স্বামী বিবেকানন্দ দৈববাণী শুনছেন যে 'মা' ইচ্ছে

করেই এই অবস্থায় আছেন, বিবেকানন্দের কিছু করবার নেই। স্বামিজী সংকল্প ত্যাগ করে শিষ্য শিষ্যাদের কাছে বলছেন: 'সর্বপ্রকার কর্মের অভিলাষ একেবারে দূর হয়েছে। বুঝেছি যন্ত্রীই সব, আমি কিছু নই।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যাঁর চেয়ে বড় কর্মযোগী আর জন্মেছে কিনা সন্দেহ তিনি নিরতিশয় নিরুৎসাহ হয়ে নির্জনে বাকি দিন কাটাবার অভিপ্রায় ঘোষণা করেছিলেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও মানুষের এই দুই অবস্থাকে বোঝাতে গিয়ে বলেছিলেন আরম্ভে মানুষ বাছুরের মত হাঁক পাড়ে, হাম্বা হাম্বা; অর্থাৎ আমিই সব। শেষে ধুনুরীর হাতে তুলোধুনো হয়ে কুঁইকুঁই করে: তুহুঁতুহুঁ।

বাইশ

রবিনসন ক্রুসোর মত কোনও লোক, সভ্যতা থেকে নিরাপদ নির্জন নিরুপম্ দূরত্বে যার আপন মনে বাস, সে লোক আজকের সভ্যতার আলোকে অকস্মাৎ এসে পৌঁছলে, আমাদের দেখে হাসবে কি কাঁদবে বলা শক্ত। যাদের লেখা পড়ে, গান শুনে, ছবি দেখে আমরা মূর্চ্ছা যাই সেই আমাদের সংস্কারতুষ্ট কথাবার্তায় সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হবে সুনিশ্চিত। আমাদের সুরে, লেখা পড়বার আগেই, সেক্সপীয়ার কি অপূর্ব, ছবি দেখবার আগেই মিকেল এঞ্জোলা আহা! বাজনা শুনবার আগেই ওয়্যাগণার মরি মরি, বলবে অথবা ফিরে যাবে তার অসভ্যতার অন্ধকারে, একথা ভবিষ্যতবাণী করা সহজ নয়।

জীবনের সবক্ষেত্রে আমরা কতগুলি সংস্কারের ভালগার রিপিটেশান মাত্র। যে মাংসে হিন্দুর জাত যায়, মুসলমান তা সানন্দে খায়, মুসলমানের পক্ষে নিষিদ্ধ মাংসে ক্রিশ্চানের সাংঘাতিক আসক্তি। চীন দেশে যে খাদ্য লোভনীয়, অনেকের পাতেই তা পরিবেষণ বমনোদ্রেক করবে। অথচ এই খাদ্য অখাদ্য বিচার করেই আমাদের জাত ধর্ম যায় কিম্বা থাকে। খাবার টেব্‌লে আমরা কি খাই তা নিয়ে ঈশ্বর যদি কোথাও থাকেন, তবে তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত একথা মনে করবার কারণ নেই। ডিনস্যুইহট্ অনবদ্য উপস্থিত করেছেন সেই প্রশ্ন ;

Does any man of Common sense
Think ham and eggs give God offence ?

Or that a herring has a charm
The Almighty's anger to disarm ?
Wrapped in His majesty divine,
D'you think He cares on what we dine ?

পলকের মধ্যে, অকারণ পুলকের মধ্যে যাঁর কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির ক্ষমতা ও আনন্দ প্রশ্নাতীত বলে ঘোষণা করেছে, ব্রহ্মজ্ঞ কিম্বা ব্রহ্মঅজ্ঞের দল তারাই আবার বিশ্বাস করতে বলছে আমরা কি খাই কি পড়ি তার ওপর সর্বশক্তিমান আমাদের স্রষ্টার রাগ কিম্বা অনুরাগ, অভিশাপ অথবা আশীর্বাদ বর্ষণ নির্ভর করে। এর চেয়ে হাস্যকর কথা সেক্সপীয়ারের কিং লীয়ারের পক্ষেও বলা অসম্ভব ছিল।

যিশু বুদ্ধ মহম্মদ নিরবধিকাল বিপুলা পৃথ্বী জুড়ে যত কথা আজ পর্যন্ত বলেছেন তার একটিতেও লোক কান দিয়েছে? যদি দিত, তাহলে এই পৃথিবীর চেহায়া পাল্‌টে যেত না! বাইবেলের কথা মানলে কম্যুনিজমের প্রয়োজন হত? কোনও লোক যদি মহাজনরা যেপথে মানুষকে চলতে বলেছেন, সেপথে চলতে চায় তাহলে তৎক্ষণাৎ সমস্ত সংসার তাকে দুয়ো দেবে উন্মাদ বলে। তদ্দণ্ডেই পাগলা গারদে নির্বাসন দণ্ড উচ্চারিত হবে সমাজের মুখে।

যিশু বুদ্ধ মহম্মদের মতই রাবণ কংস মহিষাসুরের বংশধর হিটলার মুসোলিনী স্তালিন যুগে যুগে দেখা দিয়েছে এবং দেবে। অধর্মের গ্লানি দূর করে ধর্ম পুনঃসংস্থাপনের জন্যে যিনি যুগে যুগে সম্ভব হন, তিনি সভ্যতাকে নষ্ট করবার জন্যে অসভ্যতার পুনরাবৃত্তিতে নেতৃত্ব নিতে অসম্ভব হবেন কেন। রবীন্দ্রনাথ যখন উচ্চ কণ্ঠ হন এই বলে যে, শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্ন শেষ পরে, ওরা কাজ করে, তখন তা অপূর্ব শোনায় কারণ তা অসত্য।

সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের ওপর নতুন সাম্রাজ্যের পত্তন হয়।

এক রাজা যায় আরেক রাজা আসে। মাঠে যারা কাজ করে তারাই শুধু মৃত্যুহীন নয় যারা তাদের চরায় তারাও অমর। রাজার জীর্ণ বসন ত্যাগ করে ডিক্টেটারের নববস্ত্র পরিধানই ইতিহাস। তারাই চিরকাল যুদ্ধ বাধায়; কখনও ধর্মের নামে কখনও ইজমের বেনামে আর মারা পড়ে সাধারণ মানুষ, উলুখড়ের মত।

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের বদলে নতুন অবতার যাঁরা এসেছেন অর্থাৎ ফ্রয়েড মার্কস্, এঁদের মুখেও সেই একই কথা। ধর্ম পুনঃসংস্থাপনের জন্যেই অধর্মের গ্লানি দূর করতে, এই নতুন মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ কর। সে মন্ত্রে দীক্ষা নেবার পর দেখা যায় সাধারণ মানুষ যে তিমিরে সেই তিমিরেই। দেখা যায় সে মন্ত্র সাধারণ মানুষকে যূপকাষ্ঠে বলি দেবার মন্ত্রণা।

আসলে পুরাণ অর্থাৎ মিথ কখনও পুরাণো হয় না! পুরাণো মিথ্যার বদলে নতুন মিথ্যা মানুষকে কিছুক্ষণ আকৃষ্ট করে এই মাত্র। যন্ত্র যুগের আগেও যা, মন্ত্র যুগের পরেও তাই, মানুষের জন্যে আছে শুধু জীবনভোর যন্ত্রণা।

তেইশ

প্রথম এবং শেষ সত্য হচ্ছে মৃত্যু। শাশ্বত সত্য। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আরও দু'টি প্রায় অপরিহার্য সঙ্গী, কাম ও কাঞ্চন। সংসার ত্যাগ করে গিয়ে এই দুটি প্রয়োজনকে কেউ কেউ অস্বীকার করতে চেয়েছে কিন্তু এ-দুটি সঙ্গীকে সর্বতো বর্জন করা সংসারে থেকে অসম্ভব, সংসারের বাইরে থেকেও সম্ভব কিনা তা নির্ভর করে ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ওপর। তবুও এর কোনওটিকেই আমি সত্য বলে মনে করিনে, কারণ এর কোনওটিই শাশ্বত নয়। আপেক্ষিক সত্য, দেশ-কাল-ব্যক্তি ভেদে যে সত্য তা সত্য নয়। সব দেশে সব কালে মানুষ, মনুষ্যেতর প্রাণী উদ্ভিদ এবং জড়, এদের সকলের ক্ষেত্রেই একমাত্র সত্য হচ্ছে মৃত্যু। মৃত্যুকে কেউ জয় করতে পারেনি। মৃত্যুভয় জয় করা আর মৃত্যুকে জয় করা এক কথা নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ যখন ক্যানসারে মারা যান, আর, শ্রীরামকৃষ্ণ ডালমিয়া যখন জেলে পচেন তখন এই দুটি বিষয়কে আমরা বিচার করি দুটি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। শ্রীরামকৃষ্ণের বেলায় বলি, ভক্তের অসুখ ঠাকুর নিজে নিয়েছিলেন বলে এই দুরারোগ্য ব্যাধিতে ঠাকুরের নশ্বর দেহ নষ্ট হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ ডালমিয়া যখন জেলে পচেন তখন আমরা বলি কৃতকর্মের ফল। অথচ আমরা জানি অতি সাধারণ লোকেরও কর্কট রোগে মৃত্যু হয় এবং অসাধারণ সাধু লোকেরও অকারণে হয় কারাদণ্ড। পৃথিবীর অশিক্ষিততম ব্যক্তির কাছেও এই দু-য়ের কোনও দৃষ্টান্তই বিরল নয়। ধর্মের প্রতি যাতে মানুষের মন বিদ্রোহ না করে তারই জন্যে ব্যাখ্যা স্বরূপ আবিষ্কৃত

হয়েছে একটি বর্ম ঃ পূর্বজন্মের কর্মফল। অর্থাৎ এজন্মে ভাল লোকও যখন দুঃখ পায় এবং মন্দ লোক সুখ তখন মনকে প্রবোধ দাও এই বলে যে, ভাল লোকের পূর্বকর্ম মন্দ এবং মন্দ লোকের জন্মে সুকৃতি ছিল। এ ব্যাখ্যা, মানতেই হয় যে, যুক্তির জোরের ওপর এর প্রতিষ্ঠা নয় ; এ হচ্ছে বিশ্বাসের গায়ের জোরের কথা।

ফরাসী বিদূষক আনাতোল ফ্রাঁস সেরিও-কমিক ভঙ্গীতে জিজ্ঞেস করেছেন যে, জগতে যে এত মন্দ (Evil), ঈশ্বর হয় তা স্বেচ্ছায় করেন, নয় এই মন্দ ইচ্ছে থাকলেও রোধ করতে পারেন না কিম্বা ইচ্ছেও করেন না, পারেনও না ; যদি ঈশ্বর স্বেচ্ছায় এই মন্দের স্রষ্টা হন তাহলে তিনি স্বাভাবিক নন (পার্ভাট কথাটি আনাতোল এক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন), আর যদি ঈশ্বর ইচ্ছে থাকলেও মন্দ রোধ করতে না পারেন তাহলে তিনি অক্ষম (Impotent বলেছেন ফ্রাঁস), কিম্বা যদি ঈশ্বর মন্দ দূর করতে পারেনও না, ইচ্ছেও করেন না, তাহলে বলতে হয় যে তিনি একই সংগে অস্বাভাবিক ও অক্ষম ('পার্ভার্ট' ও 'ইম্পোটেণ্ট')। তাহলে ঈশ্বর কি ?

আমরা সবাই সংস্কারের দাস। নৈতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ধর্মীয়, সাম্প্রদায়িক সংস্কারের ক্রীতদাস, বিক্রীতদাস। জীবনের সবক্ষেত্রে, দৈনন্দিন ওঠা বসা থেকে শুরু করে এমন কোন কাজ নেই যেখানে পাঁজি পুথির বাইরে স্বাধীন চিন্তার পরিচয় আমরা দেবার দুঃসাহস রাখি। মান্ধাতার আমলের মুখে যেসব কথা শুনে আসছি তারই ভালগার রিপিটেশান, অশ্লীল পুনরাবৃত্তিতেই গা ভাসান আমাদের সহজাত প্রবৃত্তি। সাহিত্যে চিত্রে চলচ্চিত্রে অভিনয়ে শিল্পে নৃত্যে ভাস্কর্যে নামকরা এবং বদ্নামকরা পায়ে নিজেদের বিচারবুদ্ধিকে জলাঞ্জলি দেওয়াই কালচারের পরাকাষ্ঠা মনে করি। সাহিত্যের, সমাজের, রাজনীতির, অর্থনীতির, সংস্কৃতির, জ্ঞানীর,

বিজ্ঞানীর, ধর্মের, বিদ্রোহের, যুদ্ধের ক্ষেত্রে দেশের ও বিদেশের নামকরা কিম্বা বদনাম করা লোকদের কাজের মূল্য নতুন করে যাচাই করতে আমরা নিদারুণ নারাজ। অথচ জীবনের ধর্মই হচ্ছে মতান্তর। কন্‌সিস্‌টেন্‌সিল মৃতের ধর্ম,—একথা অমৃতের [!] পুত্র, আমাদের মধ্যে কে বলবে কবে বলবে আর !

রিভ্যালুয়েশান মানে পূর্ণমূল্যায়ন বলতে আমরা বুঝি ব্যক্তিগত বিদ্বেষ অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের পূর্ণমূল্যায়ন মানে রবীন্দ্র রচনার বিচার নয়, রবীন্দ্রনাথ কবে কার প্রেমে পড়েছিলেন তাই নিয়ে কাদা ছোড়াছুড়ি। বিবেকানন্দকে তাঁর উক্তির মধ্যে, কাজের মধ্যে, কনট্রাডিক্‌শনের মধ্যে না খুঁজে তাঁর শিষ্যাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে কুৎসিত ইঙ্গিতের মাধ্যমে হেয় প্রতিপন্ন করবার প্রচেষ্টাকে আমাদের বাহাদুরি। বার্ট্রাণ্ড রাসেল কি বলেছেন তা নিয়ে নতুন করে ভাবা পৌরুষ নয়, রাসেল চারবার বিবাহ করেছেন অতএব 'ম্যারেজ এণ্ড মর্‍্যালস্‌'এর স্রষ্টা অস্পৃশ্য—, এই কথা বলার কাপৌরুষই আমাদের কর্মফল। আমাদের আলোচোনায় "আলোর ভাগ অল্প ; চোনাই সার।"

একথা কে বলবে, কবে বলবে আর যে চিরযুগের সত্য বলে কিছু নেই। শ্রীকৃষ্ণ থেকে রামকৃষ্ণ পর্যন্ত, গীতা থেকে গীতাঞ্জলি তক, কন্‌ফুসিয়াস থেকে কার্ল মার্কস অব্দি, কারুর কথাই আলোচনার উর্ধ্বে নয় একথা কে বলবে, কবে বলবে আর। মানুষকে অবতার ভাবা, অবতারকে মানুষের পুজো করার দিন, দুর্দিন থেকে মানুষ কবে মুক্ত হবে আর।

ঈশ্বর-দর্শন নয়, জীবন দর্শন করেছে বলে সর্ব সংস্কার মুক্ত পুরুষ কবে আসবে, যে এসেই বলবে, ধর্মের নামে অধর্মের, জ্ঞান-বিজ্ঞানের নামে অজ্ঞানের, দর্শনের নামে চোখ বন্ধের, মুক্তির নামে বন্ধনের

গ্লানি দূর করতে আমি এসেছি। হিন্দুর চোখে আমি কালাপাহাড়, মুসলমানের কাছে আমি কাফের, খৃশ্চানের ভাষায় আমি এন্থিষ্ট, সমকালের চোখে আমি বিদ্রোহী, আগামীকালের চোখে আমি অতিক্রম করে আসা সোপান মাত্র। আমি সব নই, আমিও শব মাত্র।

চব্বিশ

জেন্-গুরুকে তার শিষ্য জিজ্ঞেস করলে: বন্ধন থেকে মুক্তির পথ কীসে? জেন্-গুরু পত্রপাঠ উত্তরের বদলে প্রতিপ্রশ্ন করলেন: But who binds you? সেয়ানা গুরুর সাফ জবাব। হাঁ ঈশ্বর, না ঈশ্বরের মতোই, স্বর্গ-নরক, পাপ-পুণ্যের মতোই কাল্পনিক এই 'বন্ধন'ও স্বকপোল কল্পিত। মানুষের কোনও বন্ধন জন্ম মুহূর্তে নেই; মৃত্যু-মুহূর্তেও না। সময় কাটাবার খেলনা বানাতে গিয়ে সাহিত্য-শিল্প-সংগীত নৃত্য-ভাস্কর্যের মতো সে দর্শন তন্ত্র-মন্ত্র-যাগযজ্ঞ যোগ ইত্যাদির জন্ম দিয়েছে। তারপর এগুলিই ক্রমশ মানুষকে জড়িয়ে ধরেছে এমন প্যাঁচের পর প্যাঁচে যে এখন সে সত্যি সত্যি মনে করে এগুলি বুঝি বুদবুদের চেয়ে বেশি মূল্যবান। প্রাগৈতিহাসিক মানুষ অগ্নি-বরুণকে দেবতা মনে করতো; ঐতিহাসিক মানুষ বুদ্ধ-শংকরাচার্য কাল মার্কস-ফ্রয়েডকে মনে করে মানুষের মুক্তিদাতা!

কোটি কোটি বছরে একটি মানুষও আজও বলতে পারলো কই যে, হাঁ ঈশ্বর, না-ঈশ্বর এ নিয়ে তর্ক কেবল সময় নষ্ট করার ছল মাত্র। কীসের জন্যে ঈশ্বর? না, শান্তির জন্যে? শান্তি কি? না, যা

পেলে আর কিছু পাবার আকাঙ্ক্ষা থাকে না। কোটি কোটি বছরে একটি লোকও বললো কই যে, যা পেলে আর কিছু পাবার আকাঙ্ক্ষা থাকে না তা হচ্ছে মৃত্যু। শান্তি কোনও জ্যান্ত টাটকা প্রতিদণ্ডে ফুটন্ত মানুষ চাইবে কেন? জলে স্থলে নভোতলে অবিরত সংগ্রামে রত মথ থেকে ম্যামথ পর্যন্ত সবাই, বিশ্বের প্রকৃতিই তাই, সারভাইভ্যাল অভ দ্য ফিটেষ্ট হচ্ছে সংসারের সার সত্য। যুদ্ধ করতে করতে জন্মানো যুদ্ধ করতে করতে মরা। ক্ষতচিহ্নই তো মানুষের একমাত্র অলংকার। তার অহংকার!

স্বর্গ যদি সেই জায়গা হয় যেখানে শুধু আলো, শুধু শান্তি, শুধু ভালো তাহলে তার চেয়ে নরক আর কি?

ঈশ্বর-দর্শন মানবজীবনের উদ্দেশ্য কেন? না, আর সবই নশ্বর বলে। রমণী-অর্থ-রূপ-যশ-প্রতাপ সবই নশ্বর, এক ঈশ্বরই জন্ম-মৃত্যুহীন। কিন্তু ক্ষণকালের বলেই তো রমণী-রূপ-রূপো ইত্যাদি এত কাম্য। এগুলি যদি চিরকালের হতো তাহলে জীবনের মতো একঘেয়ে আর কী? মরতে হবে বলেই তো কবির এই কথা: মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে, এত সুন্দর শোনায়। সত্যি সত্যি যদি মর্তে এসে থেকে যেতে হোতো, না হতো মরতে, তাহলে পৃথিবীর কবির মুখে শুনতাম: বাঁচিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে!

মানুষের যিনি ঈশ্বর তিনি 'শান্তি'র হলে মানুষের পৃথিবী এতো অশান্তির হতো না। অশান্তি আছে বলেই তো ছোটা। সৃষ্টির প্রেরণাই তো অশান্তি অতৃপ্তি। কিছুতেই শান্তি নেই বলেই তো গড়া এবং ভাঙ্গা এবং আবার গড়া এবং আবার ভাঙ্গা। যে তৃপ্ত, যে শান্ত, সে তো মৃত। তার মূল্য কী?

স্নেহ-মমতা-প্রেম-কামনা এসবই বন্ধন যদি হয় তাহলেই বা

মৃত্যুতে তা ছিন্ন হতে আটকাচ্ছে কোথায়? ঈশ্বরের প্রয়োজন হচ্ছে কোথায়? মৃত্যুই তো যথেষ্ট তার পক্ষে। আবার জন্মাতে হবে, ঈশ্বর দর্শন না করলে, এই কারণে? তাতেই বা মানুষের বাড়তি দুঃখ কোথায়? গতজন্মের কথা তো তার মনে থাকছে না, এইটেই তার একমাত্র জন্ম জ্ঞানতঃ। মৃত্যুতে সে দুঃখের হাত থেকে অব্যাহতি পায়। মৃত্যুই মানুষের ঈশ্বর। তার মুক্তিদাতা!

মৃত্যু থেকে অমৃতে নিয়ে যাও,—এর চেয়ে অকাম্য আর কিছু হতে পারে বলে আমি জানি না।

যে মানুষ সব পেয়েছে আর যে মানুষ সর্বহারা, মৃত্যু তাদের দুজনের জন্যেই সাড়ে তিন হাত জমির ব্যবস্থা করে রেখেছে। যে মানুষ সব পেয়েছে আর যে মানুষ সর্বহারা, এদের কারুরই যদি মৃত্যু না হতো তার চেয়ে বড় মৃত্যু আর কি হতো মানুষের।

মৃত্যু, মানুষের সাকসেসের অহংকার এবং ফেলিয়ারের ফ্রাস-ট্রেশান, দুই মুছে দেয়। তাই মৃত্যুই কাম্য, মৃত্যুই বন্ধু, মৃত্যুই জীবনের মূল্য।

জন্ম আমাদের হাতে নেই, কিন্তু মৃত্যু আমাদের ইচ্ছাধীন।

এই ইচ্ছামৃত্যুর অন্যতম উপায় হচ্ছে আত্মহত্যা। এই আত্মহত্যাকে পাপ বলেছে সকল ধর্ম। তাতেও নিশ্চিন্ত না থাকতে পেরে সমাজ তাকে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য করেছে মানুষের আদালতে। একজন ইংরেজ লেখক বলেছেন আত্মহত্যা টেম্পরারি ইনস্যানিটি নয়; টেম্পরারি স্যানিটি। তিনি প্রশ্ন করেছেন, যে, একজন মানুষের যখন জীবন থেকে আর আশা করবার মতো কিছু নেই, তখন সে যদি আত্মহত্যা করে তাহলে তা অপরাধ কেন?

এর উত্তর হচ্ছে এ ইচ্ছে সংক্রামক হলে সমাজ টেকে না।

এই সমাজকে টেঁকানোয় কাদের স্বার্থ সিদ্ধি? যারা পেয়েছে সব,—টাকা, খ্যাতি, ক্ষমতা। রাজা ও পুরোহিত এরাই বুঝিয়েছে যে এজন্মে রাজার খাজনা ঠিক মতো দিলে আর জন্মে তুমিও রাজা হবে।

এরাই ঈশ্বর, পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক জন্ম-জন্মান্তরএর স্রষ্টা। যারা এসব বিশ্বাস করেছে তারা নিছক fool; যারা এগুলো বলেছে অথচ বিশ্বাস করেনি তারাই চিরকাল পাওয়ারফুল।

পঁচিশ

কে বলবে? কে বলবে যে সব মিথ্যে কথা। সত্য কেবল,—আমি আছি। ঈশ্বর আছেন কিংবা নেই, এর কিছুতেই আমার কিছু এসে যায় না, এই সত্য কে বলবে। কবে বলবে একজন মানুষ যে, আস্তিক্য ও নাস্তিক্য দুইই মানুষের মিথ্যে বিলাসিতা। সত্যিই কিছু এসে যায় ঈশ্বর থাকলে কিংবা না থাকলে? জন্মান্তর পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক স্বীকার করা কিংবা অস্বীকার করা সময়ের অর্থহীন অপচয় ছাড়া আর কি? যদি জন্মান্তর থাকে তাতে আমার এসে যাচ্ছে কি? গত জন্মে আমি কি করেছিলাম তা যদি এজন্মে স্মরণ করতে পারতাম তাহলেও নাহয় এজন্মে এমন কিছু করতাম না, যাতে আসছে জন্মে আবার সুখে কিংবা অসুখে ভুগতে হয়। অতএব, জন্মান্তর থাকলেও লাভ নেই, না থাকলেই বা ক্ষতি কি? এ নিয়ে আকাশকুসুম চয়নে বাদী এবং প্রতিবাদী, দুজনেই নির্বোধের মতো সময় নষ্টকারী ছাড়া আর কিছু নয়, একথা কে বলবে? কবে বলবে আর।

ঈশ্বর আছেন, কিন্তু তিনি আমার সুখে বিন্দুমাত্র সুখী, আমার দুঃখে এতটুকু বিচলিত মনে করবার মতো দুর্বলতা চরমাস্তিকের ক্ষেত্রেও চরম অসত্য। দেবতাদের সম্পর্কে ধারণার কথা বলছি না। কারণ, মনসার মতো তাঁরা পূজা না দিলে শাপ দেন; স্তব করলে সন্তুষ্ট হন, এমন কিংবদন্তী তাঁদের অনেক কাছের লোক বলে মনে করান। কিন্তু ঈশ্বর? কিংবা তাঁরও উপাস্য যিনি, সেই আদ্যা শক্তি, পূর্ণ চৈতন্য স্বরূপা যিনি, তিনি তো কোটি সৌরমণ্ডল জন্মালে অথবা মরলেও অবিচল। সুতরাং আমার কী এসে যায় তিনি এলেন কি গেলেন তাই বিচার করে।

মর্মচক্ষে যা দেখছি তা ভুল, কিন্তু চর্মচক্ষে যা দেখছি, তাও, যে ঠিক নয়, একথা কে বলবে? কবে বলবে আর। আকাশকে দেখছি নীল চর্মচক্ষে, মর্মচক্ষে জানি, ও নীল নয়, ওর কোনও রংই নেই। মর্মচক্ষু বলছে, হৃদয়, প্রেম, বন্ধুত্ব। চর্মচক্ষু দেখছে ফুসফুস, সেক্স, স্বার্থ। চর্মচক্ষু দেখছে, হাসি-কান্নার হীরে-পান্না; মর্মচক্ষু জানছে, নার্ভের রি-য়্যাকসান। কাকে বিশ্বাস করব? কেন বিশ্বাস করব?

বিজ্ঞান বলছে সকল মানুষকে খেতে দেওয়াই সব চেয়ে বড় ধর্ম; ধর্ম বলছে মানুষ কেবল খাবার জন্যে জন্মায়নি, এই হচ্ছে সব চেয়ে বড় বিজ্ঞান। কিন্তু একথা কে বলবে কবে বলবে আর যে আমি যতক্ষণ খেতে না পাচ্ছি, ততক্ষণ আর সবাই খেতে পেলেও তা অধর্ম; এবং আর অসংখ্য অভুক্ত মানুষের পৃথিবীতে আমার আহার জুটলে তাই বিজ্ঞান।

কেউ বলছে, বিজ্ঞানই সত্য; কেউ বলছে, ধর্ম। কিন্তু একথা কে বলবে, কবে বলবে আর যে বিজ্ঞান ও ধর্মকে রক্ষা করা আমার কাজ নয়; আমাকে রক্ষা করাই বিজ্ঞান ও ধর্মের কাজ। প্রকৃতির

সঙ্গে যুঝে বাঁচবার জন্যে, কখনও কামফাটের কারণে, কখনও মারবার দায় এড়াবার জন্যে বিজ্ঞান এবং বিদ্রোহ শান্ত করবার কারণে, কখনও ফ্রাসট্রেশান ভোলবার জন্যে, কখনও সময় কাটাবার সুযোগের অপেক্ষায়, কখনও অকারণ পুলক সঞ্চারের মহিমায় ধর্ম। বিজ্ঞান বা ধর্ম যদি আমায় বাঁচাতে না পারে তাহলে আমার কাছে তার কানাকড়ি দাম নেই। যে ওষুধে লক্ষ মানুষ বেঁচেছে তা খেয়ে যদি আমার রোগ আরাম না হয় তো সে বিজ্ঞান আমার ধর্ম নয় তখন আর। যে ধর্ম আমার ক্ষেত্রে বিদ্রোহ বন্ধ করতে অপারগ শেষ পর্যন্ত সে ধর্ম আমার কাছে অবৈজ্ঞানিক ছাড়া তখন আর কি! কি আর?

বিজ্ঞান এবং ধর্ম—এদের দুয়েরই প্রয়োজন ফুরিয়েছে। তলোয়ারে নিপুণ কর্তিত মুণ্ডু যেমন ধড়ের ওপর খাড়া থাকে, তেমনই সমাজের স্কন্ধে এই 'যমজ' দাঁড়িয়ে আছে। এখন দরকার, একটু ঠেলা দেওয়া। যে সামান্য ঠেলায় অসামান্য এই দুই বিভীষিকার হাত থেকে মানুষ বাঁচবে। বিজ্ঞান এবং ধর্ম,—এ-দুই-ই দুর্নিবার কুসংস্কার।

মান্ধাতার আমল থেকে এই দুটি মূল মোহিনী মানুষকে কতগুলি মিথ্যে উপহার দিয়েছে। একটি,—বিবেক; আরেকটি,—সভ্যতা। এই দুই বৃশ্চিকের দংশনে মানুষ রক্তাক্ত ক্ষত-বিক্ষত। বিবেকের কথা শুনতে গিয়ে মানুষ তার নিজের কথা বলতে পারেনি; সভ্য হতে গিয়ে মানুষ হারিয়েছে তার স্বাধীনতা। প্রথমটি দিয়েছে মনের অসুখ; দ্বিতীয়টি কেড়ে নিয়েছে দুঃসাহসের সুখ। এই দুই বিপজ্জনক সন্তানেরই জনক এবং জননী হচ্ছে বিজ্ঞান ও ধর্ম।

বিজ্ঞান ও ধর্ম নয়,—পিওর ইনটেলেক্টই মানুষের মহত্তম রক্ষা কবচ। সর্বসংস্কারমুক্ত শুদ্ধ মণীষাই মাত্র মানুষকে মুক্তি দিতে পারে

সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে। রজ্জুতে সর্পভ্রম হচ্ছে, ধর্ম, সর্পে রজ্জুভ্রম হচ্ছে বিজ্ঞান। শুদ্ধ মণীষাই সেই চোখ যা সঠিক দর্শনের অধিকারী। একমাত্র 'সে'-ই বলতে পারে, এসেই বলতে পারে সে-ই কথা যে, জীবন মানে হচ্ছে হয় সময়কে হত্যা করা নয়, সময়ের দ্বারা নিহত হওয়া।

কিছুক্ষণ সময় কাটানো ছাড়া মানবজীবনের দ্বিতীয় কোনও উদ্দেশ্য নেই—একথা কে বলবে, কবে বলবে আর!

বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের সূচীপত্র

এক

হাজার বছর বয়স বাংলা পদ্যের ; বাংলা গদ্যের বয়স দু'শো বছরেরও নয়। পৃথিবীর যে কোন সাহিত্য বিচারে উত্তীর্ণ হবার মত কবিতা এবং গান আর ছোট গল্প বাংলা ভাষায় লেখা হয়েছে। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস গোবিন্দ দাসকে বাদ দিলে বঙ্গ সাহিত্যে অবিস্মরণীয় কীর্তি একা রবীন্দ্রনাথ। জয়দেব, কৃত্তিবাস, কাশীরাম, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন, বেহারীলাল, রবীন্দ্রনাথের আগে বাংলা কাব্যের এই হচ্ছে সূচীপত্র। জয়দেব থেকে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত বঙ্গ সাহিত্যের সূচীপত্রের যে ধারা তার ব্যতিক্রম হচ্ছেন মাইকেল মধুসূদন। বিহারীলাল চক্রবর্তী দ্বিতীয় ব্যতিক্রম। আর এই সাহিত্যের নয় কেবল, বিশ্বসাহিত্যের অদ্বিতীয় ব্যতিক্রম,— রবীন্দ্রনাথ। তিনি শুধু বিশ্বকবি নন, তিনি "বিশ্বকবিরও বিস্ময়"।

রবীন্দ্রনাথের পৃথিবীতে জলস্থল নভোতল ভেদ করে দক্ষিণ মেরুর ঊর্ধ্বে যে অজ্ঞাত কারা মহাজনশূন্যতায় নিরুপম নিঃসঙ্গ রাত্রি সাঙ্গ করছে তারও আলো ধরা দিয়েছে, ভরে দিয়েছে এই ধরাকে অপূর্ব আলোকে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথও যেখানে ব্যর্থ হয়েছেন বঙ্গ সাহিত্যে আজ পর্যন্ত সেই অনুপস্থিত রচনার নাম,—উপন্যাস। দুশো বছরের বাংলা গদ্যে আজও পর্যন্ত একটিও উপন্যাস লেখা হল না। বালজাক থেকে তমাস মান্ পর্যন্ত হ্য কমেদি হিউমেন থেকে ম্যাজিক মাউণ্টেন

পর্যন্ত, তারও পর ওল্ড ম্যান এ্যাণ্ড দ্য সি কিম্বা 'দ্য আউট সাইডার,—এর ধারে কাছে যাবার মত একটি উপন্যাসও বাঙালীর কলমে আজও পর্যন্ত অনুচ্চারিত রইল। যথার্থ মহাকাব্য বাংলা ভাষায় লেখা হয়নি ; মহৎ উপন্যাসও নয়। এর কারণ মহাকাব্য এবং মহৎ উপন্যাস চরিত্রে এক। বাঙালীর ধাতে ঐ দুটি বস্তুই সয়না। যা সয় তার নাম গীতিকাব্য ও ছোটগল্প। এবং এ দুটি বস্তুও চরিত্রে এক।

লৌকিক অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করে অলৌকিক প্রতিভার জারকরসে জারিত করে জন্মায় মহৎ উপন্যাস। বঙ্গ সাহিত্যে অলৌকিক প্রতিভা রবীন্দ্রনাথ। লৌকিক অভিজ্ঞতার অভাবে সেই উপন্যাস তিনি লিখতে পারলেন না, যে উপন্যাস, বালজাক, দস্তয়ভস্কি, তলস্তয়, ফ্লবের, ডিকেন্স, স্তাঁদাল, প্রুস্ত্, মেলভিল, টমাস মান্, হেমিংওয়ে, এবং কাম্যু লিখতে পেরেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই ব্যর্থতার কথা জানতেন না এমন নয়। জীবনে জীবন যোগ করতে না পারলে এ লেখা যে লেখা যায় না, সাহিত্যের সমার্থক রবীন্দ্রনাথের মত আর কে কবেই বা তা জেনেছে ? জানলেও এমন অপরূপ করে মেনে নিয়েছে কে সে কথা ['আমার সাহিত্য জানি আমি,—গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী'] ?

মহাকাব্যের মতই মহৎ উপন্যাস মানব চরিত্রের মিছিল ; জীবনের শোভাযাত্রা। পতন ও অভ্যুদয়ের বন্ধুর পথ যে জীবনের, হাসি কান্নার হীরা পান্না দিয়ে গাঁথা যার ফাগুন পোষের পালা তার কথা যে বলবে তাকে বহু জীবনের ঘাটে জল খেতে হবে, বহু মানুষের অভিজ্ঞতাকে করতে হবে আত্মসাৎ। তাতেও হবে না ; তাছাড়াও চাই 'ইনটুইশান'। এই অনির্বচনীয় বস্তুর যথার্থ সংজ্ঞা কোনও দেশে কোনও কালে দেওয়া সম্ভব হয়নি। কেউ বলেছেন প্রতিভা,

কেউ বলেছেন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। কোটিকে গোটিক, এই ব্যাখ্যার, বিশ্লেষণের, বিচারের অতীত অতিরিক্ত অনুভূতির অধিকারীই কেবল পেরেছেন, মহাকাব্যের সহোদর মহৎ উপন্যাসের জনক হতে। বহুকাল আগে এক মনীষী বলেছিলেন সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মহাকাব্যের দিন শেষ হয়ে গেছে। আজ বেঁচে থাকলে যে কথা তিনি বলতে পারতেন তা হচ্ছে মহৎ উপন্যাসেরও অন্তিমকাল উপস্থিত। সভ্যতা যত যন্ত্রমুখী হবে, কৃত্রিম জীবন যন্ত্রণার ছবি ততই উপন্যাসের বদলে প্রবন্ধে, গল্পের বদলে রম্যরচনার আবির্ভাবকে স্বাগত জানাবে। রচনা মাত্রই স্বগতোক্তি; প্রবন্ধ এবং রম্যরচনা মাত্রই এক্সট্রোভার্ট। মহৎ লেখা এক্সট্রোভার্ট হতে বাধ্য। নিজের মধ্যে যে অপরের অভিজ্ঞতাকে আত্মসাৎ করতে না পারে, বিশ্ব নিরপেক্ষ একাকী আত্মসমাহিত, সহস্রের মাঝে সঙ্গীহীন যে নিজের মধ্যে বিশ্বরূপকে প্রত্যক্ষ করে তার বিস্ময়কে লেখার মাধ্যমে সহৃদয় হৃদয় সংবাদীর চিত্তে অপরূপ সঞ্চার করে দিতে না পারে সে নয় মহৎ উপন্যাসের স্রষ্টা।

রবীন্দ্রনাথ তাহলে কেন পারেননি একটিও মহৎ উপন্যাস লিখতে? এ প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ মূলত গীতিকবি। গীতিকবিতার কলমে গান এবং ছোট গল্প লেখা যায়। ছোট গল্প হচ্ছে গদ্যে লিরিক। কিন্তু মহৎ উপন্যাসে হচ্ছে মহা-কাব্যের গদ্যরূপ। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন;

> "আমি নাববো মহাকাব্য সংরচনে ছিল মনে।
> ঠেকল কখন তোমার কাঁকন কিঙ্কিণীতে,
> কল্পনাটি গেল ফাটি হাজার গীতে।"

মহাকাব্য যে কারণে লিখতে পারেননি রবীন্দ্রনাথ, সেই একই কারণে মহৎ উপন্যাসও একটিও তাঁর হাত দিয়ে বেরয় নি। রবীন্দ্রনাথ

একবার মহৎ উপন্যাস রচনায় প্রয়াসী হয়েছিলেন। সে উপন্যাসের নাম আমরা সবাই জানি,—গোরা। বাংলা ভাষায় গোরাই এখনও পর্যন্ত উপন্যাস রচনার মহত্তম প্রয়াস। তবুও বিশ্ব-সাহিত্যের মানদণ্ডে এ উপন্যাস মহৎ নয়; উপন্যাসও নয়। কেন নয়, এখন সে কথাই আমরা বলব।

দুই

রবীন্দ্রনাথের গোরা উপন্যাস লেখবার পেছনে ঋণ শোধের তাগাদা ছিল। ১৯০৪ সালে প্রবাসী সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কবিকে ৩০০ টাকা হাতে দিয়ে বলেছিলেন, সুবিধে মত একটা গল্প লিখে দিতে। ১৯০৭ সালের এপ্রিল মাস থেকে কবি, গোরা উপন্যাস লিখতে শুরু করেন প্রবাসীতে; ১৯১০-এর মার্চে গোরা শেষ হয়। রামানন্দবাবুর ঋণ শোধ হলেও, রবীন্দ্রনাথের কাছে বাংলা সাহিত্যের ঋণ বাড়ে। সত্যি কথা বলতে কি মহৎ উপন্যাসের প্রচেষ্টা বাংলা ভাষায় ঐ প্রথম এবং ঐ শেষ। রবীন্দ্রনাথ কেন যে আর একবারও এ প্রয়াস করলেন না এটি আমার আজও নিরন্তর সাহিত্য জিজ্ঞাসা।

রামানন্দবাবুর মত আর কেউ রবীন্দ্রনাথের হাতে কিছু টাকা আগাম দিয়ে তাঁকে ঋণগ্রস্ত করতে পারলে, কে জানে, রবীন্দ্রনাথের হাত দিয়ে, বিশ্বসাহিত্যে উল্লেখ করবার মত প্রথম বাংলা উপন্যাস লেখা হত কি না। গোরায় তা অনেকটা হয়েছে কিন্তু পুরোটা তো হয়নি।

এর একাধিক কারণ আছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কারণ বোধ

হয় এই যে রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি। পৃথিবীতে কোনও বড় কবি কোন বড় উপন্যাস আজ পর্যন্ত লিখতে পারেন নি; কোনও বড় ঔপন্যাসিক আজও পর্যন্ত পারেন নি মহৎ কাব্যের জন্ম দিতে। পুরুষ যেমন সন্তান গর্ভে ধারণ করতে পারেনা জৈবিক কারণে, তেমনই অলৌকিক কারণে কবির কলম উপন্যাস এবং ঔপন্যাসিকের কলম কবিতা প্রসব করতে পারেনি। মহাকাব্যের মধ্যে মহৎ উপন্যাসের মালমসলা সবই আছে; মহৎ উপন্যাসের মধ্যে মহৎ কবিতার প্রতিধ্বনি উজ্জ্বল উপস্থিত। মহাভারতকে মহত্তম উপন্যাস, ওয়ার এ্যাণ্ড পিসকে মানব জীবনের মহাকাব্য বললে কিছু ভুল বলা হয় না তবু গোটের হাত দিয়ে 'দ্য কমেডি হিউমেন' কিম্বা বালজাক-এর কলমে 'ফউস্ট' উচ্চারিত হওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল।

এ অসম্ভবকে যিনি সম্ভব করতে পারতেন তিনি রবীন্দ্রনাথ। সাহিত্যে সর্বরকম নিয়মের নির্ভুল প্রমাণ রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসাহিত্যের সবচেয়ে বড় ব্যতিক্রম। বাংলা যার মাতৃভাষা নয় সে বুঝবে না যে কোনও দেশে কোনও কালে কোনও ভাষায় কোনও সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের মত এমন সর্বজনীন সাহিত্যকর্ম সম্ভব। আয়তনে বৈচিত্র্যে গভীরতায়, স্বতঃস্ফূর্ততায় রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বড় অভিজ্ঞতা বিশ্বসাহিত্যের পাঠকের কাছে এখনও অজ্ঞাত। "রবীন্দ্রনাথ শুধু বিশ্বকবি নন তিনি বিশ্বকবিরও বিস্ময়।"

সেই রবীন্দ্রনাথের হাতেও গোরার মত একটি রচনা যা হতে পারত তা হল না। নদী সিন্ধুর মুখোমুখি এসে আশ্চর্য থেমে গেল। সমুদ্রের গভীরতা নদীর উচ্ছলতাকে সংহার করল কই? গোরার উপসংহার হল জোর করে ঘটানো জন্ম দুর্ঘটনা। গোরা যে মুক্তি খুঁজছিল তা এল গোরার জন্ম রহস্যের গুপ্তপথে। এ ট্রাজিডি ঘটনার ট্রাজিডি; চরিত্রের ট্রাজিডি নয়। গোরা যদি আইরিশম্যানের ছেলে

না হত, ঘটনাচক্রে তা যদি জানতে না পারত গোরা তাহলে গোরার জীবনের ট্রাজিডি কি অনেক বেশি অনিবার্য জীবনরস জারিত হত না? উপায়ান্তর না থাকায় নায়ক এবং নায়িকাকে আত্মহত্যা করিয়ে উপন্যাসকার যে অব্যাহতি লাভ করেন গোরার উপসংহারও সেই ইতিহাসেরই অক্ষম পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কি।

পাঠকের চিত্তকে পাতার পর পাতা আন্দোলিত করবার পর উপন্যাসের শেষে এসে গোরা বলছে:

"আপনার কাছেই এই মুক্তির মন্ত্র আছে—সেই জন্যেই আপনি আজ কোনো সমাজেই স্থান পান নি। আমাকে আপনার শিষ্য করুন। আপনি আমাকে আজ সেই দেবতারই মন্ত্র দিন, যিনি হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান ব্রাহ্ম সকলেরই—যাঁর মন্দিরের দ্বার কোনো জাতির কাছে, কোনো ব্যক্তির কাছে, কোনোদিন অবরুদ্ধ হয় না—যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।"

একথাগুলি কার? গোরার নয় নিশ্চয়ই। একথাগুলি ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথেরও নয়। একথাগুলি প্রচারক রবীন্দ্রনাথের। যে কথা আনন্দময়ীকে বলবার সে কথা গোরা গিয়ে বলল পরেশবাবুকে। মুক্তির আলোকে গোরা দেখল আনন্দময়ীর চোখের আলোকে, কিন্তু মুক্তির মন্ত্র রইল পরেশবাবুর কাছে। উপন্যাসের চেয়ে বড় হল উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রনাথ নিজেও তা বোঝেন নি এমন নয়। পরেশবাবুকে মুক্তিদাতা বলে স্বীকার করবার পরেও তাই পরিশিষ্টের প্রয়োজন হয়েছে।

"গোরা সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া দেখিল—আনন্দময়ী তাহার ঘরের সম্মুখে বারান্দায় নীরবে বসিয়া আছেন।

"গোরা আসিয়াই তাঁহার দুই পা টানিয়া লইয়া পায়ের উপর

মাথা রাখিল। আনন্দময়ী তুই হাত দিয়া তাহার মাথা তুলিয়া লইয়া চুম্বন করিলেন।

"গোরা কহিল, 'মা, তুমিই আমার মা। যে মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম তিনিই আমার ঘরের মধ্যে এসে বসেছিলেন। তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা। তুমিই আমার ভারতবর্ষ।"—

"মা, এইবার তোমার লছমিয়াকে ডাকো। তাকে বলো জল এনে দিতে।"

তখন আনন্দময়ী অশ্রু ব্যাকুল কণ্ঠে মৃত্স্বরে গোরার কানের কাছে কহিলেন 'গোরা, এইবার একবার বিনয়কে ডেকে পাঠাই।'

এই পরিশিষ্টের শাক দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর উদ্দেশ্যের মাছ ঢাকতে পারেন নি।

তিন

গোরা উপন্যাসের উপজীব্য হাংগার নয়,—গ্রেট হাংগার। দেহের ক্ষুধার মতই মনের ক্ষুধা নিয়েও মহাকাব্য কিম্বা মহৎ উপন্যাস লেখা যায়। ন্যুট হামসুনের হাংগারের থেকে জোয়ান বোয়ারের গ্রেট হাংগার, উপন্যাসের উপজীব্য হিসেবে কম মূল্যবান নয়। দেহের অন্নবস্ত্র আশ্রয়ের মতই মনের অন্নবস্ত্র আশ্রয়ের কথাও যথার্থ কথা-শিল্পীর হাতে রি-ক্রিয়েশান হয়ে দেখা দিতে পারে। রবীন্দ্রনাথের গোরা একটি মহৎ অন্বেষণের পতন ও উত্থানের বিচিত্র বন্ধুর পথে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ এবং এই কারণেই গোরা বিষয় বক্তব্যে বা মহৎ উপন্যাসের অনুপযুক্ত নয়। দৈহিক সংগ্রামের পরিবর্তে এখানে মানসিক সংঘাতের ঝনঝনা; দেশ জয়ের দুর্বার অভিযানের চেয়ে কম আবেগসম্পন্ন নয়। মানব মনের চিরন্তন প্রশ্নের অরণ্যে এক নিঃশঙ্ক চিত্তের অগ্রগতি প্রকৃতি ও পরিণতি। এ উপন্যাসকে স্পিরিচুয়াল নামাঙ্কিত করবার কোনও কারণ নেই। উপন্যাস রিয়ালিষ্টিক কি রোমান্টিক, ফিজিকাল কিম্বা স্পিরিচুয়াল, এ বিচার পণ্ডিতের; রসিকের নয়।

বিশ্বসাহিত্যের অন্তরের অন্তঃপুরে যে রক্তিম দ্যুতি তার দীপ্তি কেবল সহৃদয়হৃদয়সংবাদীর জন্যে। সাহিত্যের যেটা উপরিভাগ, যেটা তার ছোবড়া তাই নিয়ে যার কারবার সে হল সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ। সৃষ্টির মর্মকোষের মধু যে পান করে সেই রসিক। বিশ্বসৃষ্টিতেও অপরূপকে যে দেখে দুচোখ ভরে, সে জীবনরসে রসিক। ঈশ্বর তার চোখে ওলমাইটি নয়; জীবন শিল্পী। দর্শনশাস্ত্রের পণ্ডিত

তাকে কোনদিন দর্শন করেনা কারণ চোখ বুজে তাঁকে দেখা যায়না। জীবনরস রসিকই জানে সেই জাদু। সে জানে, ঈশ্বরের কোন রূপ নেই। অথবা আকাশের নীলে মধুগন্ধবহ অনিলে যেদিকে তাকাও যা কিছু স্পর্শ কর তাতেই দেখ অপরূপকে, ছোঁও সেই অনঙ্গকে।

সৃষ্টি হচ্ছে ক্রিয়েশান; সাহিত্য হচ্ছে রি-ক্রিয়েশান। ক্রিয়েশানের মূলে যা, রিক্রিয়েশানের মূলেও তাই। বেদনার আনন্দ; আনন্দের বেদনা। এ বেদনা এ আনন্দ বোঝবার নয়; বাজবার। পণ্ডিতেরা একে বুঝতে চায় তাই কালিদাসের কাব্য, মল্লিনাথের টিকা পড়ে বোঝা যায় না, শুধু বোঝা বাড়ে। রসিকতা বুঝতে চায়না তাই তার বুকে সৃষ্টির অনুভূতি সঙ্গীতের মত বাজে। জীবনশিল্পীর মতই জীবনরসিকও নিরুপম নিঃসঙ্গ। মহৎ সাহিত্যের স্রষ্টার মত মহৎ সাহিত্যের পাঠকও কোটিকে গোটিক।

রবীন্দ্রনাথের গোরা উপন্যাসে ঘটনার ঘনঘোর নেই। দুটি মানুষের, গোরা এবং সুচরিতার মনে মহত্তর বাঁচার পথ নিয়ে মতের লড়াই, এ উপন্যাসের প্রধান ঘটনা। যুদ্ধ, রহস্য, ষড়যন্ত্র, কিম্বা সেক্স অনুপস্থিত। প্রায় পাঁচশো পাতা ধরে, বুদ্ধিদীপ্ত বাক্‌চাতুরি, কখনও গভীর গম্ভীর বেদনার বিপ্রলম্ভ, সবার অলক্ষে দুটি রক্তিম হৃদয়ের পরস্পরের জন্যে অনির্বচনীয় আকুলতা,—মানস সরোবরের একটি শতদল ঘোমটা খুলে খুলে বিকশিত হয়ে উঠেছে। সেই বিকাশ, সাহিত্যের সৎ পাঠককে কৌতূহলী করে, বিচলিত করে কিন্তু কোথাও পৌঁছে দেয়না। বস্তুতঃ, গোরা উপন্যাসের শেষে পাঠকের মনে স্বতঃই প্রশ্ন ওঠে, গোরা এখন কি করবে? রবীন্দ্রনাথ নিজেও তার উত্তর জানতেন না বলে তার ইঙ্গিত পর্যন্ত না দিয়ে পরেশবাবুর হাতে গোরাকে ছেড়ে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ চরিত্রে কবি না হয়ে

ঔপন্যাসিক হলে, এ উপন্যাস যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে সুরু হত। এবং গোরা বিশ্বসাহিত্যের সূচীপত্রে রবীন্দ্রনাথের অন্য সাহিত্য কর্মের সঙ্গে অনন্যসাহিত্যকৃতি হিসাবে গ্রথিত হত। গোরা উপন্যাসে গোরার সংহার আছে, উপসংহার নেই।

চার

শ'য়ের নাটক সম্পর্কে একটি অভিযোগ শ'য়ের সবচেয়ে অন্ধ অনুরাগীর পক্ষেও অস্বীকার করা অসম্ভব যে তাঁর নাটকের পাত্র পাত্রীরা রক্তমাংসের মানুষ নয়; ভাবনার প্রতীক। রবীন্দ্রনাথের নাটক এবং উপন্যাসের চরিত্ররাও জীবনের প্রতিবিম্ব নয়, রক্তহীন, কৃত্রিম, শুষ্ক, মতবাদের মুখোস মাত্র। অর্থাৎ তারা কেউ ব্যক্তি নয়; তাদের স্রষ্টার ব্যক্তিত্বের রেকর্ড,—হিস অথবা হিজ মাস্টার্স ভয়েস। রবীন্দ্রনাথের গোরা কোন ব্যক্তি নয়, রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিমানসের প্রতিচ্ছবি,—এ অভিযোগ উঠলে, তাকে নাকচ করা মোহান্ধতার নামান্তর ছাড়া আর কিছু নয়। শ'য়ের নাটকে, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে প্রধান-অপ্রধান পাত্র-পাত্রীরা, শ' এবং রবীন্দ্রনাথের কায়দাতেই কথা বলে। সেক্সপীয়ারের নাটক থেকে সেক্সপীয়ার কি এবং কে এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজা অনর্থক; কারণ সেক্সপীয়ার এই পৃথিবীর সবচেয়ে ইমপারসোন্যাল আর্টিস্ট।

বার্নড শ' যখন সেক্সপীয়ারকে নিছক আক্রমণের উদ্দেশ্যে বলেন: "Life is not a brief Candle for me···", তখন ম্যাকবেথের মুখে বসানো কথাকে সেক্সপীয়ারের জীবনদর্শন বলে ধরে নেয়। সেক্সপীয়ার সম্পর্কে একথা বলা কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়; শ'য়ের

পক্ষে বলা আরও অসম্ভব। কারণ শ'য়ের চেয়ে বড় অনুরাগী সেক্সপীয়ারের আর কে। সেক্সপীয়ার যে জগতের অদ্বিতীয় নাট্যকার তার প্রথম ও প্রধান গুণ হচ্ছে এই ইম্‌পারসোন্যাল আর্টের প্রবক্তা হিসেবে। ব্যক্তি সেক্সপীয়ারকে তাঁর লেখার মধ্যে স্পর্শ করা কোন ব্যক্তির পক্ষেই নিছক পণ্ডশ্রম।

শ' এবং রবীন্দ্রনাথ, এঁদের যে কোন লেখা পড়লেই অন্ধের চোখেও এ সত্য সহসা প্রতিভাত হয় যে শ' ও রবীন্দ্রনাথ কে এবং কী। নাট্যকার এবং ঔপন্যাসিকের ক্ষেত্রে শিল্প বিচারে এটি অনস্বীকার্য অক্ষমতা।

গোরা যখন বলে ঃ "আজ প্রাতঃকালে সম্পূর্ণ অনাবৃত চিত্তখানি নিয়ে একেবারে আমি ভারতবর্ষের কোলের উপরে ভূমিষ্ঠ হয়েছি—"।

কিম্বা বিনয় যখন বলে ঃ "আপনার ফুল দুটি যতই সুন্দর হোক্, তবু তাতে ক্রোধের রংটুকু আছে।"

বা, সুচরিতার মুখে যখন শুনি ঃ শ্রদ্ধার দ্বারা আমরা কি কেবল সত্যকেই পাই? তাতে করে মিথ্যাকেও তো আমরা অবিচারে গ্রহণ করি?"

তখন, এই কথাগুলির পেছনে কার কণ্ঠস্বর আমরা শুনি? রবীন্দ্রনাথের ছাড়া আর কার।

এখানে উদ্ধৃত, গোরার সংলাপটি লক্ষ্য করে দেখা যাবে যে একথা যে কেবল রবীন্দ্রনাথের তাই নয়, ওরকম কোন কথা কোন জ্যান্ত লোক বলেনা। 'চিত্তখানি এবং 'অনাবৃত',—মানুষে-মানুষে কথাবার্তার পক্ষে ওজনে কিঞ্চিৎ ভারী। মনে হয় গোরা কথা বলছে না, বক্তৃতা দিচ্ছে। শুধু গোরা কেন, এই উপন্যাসে প্রায় সবাই সুযোগ পেলেই বাগ্মীতা প্রকাশের জন্যে যেন অধীর প্রতীক্ষায় আছে। শ' তাঁর নাটককে এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁর

উপন্যাসকে যেন প্রচারের প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহার করেছেন। একারণে শ' এবং রবীন্দ্রনাথ নাট্যকার বা ঔপন্যাসিক হয়েও বিশেষ মতের প্রবক্তা মাত্র। পৃথিবীতে যত বড় লেখক জন্মেছেন তাঁদের সকলেরই বিশেষ দৃষ্টিকোণ বঞ্চিত নয় তাঁদের রচনায়। কিন্তু কোন সময়েই তা এমন সোচ্চার হয়নি যাতে চরিত্রকে শিখণ্ডী, মিডিয়মকে প্ল্যাটফর্ম, কথাকে বক্তৃতা মনে হয়েছে। নীতিগল্পের সঙ্গে কথা শিল্পের প্রধান পার্থক্য বোধহয় এই যে, গল্পেও নীতি থাকে কিন্তু নীতিপ্রচারের মধ্যে কোন গল্প থাকেনা। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভুবন যখন কেঁদে ওঠে ঃ "মাসি তুমিই আমার ফাঁসির কারণ", তখন মর‍্যালের সীমা অতিক্রম করে তা ইম্‌মর্টাল গল্পের অংকুর হয়ে দেখা দেয়। শিল্পী হচ্ছে যাদুকর। যে সুতোয় কাটামুণ্ড নড়তে থাকে সে সুতো দেখা গেলেই সর্বনাশ। গল্প উপন্যাস, নাটক, কবিতা, গান মাধ্যম যাই হোক, সৃষ্টির চেয়ে তত্ত্ব, গল্পের চেয়ে নীতি, সঙ্গীতের চেয়ে বাদ্য, ভাবের চেয়ে ভাবনা যখনই বেশী হয় তখনই শিল্পনৈপুণ্যের অভাবের সূচনা হয়। সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত, গোরা-'য় পাঠককে তা সুখ দেয় কিন্তু স্বস্তি দেয়না।

পাঁচ

শ'য়ের নাটকের এবং রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের বলবার কথা এবং কায়দা দুই-ই আছে। দুজনেরই বিরুদ্ধে অভিযোগ যেমন একই যে তাঁদের চরিত্ররা তাদের স্রষ্টার কায়দায় কথা বলে, তেমনই দুজনের সম্পর্কেই স্বীকার না করে উপায় থাকেনা যে, তাঁদের চরিত্ররা যে কথা যে কায়দায় বলে তার তুলনা আর কোথাও মেলে না। সাহিত্যের উত্তর ও দক্ষিণ মেরু হচ্ছেন শ ও রবীন্দ্রনাথ। দু'জনেই প্রফেট অর্থাৎ প্রচারক। দুজনেই নিজেদের সাহিত্য ধর্মে চরিতার্থ। শ'য়ের ব্ল্যাক গার্ল ইন সার্চ অফ গড আর রবীন্দ্রনাথের গোরা এ দুই-ই মানুষের নিরুত্তর জিজ্ঞাসা। এ দুটি রচনাই যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকে শুরু হতে পারত। দুটি বইতেই ইঙ্গিত আছে, উত্তরণ নেই। শ' এবং রবীন্দ্রনাথের জীবন-জিজ্ঞাসার কোন জবাব কোন দেশে কোন কালে মেলেনি। দু'টি জিজ্ঞাসাই মূলে এক। শ' যার জবাব লোকালয়ে খুঁজেছেন রবীন্দ্রনাথ তার লোকোত্তর ভাষ্যে প্রধানত মিষ্টিক। সেই জন্যে শ' হচ্ছেন বিশ্ববিদূষক ; রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি।

শ' এবং রবীন্দ্রনাথের আরও এক জায়গায় আশ্চর্য মিল। দুজনেরই যা বক্তব্য তার প্রতিপক্ষর প্রতি তাঁদের সমান সাহচর্য। শ'য়ের নাটকে নায়ক এবং ভিলেন সমান জোরদার। ভিলেনকে শেষপর্যন্ত ধরাশায়ী করবেন বলে শ কোথাও তার পায়ে আগে থেকে ঘা তৈরী করে রাখেন না। রবীন্দ্রনাথের কাহিনী-কাব্য গান্ধারীর আবেদনে দুর্যোধন যখন বলে :

"ক্ষুদ্র নহে, ঈর্ষা সুমহতী।
ঈর্ষা বৃহতের ধর্ম। দুই বনস্পতি
মধ্যে রাখে ব্যবধান, লক্ষ লক্ষ তৃণ
একত্রে মিলিয়া থাকে বক্ষে বক্ষে লীন ;
নক্ষত্র অসংখ্য থাকে সৌভাত্রবন্ধনে
এক সূর্য, এক শশী।"……

তখন দুর্যোধনের যুক্তি দুর্বল নয়। রবীন্দ্রনাথের গোরাও গোড়ায় যখন রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের বিরোধিতা করছে তখন রবীন্দ্রনাথের অশেষ কৃতিত্ব এই যে গোরাকে ভাঙবার আগে আগাগোড়া গোরার পক্ষ নিয়ে সমান সোচ্চার হয়েছেন। যেমন: "গোরার আচরণে যখন সে এমন কিছু দেখে যাহার সঙ্গে তাহার ধর্মবিশ্বাসের মূলগত বিরোধ, তখন সুচরিতার মন ভয়ে কাঁপিতে থাকে। ঈশ্বর এ কী লড়াইয়ের মধ্যে তাকে ফেলিয়াছেন।"

হরিমোহিনী নব্যমতাভিমানী সুচরিতাকে সুদৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য আজও গোরাকে তাঁহার ঠাকুরঘরে লইয়া গেলেন এবং আজও গোরা ঠাকুরকে প্রণাম করিল।

সুচরিতার বসিবার ঘরে গোরা নামিয়া আসিবামাত্রই সুচরিতা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি এই ঠাকুরকে ভক্তি করেন?"

গোরা একটু যেন অস্বাভাবিক জোরের সঙ্গে কহিল, "হাঁ, ভক্তি করি বৈকি।"

শুনিয়া সুচরিতা মাথা হেট করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, সুচরিতার সেই নম্র নীরব বেদনায় গোরা মনের মধ্যে একটা আঘাত পাইল। সে তাড়াতাড়ি কহিল, "দেখো আমি তোমাকে সত্য কথা বলব। আমি ঠাকুরকে ভক্তি করি কিনা ঠিক বলতে পারিনে, কিন্তু আমি আমার দেশের ভক্তিকে ভক্তি করি। এতকাল ধরে সমস্ত

দেশের পূজা যেখানে পৌঁচেছে আমার কাছে সে পূজনীয়। আমি কোনমতেই খৃষ্টান মিশনারির মতো সেখানে বিষদৃষ্টিপাত করতে পারিনে।”

যে কোন লেখক হলে গোড়া থেকেই গোরার বিরুদ্ধে লেখকের নিজের বক্তব্যের সপক্ষে এমন ধারালো ভারালো যুক্তির ভার চাপাত যাতে লেখকের বক্তব্য তার ভারসাম্য হারাত। রবীন্দ্রনাথ কোথাও সেই চেষ্টা করেননি। বরং গোরার প্রতিপক্ষ, পরেশবাবু এবং পরেশবাবুর প্রতিধ্বনি সুচরিতার কণ্ঠেও এমন কোন যুক্তি একবারও ধ্বনিত হয়নি যাতে মনে হয় যে, গোরাকে হারাবার জন্যে গোড়া থেকেই রবীন্দ্রনাথ তৈরী ছিলেন। আরও, এই উপন্যাসের কমিক রিলিফ পানুবাবুকে দিয়ে যা বলানো বা করানো হয়েছে তাতে গোরার পক্ষে সুচরিতাকে বিরুদ্ধ ধর্মর মত ও পথ থেকে কাছে টানার কাজ হয়ে গেছে অনেক সহজ। বিনয় গোরার কাছ থেকে যেমন সরতে শুরু করেছে, সুচরিতা তেমনই মুহূর্তের মধ্যে যেন গোরার সমীপবর্তী হয়েছে অনেক বেশী। তার প্রমাণ ঃ

“হায়, কোথায় ছিল ভারতবর্ষ। কোন্ সুদূরে ছিল সুচরিতা! কোথা হইতে আসিল ভারতবর্ষের এই সাধক, এই ভাবে-ভোলা তাপস! সকলকে ঠেলিয়া কেন সে তাহারই পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। সকলকে ছাড়িয়া কেন সে তাহাকেই আহ্বান করিল! কোন সংশয় করিলনা, বাধা মানিল না। বলিল ‘তোমাকে নহিলে চলিবেনা, তোমাকে লইবার জন্য আসিয়াছি, তুমি নির্বাসিত হইয়া থাকিলে যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইবে না।’ সুচরিতার দুই চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল, কেন তাহা সে বুঝিতে পারিল না।

গোরা সুচরিতার মুখের দিকে চাহিল। সেই দৃষ্টির সম্মুখে সুচরিতা তাহার অশ্রুবিগলিত দুই চক্ষু নত করিল না। চিন্তাবিহীন

শিশির মণ্ডিত ফুলের মতো তাহা নিতান্ত আত্মবিস্মৃত ভাবে গোরার দিকে ফুটিয়া রহিল।”

স্ুচরিতার কাছে গোরার হার যুক্তির জোরে নয় হৃদয়ের জাদুতে। শোনা যায়, গোরা উপন্যাসের অন্যরকম উপসংহার কবির পরিকল্পনা ছিল। অনুরাগীদের আগ্রহাতিশয্যে রবীন্দ্রনাথ গোরা এবং সুচরিতাকে মিলিয়ে দিয়েছেন। তা যদি হয়ে থাকে তাহলে বলব গোরাকে রবীন্দ্রনাথ গায়ের জোরে সংহার করেছেন, তার যথার্থ উপসংহার করেননি।

ছয়

গোরা উপন্যাসের বিষয়বস্তু বাংলা দেশের একটা বিশেষ সময়ের বিতর্ক থেকে উৎসারিত। এই কারণে তার অনেকটা রঙই আজ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। মূর্তিপূজা বর্ণাশ্রম ইত্যাদি উপলক্ষ্য করে হিন্দু-সম্প্রদায়ের বৃহত্তম অংশের সঙ্গে তার অতি অল্পসংখ্যক একটা গোষ্ঠীর মতবাদের লড়াই নিয়ে যে উপন্যাস রচিত, তার প্রয়োজনীয়তা আজ ফুরিয়ে গেছে। বিশ্ব সাহিত্যে মহত্তম উপন্যাস, তলস্তয়ের ওয়ার এ্যাণ্ড পিস কিম্বা দস্তয়ভস্কির দ্য ব্রাদার্স কারামাজোভ, বালজাকের ওল্ডম্যান গোরিও, ফ্লবেরের মাদাম বোভারি, এমন কি এদের তুলনায় অনেক নিকৃষ্ট হেমিংওয়ের ওলড্‌ম্যান এ্যাণ্ড দ্য সি উপন্যাসও ক্ষণকালের কাহিনীতে চিরকালের কথা বলেছে। এই উপন্যাসগুলির যে কোনটি পড়লে আমরা যে পরিমাণ উত্তেজিত, উদ্বেলিত, উন্মথিত, উদ্দীপিত হই, রবীন্দ্রনাথের গোরা পড়ে তার কণামাত্র অভিজ্ঞতাও আমাদের কোন মুহূর্তে হবার স্মরণ হয়না। এর কারণ রবীন্দ্রনাথের এই উপন্যাসের উপাদান অতি অকিঞ্চিৎকর।

উপজীব্য-উত্তীর্ণ গোরা উপন্যাসে যা মানবহৃদয়ের চিরন্তন উপকরণ সেই ভালবাসার উপস্থিতি, গোরা ও সুচরিতার পরস্পরের হৃদয়মুখীনতা একটি রঙীন কুয়াশায় ঘেরা অনির্বচনীয় রক্তিম স্তব্ধ মুহূর্তও সৃষ্টি করতে পারেনি। যে প্রেম দুটি হৃদয়কে মৃত্যুদীপ্ত জীবনের জ্যোতির্ময়তা দান করে, দেহের পাত্রে আত্মার অমৃত পরিবেশন করে যা, সেই অপ্রতিরোধ্য দুর্বহ দুঃসহ আনন্দ বেদনার অসীম আকুলতা কোথাও উপস্থিত নয়। রক্তশূন্য, প্যাশনলেস, স্নায়ু

রঙীন কথার ফুলঝুরি পাঠককে স্পর্শ করেনা একবারও, একটি মুহূর্তের জন্যেও অসীম কালের আলোক এসে পড়েনা সুচরিতার কালো চোখে; একবারও মনে হয়না, একটি মুহূর্তের জন্যেও না, যে গোরার জীবন-সাধনার দুর্ভেদ্য দুর্গে দক্ষিণের হাওয়া বয়ে এনেছে রোদনভরা বসন্তের রাত। কেবল গোরায় নয়, রবীন্দ্রনাথের লেখায় কোথাও সেই সর্বনাশা প্রেমের সর্বজয়ী আনন্দ বেদনার সঞ্চার নেই, মানব হৃদয়কে যে দেয় মৃত্যুহীন দুর্মূল্য দীপ্তি। যে প্রেমের জন্যে মানুষ হত্যা কিম্বা আত্মহত্যা করে, রাজার মুকুটে লাগে পথের ধুলো, দেহের অসুখে জন্ম নেয় দুরারোগ্য দুঃসাহস, বিশেষ একজনের জন্যে এ পৃথিবীতে কেবল যে আর একজন জন্মায় এবং মরে সেই যুক্তি তর্ক বিচার বিশ্লেষণ ব্যাখ্যার অতীত অকারণ ভালোবাসার কাঁদা হাসার দুর্মর দুরাশার অভাবিত অনাস্বাদিত অনাবিষ্কৃত পৃথিবীর নিরূপম নিস্তব্ধ নিঃসঙ্গ নিঃশঙ্ক অন্তরের অন্তঃপুরে পদচারণা করেনা, আমাদের নিয়ে যায়না সেই অকূল সরোবরে যেখানে কাল অনাদি এবং জীবন অনন্ত।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যে বিচিত্র বর্ণনাতীত আনন্দ বেদনার স্পর্শ কখনও ফুরোয় না, আমাদের আন্দোলিত করে, এই পৃথিবীর চেয়ে বৃহত্তর আরেক পৃথিবীর ওই আকাশের চেয়ে অসীমতর আরেক আকাশের ছবি আর গান আমাদের ইন্দ্রিয়াতীতের গোচর করে, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস তা যে করে না কেবল তাই নয়, অসম্পূর্ণ উদ্যম অনিবার্য এই অভিজ্ঞতায় উপস্থিত করে যে, গীতি কবির কল্পনায় মহাকাব্যের কিম্বা মহৎ উপন্যাসের চারণক্ষেত্র নয়। আর নয় বলেই কবিতায় এবং গল্পে কবিকল্পনা এমন উদ্দাম মনোহর। তাঁর সাহিত্য বিচিত্রগামী, সর্বত্রগামী নয় যে, এতে আমাদের লোকসান নয় লাভ। সর্বত্রগামী

হলে আমরা যা পেতাম তা নিয়ে বিচিত্রগামীই মাত্র হবার জন্যে আমরা যা পেয়েছি তার ক্ষতিপূরণ হতো কিনা কে বলবে?

গোরায় যার চেহারা আনন্দে আলোয় প্রাণে ঝলমল করছে সকাল বেলার সূর্যের মতো, সে ললিতা। ছোটগল্পের চরিত্র। এ উপন্যাসের গুমোটে ওই একমাত্র বসন্তের হাওয়া। লঘুপদসঞ্চারে যতবার এসেছে ততবার নিয়ে এসেছে এক ঝলক আলো, একমুটো সোনা। সুচরিতার মতো আদর্শের বাতিক নিয়ে মাথাব্যথা নেই; নেই বিনয়ের মতো একবার এদিক একবার ওদিকে হেলা। যে পরিবারে সুচরিতা বড়ো হয়েছে সেই আবহাওয়াতেই মহাকাব্য কিংবা মহৎ উপন্যাসের আসরে যা হতো জল প্রপাত, গীতিকাব্যের কিম্বা ছোট গল্পের পাত্রে তা হয়েছে নির্ঝরিণী। গোরা উপন্যাসের শুকনা গাঙে জীবনের উদ্দাম কৌতুক ললিতা,—অরণ্যের বুনো গন্ধ গা থেকে মুছে ফেলে পিঞ্জরে পোষা বাঘের মতো; আকাশগংগাচারী বিহংগ যেন সোনার দাঁড়ে ডানা ঝাপটাচ্ছে অক্ষম আক্রোশে। এক ললিতাকে উপস্থিত করেই বলা যায় রবীন্দ্রনাথ কি দক্ষ রূপকার ছাটো গল্পের এবং কী অনিচ্ছুক ঔপন্যাসিক!

সাত

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কি পারতেন না সত্যিই ? সত্যিই কি পারতেন না নিরবধিকাল বিপুলা পৃথ্বী জুড়ে জীবনমৃত্যু সুখ দুঃখে সকল মানুষকে যে জিজ্ঞাসা অহরহ বিদ্ধ করছে তা উত্তরের অন্বেষণে আকাশ পাতাল ঢুঁড়তে ? তলস্তয়ের ওয়ার এ্যাণ্ড পিস, দস্তয়ভস্কির দ্য ব্রাদার্স কারামাজোভ কি রবীন্দ্রনাথেরও মহৎ অন্বেষণ হতে পারত না ? জীবনের উদ্দেশ্য কি, কিম্বা আদৌ এর কোন উদ্দেশ্য আছে কিনা, ঈশ্বরকে, পাপ-পুণ্যের অপরাধ করে, দণ্ডদাতার সঙ্গে দণ্ডিতের বিচার কি রবীন্দ্রনাথের কলমে উচ্চারিত হতে পারত না ? পারত যে তার প্রমাণ রবীন্দ্রসাহিত্যের আলোচনায় সর্বাধিক উপেক্ষিত একটি রচনা, —যার নাম, 'চতুরঙ্গ'। রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে জটিল, সবচেয়ে ভয়ঙ্কর স্বগতোক্তি এই না উপন্যাস না ছোটগল্প, সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যে সবচেয়ে উজ্বল অন্ধকার চতুষ্কোণ,—জেঠামশাই, শচীশ, শ্রীবিলাস এবং দামিনী এই চারজনকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ জীবনে একবার যে রঙ্গে মেতেছিলেন সে রঙ্গের ক্রমবিবর্তনে তিনটি চরিত্র, বিনোদিনী দামিনী এবং সোহিনী আসলে রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের এবং জীবনকাব্যের নিরুত্তর জিজ্ঞাসার উত্তর অন্বেষণ। সতর্ক পাঠকের দৃষ্টি এড়াবার কথা নয় যে, তিনটি চরিত্রের নামেরই শেষ অক্ষরটি এক , এবং তার পেছনে একটি অস্ফুট অনুচ্চার অনালোকিত কিন্তু জীবন-মরণ জিজ্ঞাসার সৌরভ জড়ানো ছিল। এই তিন চরিত্রের লৌকিক ভিত্তি যেই হোক, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে জীবনে ভুলতে পারেন নি, ভুলতে চানওনি। এই ভুলতে না পারা ভুলতে না চাওয়া অভিজ্ঞতাকে

আশ্রয় করে একটি মূর্তি অবিস্মরণীয় হতে পারত, চতুরঙ্গের অন্তিম মুহূর্তে তার মুখে দুলে ওঠা। "সেদিন মাঘের পূর্ণিমা ফাল্গুনে পড়িল, জোয়ারের ভরা অশ্রুর বেদনায় সমস্ত সমুদ্র ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল, সেদিন দামিনী আমার পায়ের ধূলা লইয়া বলিল, সাধ মিটিল না, জন্মান্তরে আবার যেন তোমাকে পাই।"— মৃত্যুর কারণ বিপ্রলম্ভধ্বনিতে কাঁপা জীবনের পদ্মপাতায় যৌবনের এই রক্তিম দ্যুতি মনে হয়না কি, একটু বেশী অসময়ে অকস্মাৎ মিলিয়ে গেল?

রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গ মহৎ উপন্যাসের উপাদান নিয়েও উপন্যাস হলনা; কেন?

চতুরঙ্গ রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে অ-জনপ্রিয় গদ্য রচনা। যতদূর মনে হচ্ছে, এই বই সম্পর্কেই রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন যে, বেরুবার পর একবছরে বিক্রী হয়েছিল আঠার কপি। সমালোচকরাও চতুরঙ্গের তেমন তল্লাস নেননি। রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন যে তিনি সব সইতে পারেন, অধ্যাপকের কাব্য বিশ্লেষণ ছাড়া। অধ্যাপকরাও চতুরঙ্গকে অব্যাহতি দিয়েছেন। চতুরঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কি বলতে চেয়েছেন তার কোনরকম হদিশ না পেয়ে চতুরঙ্গ সম্পর্কে প্রায় সবাই চাণক্য বাক্য, 'তাবচ্য শোভতে মূর্খ' স্মরণ করে মানরক্ষা করেছেন চুপ করে থেকে।

চতুরঙ্গ রবীন্দ্রনাথের সাধু ভাষায় লেখা শেষ গদ্য কাহিনী; গোরার পরে এবং ঘরে বাইরের আগে লেখা। পাতার সংখ্যা পঞ্চাশ। গল্পারম্ভের আগে বলা হয়েছেঃ এই বইখানির নাম চতুরঙ্গ। 'জ্যাঠামশায়' 'শচীশ' 'দামিনী' ও 'শ্রীবিলাস' ইহার চারি অংশ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনার কোন ভূমিকা করেননি; পরিশিষ্টও না। সোনার তরী নিয়ে যে হাস্যকর ছেলেমানুষী শেষ পর্যন্ত

রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে বলিয়েছিলেন গভীর খেদের সঙ্গে যে, ধরেই নাও না যে ও কবিতা বর্ষার দিনে প্রকৃতির একটা ছবি', চতুরঙ্গের ক্ষেত্রে অর্থ নিয়ে তার কণামাত্র কৌতূহল কখনও দেখা দিয়েছিল বলে কোন প্রমাণ নেই। রবীন্দ্রসাহিত্যের ওপর যত বই বেরিয়েছে তার একটিতেও চতুরঙ্গ সম্পর্কে এমন আলোচনা নেই যাতে চোনার চেয়ে আলোর ভাগ এতটুকু বেশী। রবীন্দ্রনাথ নিজেও চতুরঙ্গ সম্পর্কে আশ্চর্য নীরব। গল্পগুচ্ছ সম্পর্কে তাঁর এ দুঃখ ছিল যে বাংলা দেশের গ্রামকে তিনি যে শেকড় সুদ্ধ প্রথম বাংলা ছোট গল্পে উপস্থিত করলেন সে কথার স্বীকৃতি বাঙ্গালী পাঠকের কাছে তাঁর জীবদ্দশায় মেলেনি; চতুরঙ্গের কম বিক্রী নিয়ে যে কথা বলেছেন তাকে আমরা এহ বাহ্য বলে উড়িয়ে দিতে পারি! কারণ, বইয়ের বিক্রী কখনই কোন বড় লেখকের একমাত্র বক্তব্য হতে পারে না। কিন্তু চতুরঙ্গের পঞ্চাশ পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ যা বলতে চেয়েছেন গোরা-র সাড়ে তিনশো পাতায় তার চেয়ে অনেক অকিঞ্চিৎকর উপাদানে লেখনী ও মসীক্ষয় করেছেন, তবু চতুরঙ্গ যে কোন সৎ দুঃসাহসী সমালোচক বা পাঠকের দ্বারা নন্দিত কিম্বা নিন্দিত কোনটাই তেমনভাবে হয়নি, এ দুঃখ নিশ্চয়ই আমার একার নয়, আরও একজনকে এই অবহেলা কিম্বা অযোগ্যতার বেদনা নিশ্চয়ই বিদ্ধ করেছিল যাঁর নাম রবীন্দ্রনাথ। তবু সেই বেদনার কথা তিনি কোথাও ব্যক্ত করেননি যে তাতে বুঝি, রবীন্দ্রনাথ কেবল মহৎ লেখক নন, সৎ পাঠকও বটে। চতুরঙ্গের অঙ্গে স্থূল হস্তাবলেপ আশঙ্কায় ঐ বই সম্পর্কে যে কোন বিতর্ককে তিনি পরিহার করে চলেছেন। ভবভূতির সান্ত্বনাবাক্য স্মরণ করে অপেক্ষা করেছেন একজন পাঠকের, যে বলবে, চতুরঙ্গই এখনও পর্যন্ত বঙ্গ সাহিত্যে আধুনিক-

তম বক্তব্য। চতুরঙ্গের পর আর একবার; আর একবারই মাত্র, ল্যাবরেটরীতে দুঃসাহসী পরীক্ষা চালিয়েছিলেন শেষ বয়সের সংস্কারমুক্ত রবীন্দ্রনাথ, জীবনের সিন্ধুমন্থন করে যাকে তুলে এনেছিলেন সেই সোহিনী, চোখের বালির বিনোদিনী, চতুরঙ্গের দামিনীর সবচেয়ে জীবন্ত প্রীতিরূপ, সোহিনী। বঙ্গসাহিত্যের অনাগতকালের পাথেয় চতুরঙ্গের মধ্যে রেখে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। জীবনের ল্যাবরেটরীতে লেখক এখনও পর্যন্ত অসমাপ্ত ঐ পরীক্ষা চালাবার জন্যে আবার দেখা দেবেন, তিনি রবীন্দ্রনাথের কথা-সাহিত্যের যোগ্য উত্তরাধিকারী হবেন; এবং তাঁর হাত দিয়েই বেরুবে প্রথম যথার্থ বাংলা উপন্যাস। চতুরঙ্গে যার আভাস, ল্যাবরেটরীতে যার আলাপ, তার বিস্তার এখনও অপেক্ষিত। ফরাসী সাহিত্যে আলবিয়ের কাম্যুর হাতে রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গ পড়লে আমরা জানতে পারতাম যে গীতাঞ্জলির কবিই কেবল কেমন করে হতে পারেন চতুরঙ্গের কথাকার।

কাম্যুর 'আউট সাইডার' রবীন্দ্রনাথের 'দামিনী'-ই। পঞ্চাশ পাতার শেষে এই অনতি ব্যক্ত করুণ বিপ্রলম্ভ চতুরঙ্গর দামিনী যখন বলেছে, 'সাধ মিটিল না, জন্মান্তরে আবার যেন তোমাকে পাই'— তখনই জানা গেছে সাহিত্যে সে আবার জন্ম পরিগ্রহ করবে। তার জন্মান্তরের রূপমোহিনী ছোটগল্পের স্বল্প পরিসরে অকালমৃত্যুতে ব্যাহত, কিন্তু বিনোদিনী-দামিনী-সোহিনী দেশ ও কালের সীমার সীমাহীন ঊর্ধ্বে মানব জীবন যন্ত্রণার নিত্য পরিবর্ত্য প্রতিচ্ছবি। কাম্যুর আউট সাইডার তাই অন্য দেশের পুরুষ হয়েও এই নারীরই জীবন-জিজ্ঞাসা। ফ্লবেরকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, মাদাম বোভারি কে, তখন তিনি বলেছিলেন 'C'est moi'—'সে আমি'। যদি রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞেস করা হত, দামিনী কে, তাহলে তারও

অবধারিত উত্তর ঐ। রবীন্দ্রনাথের জীবনতৃষ্ণারই আরেক নাম, অনিবার্য, অপরিহার্য, অপ্রতিরোধ্য দামিনী।

নশ্বর পৃথিবীতে অবিনশ্বর এই তৃষ্ণা, এরই নাম জীবন। চতুরঙ্গ বিশ্বসাহিত্যের সূচীপত্রে উল্লিখিত হবার মতো মহৎ জীবনায়ন।

আট

বাংলা সাহিত্যে বুদ্ধির আলোয় উদ্ভাসিত উপন্যাস, সম্ভবত ঐ একটিই,—রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গ। ভাবালুতার আতিশয্যের কারণে বাংলায় উপন্যাস জাতীয় রচনা প্রায়ই স্ত্রীলোক ও নাবালক পাঠ্য। শরৎচন্দ্র অসাধারণ দক্ষ গল্পকার; কিন্তু তাঁর রচনায় মানবজীবনের বিশাল দিগন্ত কিম্বা অতল গভীরতা উপস্থিত কই? বঙ্কিমের লেখায় ভাবালুতা প্রায় নেই; বরং কাঠিন্য সংহতি ও স্বল্পোভাষিতা আছে; কিন্তু বুদ্ধিকে উদ্দীপিত আলোড়িত করে কিম্বা জীবন যন্ত্রণার রক্তাক্ত প্রতিচ্ছবি বা মানব চরিত্রের জটিল গ্রন্থিমোচন যা বিশ্বসাহিত্যের অপরিহার্য অঙ্গ, সেই দুঃসাহসের দীপ্তি কোথায়? বাংলা সাহিত্যে সেই পথে প্রথম পা বাড়িয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। এবং পরবর্তী অধ্যায়ে দ্বিতীয় অদ্বিতীয় পদক্ষেপ পুতুল নাচের ইতিকথা-র অবিস্মরণীয় মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। পথের পাঁচালীর বিভূতিভূষণ বঙ্গ সাহিত্যের উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। বাংলা ভাষায় গদ্য কাব্যর যথার্থ একমাত্র জন্মদাতা বিভূতিভূষণ।

চারটি মাত্র চরিত্র চতুরঙ্গে। তার মধ্যে রঙ্গ একজনেরই; দামিনীর। চারের মধ্যে সে এক নয়। শচীশ ও শ্রীবিলাসের সবটুকুই দামিনীর চাওয়া ও না পাওয়ার কথা। আর একটি আশ্চর্য

চরিত্র, পাপিষ্ঠা ননিবালা। রবীন্দ্রনাথের কোন রচনায় কোন চরিত্রের মুখে এই অপরূপ উক্তি অনুচ্চারিত যে :

"বাবা, পারিলাম না, আমাকে মাপ করো। তোমার কথা ভাবিয়া এতদিন আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু তাঁকে যে আজও ভুলিতে পারি নাই। তোমার শ্রীচরণে শতকোটি প্রণাম।

—পাপিষ্ঠা ননিবালা

সমস্ত যুক্তি তর্কের সীমাহীন ঊর্ধ্বে বিধাতার আসনে যে বিবেক আসীন তাকে অস্বীকার করা জ্যাঠামশায়ের বুদ্ধিতেও কুলোনো যে অসম্ভব তারই পরিচয়ে পাপিষ্ঠা ননিবালার এই পত্র প্রদীপ্ত। ননিবালা ঠিক করেছে কি ভুল করেছে, বুদ্ধির অভাবের নামই বিবেক কি না, এ প্রশ্ন তুলে অথবা না তুলেও বলা যায় যে ননিবালার ঐ চিঠি জ্যাঠামশায়ের পসিটিভিসমের দুর্ভেদ্য দুর্গকে মুহূর্তে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। সেই ধুলোয় জগমোহন এবং শচীশ একাকার বিস্মৃত ; একা ননিবালা তার দুর্মর সংস্কার নিয়ে ধুলো থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে অবিস্মরণীয় মনুষ্যত্বে, নিরাভরণ, নিরাবরণ, নিরুপম নগ্ন সত্যের নিরুপমা মূর্তি ধরে। দামিনীর জীবন তৃষ্ণার চেয়েও ননিবালার মৃত্যু প্রাণের আগুনে অনেক বেশী রাঙা। এরপর জ্যাঠামশায়কে চতুরঙ্গের মঞ্চ থেকে সরিয়ে নেওয়া ছাড়া রবীন্দ্রনাথের কলমেও আর কিছু করণীয় ছিল না। জ্যাঠামশায়ের কথাই যে শেষ কথা নয় ননিবালার মৃত্যুতে তা অশেষ হয়ে রইল।

চতুরঙ্গের শুরু জ্যাঠামশায়ের কথা দিয়ে। তার কথা সূর্যলোকের মত অবারিত স্পষ্ট। শুধু তাই নয়, তা মুহূর্তের জন্যেও নয় সংশয়ের মেঘে আচ্ছন্ন। ঈশ্বর নেই, কারণ ঈশ্বর প্রদত্ত বুদ্ধি যেহেতু ঈশ্বরকে মানছে না সেহেতু স্বয়ং ঈশ্বরই ঈশ্বরকে অস্বীকার করছেন,—এই ছিল জগমোহনের ঈশ্বরতত্ত্ব। সেই তত্ত্বে ভাইপো শচীশকে দীক্ষা দেওয়া

তার বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন ছিল। এই নেশাই ছিল তার একমাত্র প্যাশন। এই শচীশকে যেদিন দিতে হল সেদিন জগমোহনের বক্ষ বিদীর্ণ হল; বিচ্ছেদ বেদনা সমস্ত জগৎকে অসীমতায় ছেয়ে দিল। শচীশের ছেড়ে যাওয়া জায়গায় প্রবেশ করল ননিবালা। নাটক দ্বিতীয় অঙ্কে পা দিল। ননিবালাকে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছিল একদিন পুরন্দর,—শচীশের আপন ভাই। জগমোহনের বাড়িতে শচীশ যখন তাকে নিয়ে আসে তখন সে সন্তান সম্ভবা। এই ননিবালাকে জগমোহন 'মা' বলে ডাকেন। মা কে? জগমোহনের কথায় জীবকে যিনি গর্ভে ধারণ করেন তিনি মা; প্রাণ সংশয় করে ছেলেকে জন্ম দেন যিনি। এই ননিকে শচীশ বিয়ে করতে চাইল। বিবাহের আগে দুজনের মন-জানাজানির দিনে ননি জগমোহনের কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করল। জগমোহন আশীর্বাদে বিশ্বাস করেন না কিন্তু ননির নিষ্কলঙ্ক মুখখানা দেখলে তার মনে আশীর্বাদের ইচ্ছা জাগে। সেই ইচ্ছে মাথায় নিয়ে ননিবালা জগমোহনের দেওয়া জামা কাপড় পরে চলে গেল সেখানে, যেখানে পুরন্দরের অত্যাচার শচীশের পরোপকার এবং জগমোহনের প্রত্যাশা পৌঁছয় না।

ননিবালার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে জ্যাঠামশায়ের কথা শেষ। এরপর জ্যাঠামশায় যে কদিন বেঁচে ছিলেন সে কদিনের কথা রবীন্দ্রনাথ চতুরঙ্গের কোথাও বলেন নি। তা অপ্রয়োজনীয় বলে নয়, বাহুল্যের কারণে শিল্প ব্যাহত হবে বলেও নয়, মাঝখানে এই ফাঁকটুকু রেখেছেন জ্যাঠামশার থেকে শচীশের কথায় পৌঁছবার পথে। রঙীন স্তব্ধতার সেতু স্বরূপ বেদনার করুণ রঙীন সেই পথে চতুরঙ্গের সকল চরিত্রকে হার মানানো পরম আশ্চর্য পবিত্রার সৌরভে আচ্ছন্ন করতে মনের দিগন্তে। সেই দিগন্তে পাপিষ্ঠা ননিবালার স্মৃতি নীলাঞ্জন রেখায়

আঁকা হয় পাঠকের সহৃদয় হৃদয় সাংবাদিতায়। রবীন্দ্রনাথ যে কতবড় শিল্পী তার প্রমাণ মাঝখানের এই ফাঁকটুকুতে বিমূর্ত। চারটি লোকের জীবন রঙ্গমঞ্চে একটি হতভাগ্য স্ত্রীলোকের নিঃশব্দ প্রস্থান অপরূপ মূর্ছনায় অশ্রুতে বেজেছে অন্তরের অন্তঃস্তলে যেখানে অনন্ত প্রশ্নের সাগর গর্জন স্তব্ধ; হৃদয়ের সমুদ্র যেখানে সবচেয়ে নীল। সেই অতল থেকে এক অনির্বচনীয় জীবনের অনুচ্চারিত মহিমার পদ্মরাগমণি মৃত্যুহীন দীপ্তিতে দ্যুতিময়। ননিবালার আসা এবং যাওয়া আলোক ও অন্ধকারে কাঁপা একটি জোনাকির জ্বলা আর নেভার মধ্যে জন্ম জন্মান্তরের সীমা ও অসীমের অন্ত ও অনন্তে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের আনন্দ বেদনায় অস্থির। এই অস্থিরতা, পাঠককে ধ্যান দিয়ে ধরতে হয়; ভরতে হয় জ্যাঠামশায়ের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অনুক্ত রঙীন শূন্যতা। যে ধরতে পারবে সেই সূত্র, যে ভরতে পারবে সেই অপূর্ণতা, সে জানবে যে জ্যাঠামশায়ের হার হয়েছে ননিবালার কাছে। বিদ্যা দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে ঈশ্বরকে অস্বীকার করা যায়; কিন্তু যাকে তুচ্ছ করা যায় না তা হচ্ছে জীবনের মহিমা। যে মহিমা, সর্বাধিক সংখ্যার জন্যে সর্বোত্তম ব্যবস্থা তত্ত্বে নিহিত নেই; যা নিহিত আছে সুযোগ পেয়েও তাকে ছেড়ে দেওয়া চরিত্রের মধ্যে। চতুরঙ্গে চরিত্র হচ্ছে ননিবালা। সবচেয়ে স্বচ্ছ চরিত্র সে; সবচেয়ে জটিল চরিত্র,—দামিনী।

নয়

সমুদ্রের ধারে মাঘের পূর্ণিমা ফাল্গুনে পড়ল যেদিন, জোয়ারে ভরা অশ্রুর বেদনায় সমুদ্র যেদিন ফুলে ফুলে উঠতে লাগল, সেদিন দামিনী শ্রীবিলাসের পায়ের ধুলা নিয়ে বলল : 'সাধ মিটিল না, জন্মান্তরে আবার যেন তোমাকে পাই।'

চোখের বালির বিনোদিনী জন্মান্তরে দামিনী ; চতুরঙ্গের দামিনী জন্মান্তরে লেবরেটরির সোহিনী। জীবন তৃষ্ণার ভয়ংকর একটি রূপ এই তিনটি অপরূপ চরিত্রের মধ্যে দিয়ে অসম্পূর্ণ পরিণতিতে দ্বিধাগ্রস্ত। দেহেই যে নিঃসন্দেহে পাওয়া যায় সন্দেহাতীতকে, এই প্রত্যয়ে তিনটি প্রতিচ্ছবি শেষ অশেষ কথাটি উচ্চারণ করেনি। তার কারণ রবীন্দ্রনাথ এই প্রত্যয়ে কখনও সাড়া দেননি ; কিন্তু সংশয়ে আবেগে আকুলতায় রক্তাক্ত ক্ষত বিক্ষত বিনোদিনী-দামিনী-সোহিনীর মধ্যে দিয়ে অপ্রতিরোধ্য জীবন তৃষ্ণার স্বীকৃতি স্বরূপ দামিনীকে দিয়ে বলিয়েছেন : জন্মান্তরে আবার যেন তোমাকে পাই। এই 'তুমি' কে ? শচীশও নয়, শ্রীবিলাসও নয়। ফ্লবেরত' প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। মাদাম বোভারি কে, এই জিজ্ঞাসার জবাবে যখন বলেছেন 'C'est moi'।

এই জীবনতৃষ্ণা আসলে সৃষ্টির নয়, স্রষ্টার। এরই আরেক নাম, ইলান ভাইটা। এবং আরও এক নাম, লাইফ ফোর্স। সৃষ্টির মূলে এই প্রেরণা। যৌবনে সোনার তরীতে জীবনের নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়ে কবি প্রশ্ন করেছিলেন : আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে। কে নিয়ে যায় ভ্যানগগকে সভ্যতার স্বচ্ছন্দ নিরাপত্তা থেকে

প্রাগৈতিহাসিক ভয়ংকর সুন্দর বক্ষে সুনিশ্চিত অনিশ্চয়তা? যে রাজার কুমারকে ঈর্ষাযোগ্য রমণীর দেহের দীপালোকের আমন্ত্রণকে উপেক্ষা করে পথের ধুলোর ডাকে প্রেমের আসন পাততে,—এ সে-ই। কোনো চতুর্ভুজ দেবতা এ নয়। এর নাম জীবনতৃষ্ণা; লাস্ট ফর লাইফ। রবীন্দ্রনাথ একে কখনও বলেছেন জীবন দেবতা, কখনও বিদেশিনী, কখনও বা কৌতুকময়ী বিচিত্র রূপিনী। কিন্তু কখনও কোন দেশ কোনো কবি, এ প্রশ্নের উত্তর পাননি। জীবনের শেষ সন্ধ্যায় শেষ সূর্যাস্তে, জানা যায়নি, জীবনের প্রথম প্রভাতে, জীবনের প্রথম সূর্যোদয়ে উচ্চারিত মানব জীবনের একমাত্র জিজ্ঞাসা: 'কে তুমি।'

নাভির গন্ধে মাতাল মৃগের মত বিনোদিনী-দামিনী-সোহিনী উত্তেজিত হয়েছে, উন্মোথিত, উদ্বেল, উদ্দীপিত, রক্তাক্ত, ক্ষত বিক্ষত রিক্ত। কিন্তু জন্মান্তরে কাকে পেলে এই তৃষ্ণার হাত থেকে অব্যাহতি মেলে তার উত্তর না পেয়েই বলেছে: 'সাধ মিটিল না।'

এটি সাধ মেটানো সাধ্যাতীত। এ জিজ্ঞাসার জবাব পেয়ে গেলে সৃষ্টির সোনার তরী চলতে চলতে থেমে যেত। এর উত্তর যাঁরা পেয়েছেন তাঁরাও বলে যাননি, 'কে তুমি।' অন্বেষণের শেষে বুদ্ধদেবকে আনন্দ তাঁর অভিজ্ঞতার কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন। অসংখ্য পত্রে শোভিত বৃক্ষের দিকে একবার এবং আরও একবার মাটিতে পড়ে থাকা কয়েকটি পাতার দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেছিলেন বুদ্ধদেব। অর্থাৎ এ-অভিজ্ঞতার যতটুকু বলা যায়, তার চেয়ে বলা যায় না অনেক বেশী। এবং বলা যায় না বলেই চলা যায় যৌবনের সোনার তরীতে জীবনের নিরুদ্দেশ যাত্রায়।

পৃথিবীর সকল যুগের সকল দেশের কবি তাঁদের সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে বারংবার এই বিস্ময় প্রকাশ করেছেন যে: এ কি কৌতুক নিত্য

নূতন ওগো কৌতুকময়ী, আমি যাহা কিছু বলিবারে চাই বলিতে দিতেছ কই?' কিম্বা তাঁরা জানতে চেয়েছেন: 'ওহে অন্তরতম, মিটেছে কি তব সকল তিয়াস, আসি অন্তরে মম?' এই তিয়াস কিছুতেই মেটে না। মিটলে আর লেখবার, আঁকবার গাইবার, শুধোবার কিছু থাকে না। তাই দামিনীর মত বলতেই হয়: 'জন্মান্তরে আবার যেন তোমাকে পাই।'

দেহ সম্ভোগে এ তৃষ্ণা মেটেনা। অর্থ, খ্যাতি, রূপ কিছু দিয়েই নির্বাপিত হয়না দুর্মর জীবনতৃষ্ণা। রূপের মধ্যে অপরূপকে, সীমার মধ্যে অসীমকে, অন্তের মধ্যে অনন্তকে অন্বেষণ তাই অনিবার্য হয়ে দেখা দেয়। যা পাই, পাবার পর দেখা যায় তা চাই না; যেখানে পৌঁছবার সেখানে পৌঁছে বলি, 'হেথা নয় হেথা নয় অন্য কোথা অন্য কোনো খানে। 'We look before and after, and pine for what is no't। ভরা ভাদরে যখন মনে হয়, 'এমন দিনে তারে বলা যায়', তখন হৃদয়ের দ্বার অবারিত করে দেখি: 'শূন্য মন্দির মোর'।

এই জীবন তৃষ্ণার উদ্দেশ্যেই বিদ্যাপতির প্রণাম: নতুবা আদি অবসানা। চতুরানন জন্মায় এবং মরে, কত সৃষ্টি বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়: বেঁচে থাকে কেবল জীবনতৃষ্ণা। এই তৃষ্ণায় আকুল হয়ে গুহার অন্ধকারে একদিন চতুরঙ্গের দামিনী আছড়ে পড়েছিল শচীশের পায়ে। শচীশ তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। প্রত্যাখ্যাত দামিনী আকঁড়ে ধরেছিল শ্রীবিলাসকে। তারপর চলে যাবার দিনে, জ্বলে উঠেছিল এই বলে যে, 'জন্মান্তরে আবার যেন তোমাকে পাই।' কাকে পেতে চেয়েছিল দামিনী? শচীশ, না, শ্রীবিলাসকে? এর মধ্যে যে কাউকে পেলেই দামিনীকে ওই একই কথার পুনরাবৃত্তি করতে হত যে, 'সাধ মিটিল না।' এই সাধ মেটেনা বলেই, 'Our

sweetest Songs are those that tell of saddest thought'।

মৃত্যুর পাত্রে জীবনের অমৃতকে বহন করে, দামিনী তাই জানতে চেয়েছিল জন্মে জন্মান্তরে।

দশ

চতুরঙ্গ উপন্যাসে দামিনী অংশের পরিশিষ্টে শ্রীবিলাস বলেছে: 'আমার সঙ্গে দামিনীর বিবাহ হইয়াছে। এই বিবাহের রহস্য কী তা সকলে বুঝিবে না, বোঝার প্রয়োজনও নাই। আর দামিনী অংশের আগে শচীশের ডায়ারিতে লেখা হয়েছে অন্ধকারে কে চলিয়া গেল। একটা কী যেন শব্দ শুনিলাম। সে কি চাপা কান্না?'

এই দুটি অংশের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে চতুরঙ্গের দামিনী। শচীকে সে চেয়েছে, পায়নি; শ্রী বিলাসকে সে চায়নি, পেয়েছে। চতুরঙ্গের শেষে শ্রীবিলাসকে উদ্দেশ্য করে দামিনী যে বলেছে জন্মান্তরে আবার যেন তোমাকে পাই,—এই 'তুমি' আসলে 'আমি'। চতুরঙ্গের একেবারে শেষে এই করুণ বিপ্রলম্ভ উপন্যাসটিকে মুহূর্তের মধ্যে এমন সীমাহীন গভীরে নিয়ে গেছে যার পরে আর একটি কথাও অনাবশ্যক হতো। একটি মুহূর্তের রক্তিম স্তব্ধতা শেষ হয়েও শেষ হয়নি। পাঠকের মনে সেই চিরন্তন জিজ্ঞাসা জাগ্রত করেছে, কে তুমি'। এ জিজ্ঞাসা করা যায়; কিন্তু এর জবাব দেওয়া যায়না। চতুরঙ্গ রবীন্দ্রনাথের সুগম্ভীরতম স্বগতোক্তি; দামিনী চতুরঙ্গের এবং সমগ্র রবীন্দ্র গদ্যরচনার মধ্যে সবচেয়ে নিরুপম সবচেয় নিরুত্তর জীবন জিজ্ঞাসা।

গুহার অন্ধকারে শচীশের পায়ে পড়ে দামিনীর কান্না,—সে কী কেবল দেহের জন্যে জান্তব প্রার্থনা? না। শচীশই দেহের ওপরে উঠতে পারেনি; দামিনী সিঃসন্দেহে এমন কিছু চাইতে পেরেছিল শচীশ যার সন্ধান পায়নি। তুমি আমাকে এমন কিছু মন্ত্র দাও যা এ সমস্তের চেয়ে অনেক উপরের জিনিস—যাহাতে আমি বাঁচিয়া যাইতে পারি। আমার দেবতাকেও তুমি আমার সঙ্গে মজাইও না।' দামিনীর এই প্রার্থনার উত্তরে শচীশ বলেছিল: 'তাই হইবে'। এবং তার পরেও দামিনীর আর্তনাদ: আমাকে সকল অপরাধ হইতে বাঁচাও, বাঁচাও বাঁচাও!'

এ অপরাধ কি, কার কছে এই অপরাধ? শ্রীবিলাসের সঙ্গে দামিনীর বিবাহের পূর্বাহ্ণের শচীশকে দামিনী বলছে: 'তোমার কাছে অপরাধ করি নাই...।' শচীশ তার উত্তরে যা বলেছে তা হচ্ছে এই: 'যাঁকে আমি খুঁজিতেছি তাঁকে আমার বড়ো দরকার—আর কিছুতেই আমার দরকার নাই। দামিনী, তুমি আমাকে দয়া করো, তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাও।'

দামিনীর 'অপরাধ' কি, শচীশের অন্বেষণে কাকে এবং কাকে সে ত্যাগ করতে চাইছে—চতুরঙ্গে এই জিজ্ঞাসাই চারটি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে অন্বেষিত। জেঠামশাই এবং শ্রীবিলাস হচ্ছে পার্শ্ব চরিত্র; মুখ্য ভূমিকায় অবশ্যই শচীশ এবং দামিনী। এবং শচীশ ও দামিনী দুজনে আসলে এক। জীবনে জিজ্ঞাসার উত্তর অন্বেষণে তারা একাকার। একই অঙ্গে দুটি আকর্ষণের দ্বন্দ্বে ক্ষত বিক্ষত মানুষের অশ্রুসিক্ত রক্তাক্ত মনোলিপি,—এই চতুরঙ্গ। শচীশ ও দামিনীর লড়াই দেশ কাল নিরপেক্ষ সকল মানুষের যন্ত্রণা। এই যন্ত্রণার নামই জীবন। চতুরঙ্গ মানব জীবনের দুর্ভেদ্যতম দুর্গে প্রবেশের প্রয়াস। সেই প্রয়াসে চতুরঙ্গের লেখক কতদূর সফল হয়েছেন সেই বিচারের

চেয়েও অনেক বড় কথা হচ্ছে এই যে, লক্ষ্যে পৌঁছনই একমাত্র কথা নয়, পৌঁছবার পথটার দামও কম নয়। নিরুপম নগ্ন মনের মুখোমুখি পৌঁছে দেবার দুঃসাহসে দীপ্ত এই উপন্যাস সবচেয়ে রক্তাক্ত, অশ্রুসিক্ত, লবণাক্ত রবীন্দ্ররচনা।

দামিনীর অপরাধ, দুরন্ত দেহ বাসনা এবং শচীশের অন্বেষণ দেহাতীত অনির্বাচনের, চতুরঙ্গের এই অতি সরলীকরণ কোনো সমস্যার সমাধান নয়। প্রথমেই শচীশের অন্বেষণের কথা বলি। জেঠামশায় শচীশের প্রথম গুরু। সেই গুরুর হার হয়েছে পাপিষ্ঠা ননিবালার কাছে। জেঠামশায়ের মৃত্যুর পর: 'সেই অসহ্য যন্ত্রণার দায়ে শচীশ কেবলই বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছিল যে, শূন্য এত শূন্য কখনোই হইতে পারেনা; সত্য নাই এমন ভয়ঙ্কর ফাঁকা কোথাও নাই; এক ভাবে যাহা 'না' আর-এক ভাবে তাহা যদি 'হাঁ' না হয় তবে সেই ছিদ্র দিয়া সমস্ত জগৎ যে গলিয়া ফুরাইয়া যাইবে।' মারা যাবার আগে শচীশকে জেঠামশায় বললেন, 'কোনো খেদ রহিল না।' কিন্তু শচীশ সে কথা বলতে পারল কই? যে সন্ন্যাসীকে দেখে একবার জেঠামশাই বলেছিলেন: সংসার মানুষকে পোদ্দারের মতো বাজাইয়া লয়, শোকের ঘা, ক্ষতির ঘা, মুক্তির লোভের ঘা দিয়া। যাদের সুর দুর্বল, পোদ্দার তাহাদিগকে টান মারিয়া ফেলিয়া দেয়; এই বৈরাগীগুলো সেই ফেলিয়া দেওয়া মেকি টাকা, জীবনের কারবারে অচল। অথচ এরা ডাক করিয়া বেড়ায় যে এরাই সংসার ত্যাগ করিয়াছে। যার কিছুমাত্র যোগ্যতা আছে সংসার হইতে তার কোনোমতে ফস্‌কাইবার জো নাই। শুকনো পাতা গাছ হইতে সরিয়া পড়ে, গাছ তাকে ঝরাইয়া ফেলে বলিয়াই—সে যে আবর্জনা।' —,—সেই সন্ন্যাসীর দলেই শেষ পর্যন্ত শচীশ গিয়ে ভিড়ল।

শ্রীবিলাস শচীশের সম্পর্কে কনফেস করেছে যে শচীশের নাস্তিক হওয়া সে বুঝতে পারেনি ; জেঠামশায়ের মৃত্যুর পর লীলানন্দ স্বামীর কাছে ভেড়াও শ্রীবিলাস বুঝতে পারল না। বুঝতে পারবার কথাও নয় তার। ডাবের ওপরটা শক্ত, ভেতরে তৃষ্ণা মেটানোর জল থাকা সত্ত্বেও, এ অঘটন কমলালেবুর পক্ষে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব।

এগারো

অনল ভরা দুরন্ত বাসনা যে বৃথা, দামিনী তা যেমন করে জীবন দিয়ে জেনেছিল এবং শেষ পর্যন্ত তাকে অস্বীকার করতে পারেনি, শেষ পর্যন্ত যেমন ভাবে ছটফট করেছিল জীবন তৃষ্ণায়, রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনায় তার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত কই? রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অস্বাভাবিক এমন প্যাশানেট চরিত্র বাংলা সাহিত্যে এখনও পর্যন্ত অনুপস্থিত। শচীশ এর হাত থেকে পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছে ; শ্রীবিলাস একে বোঝেইনি। নামে চতুরঙ্গ হলেও আসলে এ উপন্যাস এক দুর্নিবার জীবন তৃষ্ণার পরিণতিহীন ভয়ঙ্কর ইঙ্গিত। এ উপন্যাস, ফরাসী ভাষায় লেখা হলে সাহিত্যে স্যুর-রিয়ালিসমের জন্ম হত। সাহিত্যে রিয়ালিসম হয়েছে ; স্যুর-রিয়ালিসমের কথা সাহিত্যে যে অসংলগ্ন চেষ্টা এখন চলছে রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গে তার প্রথম আভাস ছিল।

শচীশ ডায়ারিতে লিখছে : "ননিবালার মধ্যে আমি নারীর এক বিশ্বরূপ দেখিয়াছি—অপবিত্রের কলঙ্ক যে নারী আপনাতে গ্রহণ করিয়াছে, পাপিষ্ঠের জন্য যে নারী জীবন দিয়া ফেলিল, যে নারী মরিয়া জীবনের সুধাপাত্র পূর্ণতর করিল। দামিনীর মধ্যে নারীর

আর-এক বিশ্বরূপ দেখিয়াছি ; সে নারী মৃত্যুর কেহ নয় ; সে জীবন রসের রসিক। বসন্তের পুষ্পবনের মতো লাবণ্যে গন্ধে হিল্লোলে সে কেবলই ভরপুর হইয়া উঠিতেছে ; সে কিছুই ফেলিতে চায়না, সে সন্ন্যাসীকে ঘরে স্থান দিতে নারাজ ; সে উত্তরে হাওয়াকে সিকি পয়সা খাজনা দিবে না পণ করিয়া বসিয়া আছে।”

চতুরঙ্গের একমাত্র বক্তব্য দামিনী ; দামিনী হচ্ছে জীবন তৃষ্ণার অগ্নিময়ী চেহারা। এই জীবন তৃষ্ণা কেউ মেটাতে চায় রূপ সম্ভোগের মধ্যে দিয়ে, কেউ এর উত্তর খোঁজে অপরূপের মধ্যে। দামিনী ডুবে ছিল রূপের মধ্যে। নবীনের স্ত্রী তার স্বামীর সঙ্গে নিজের বোনের বিবাহ দেবার পর বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করল। গুরুজী তার পরেও কীর্তনে যোগ দিয়ে নাচতে লাগলেন। দামিনী শচীশকে বলল : ‘আগুন দিয়া আগুন নেবানো যায়না’। এবং শচীশ সম্পর্কে শ্রীবিলাসের মন্তব্য : ‘জপে তপে অর্চনায় আলোচনায় বাহিরের দিকে শচীশের কামাই নাই, কিন্তু চোখ দেখিলে বোঝা যায় ভিতরে ভিতরে তাহার পা টলিতেছে।’

জীবনে যে তৃষ্ণায় সবচেয়ে প্রবল তা থেকে পালিয়ে গিয়ে কেউ বাঁচেনা,—চতুরঙ্গে সে কথাটা বোঝাবার চেষ্টা করেছে শ্রীবিলাস। শচীশ শ্রীবিলাসকে বলেছে ; ‘যে তৃষ্ণার চশমায় ওই রূপকে তুমি বিশ্বের সমস্তের চেয়ে বড় করিয়া দেখিতেছ সময় গেলেই সেই তৃষ্ণাকে সুদ্ধ একেবারে লোপ করিয়া দিবে।’ সেই শচীশই দামিনীকে বলল তাদের সঙ্গে যোগ দিতে। দামিনী তার উত্তরে একটি কথা দুবার ব্যবহার করেছে,—‘আমি কোনো অপরাধ করিব না’।

দামিনীর, শুধু দামিনীর কেন, রক্ত-মাংসের মানুষ মাত্রেরই, সে অপরাধটা কী ?

এই অপরাধ কি, সে কথা বলেছে শচীশ, দামিনীকে : ‘থাকো,

আমার রূপ লইয়া তুমি থাকো, আমি তোমার অরূপের মধ্যে ডুব মারিলাম।'

কিন্তু তার পরেও দামিনীর রূপ তৃষ্ণার কাছে শচীশের অপরূপ বিতৃষ্ণা হার মেনেছে। দামিনীকে সে দয়া করে ত্যাগ করতে বলেছে। এবং শচীশকে ত্যাগ করে দামিনী বুঝিয়ে দিয়ে গেছে যে, শচীশের ত্যাগের মহিমা দামিনীর আঁকড়ে ধরতে চাওয়ার তৃষ্ণার তুলনায় কত নির্জীব। এবং আরও, 'তোমার কাছে অপরাধ করি নাই, কেন তবে আমাকে এমন করিয়া শাস্তি দিতেছ?',—দামিনীর এই জিজ্ঞাসার উত্তরে শচীশ, 'চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল!'

এই জিজ্ঞাসা শুধু দামিনীর নয়। সকল দেশের সকল কালের মানুষের জীবন জিজ্ঞাসা এই। এবং এর উত্তরে জীবন দেবতা চির নিরুত্তর।

শচীশ দামিনীকে শাস্তি দেয়নি। শাস্তি দিয়েছে নিজেকে। উপন্যাসের শেষে দামিনী বলেছে তার তৃষ্ণা মেটেনি। শচীশ একবারও বলতে পারেনি যে যাঁকে আমি খুঁজছি, তাঁকে আমি পেয়েছি। তার বদলে বলেছে, 'আর কিছুতেই আমার দরকার নাই।' দামিনী শ্রীবিলাসের কাছে স্বীকার করেছে, সুন্দরকে মারিতে গিয়াছিল তাই অসুন্দরটা বুকে লাথি খাইয়াছে।'

এবং তার আগেই দামিনীর মুখে শচীশ সম্পর্কে একটি মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। শ্রীবিলাসকে দামিনী বলছেঃ "তিনি আমাকে কি বাঁচান বাঁচাইয়াছেন তুমি তার কী জান? তুমি কেবল আমারই দুঃখের দিকে তাকাও, আমাকে বাঁচাইতে গিয়া তিনি যে দুঃখটা পাইয়াছেন সে দিকে বুঝি তোমার দৃষ্টি নাই?' অর্থাৎ শচীশের রূপের মধ্যে ডুবে দামিনীর যে দুঃখ, দামিনীকে ত্যাগ করে শচীশের দুঃখ তার চেয়ে কম নয়। মরবার সময় দামিনী বলেছে,

'সাধ মিটিল না ; শচীশ কি মৃত্যুর সময় বলতে পারত, যে, 'তার সাধ মিটেছে'। বোধ হয় না।

বার

চতুরঙ্গ উপন্যাস কি না এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মনে দ্বিধা ছিল। চতুরঙ্গ শুরু করবার আগে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন ঃ এই বইখানির নাম চতুরঙ্গ! উপন্যাসখানি না বলে, বইখানি বলা ইচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছাকৃত সুনিশ্চিত বলা অসম্ভব। চতুরঙ্গর চরিত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ আগে থেকে কোনো মনগড়া শিরোনামা দিতে চাননি। এ বইকে কেউ উপন্যাস বলবে অথবা বলবে না তা নিয়ে লেখকের মাথা ব্যথা অল্পই অথবা একেবারেই নেই। কিন্তু আমরা চতুরঙ্গকে কি আখ্যা দেব? আমরা বলব যে কাম্যুর দ্য আউট সাইডার যদি উপন্যাস হয়, হেমিংওয়ের ওল্ডম্যান এ্যাণ্ড দ্যসি যদি উপন্যাস হয় তাহলে চতুরঙ্গ 'বইখানি' নয় ; নিঃসংশয়ে উপন্যাস।

মহাকাব্যর সংগে আমি মহৎ উপন্যাসের তুলনা করেছি। চতুরঙ্গ চরিত্রে মহাকাব্য নয়, কিন্তু কাম্যুর দ্য আউট সাইডার এবং হেমিংওয়ের ওল্ডম্যান এ্যাণ্ড দ্য সি, এ দুটির একটিও মহাকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত নয়। তবু এ দুটিকে উপন্যাসই বলা হয়েছে; রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গকেও উপন্যাস বলতে বাধা নেই। আসলে উপন্যাসের সংজ্ঞাও পাল্টাচ্ছে। লক্ষণ মিলিয়ে আজকের বিশ্বসাহিত্যের উপন্যাস হিসেবে যার উপস্থিতি অনিবার্য তাকেও উপন্যাস বলে চেনা শক্ত। তলস্তয়ের ওয়ার এ্যাণ্ড পিস আর হেমিংওয়ের ওল্ডম্যান এ্যাণ্ড দ্য সি চরিত্রে আলাদা। তবুও দুটিকেই উপন্যাস বলে স্বাকার করতে পণ্ডিতের মূঢ়তায় বাধা আছে ; কিন্তু রসিকের সহৃদয় হৃদয়তায় বাধা নেই।

রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গ, দ্য আউট সাইডার এবং ওল্ডম্যান এ্যাণ্ড দ্য সি-র বহু পূর্বপুরুষ। এ উপন্যাস ইংরিজিতে লেখা হলে রবীন্দ্রনাথ ঔপন্যাসিক হিসেবেও বিশ্ব বন্দিত হতেন। চারটি মাত্র চরিত্রকে ঘিরে মানব মনের গভীর অরণ্যের গম্ভীর অন্ধকারে এই দুঃসাহসিক পদচারণা কখনও ক্রুরতায় ভয়ঙ্কর, বাসনায় বিসর্পিল, যন্ত্রণায় মূক, সারল্যে অবিশ্বাস্য। দামিনীর সাধ আর শচীশের সাধনা, জ্যাঠা-মশায়ের বুদ্ধি আর ননিবালার বিবেক, সর্বোপরি শ্রীবিলাসের সীমাহীন সারল্য চতুরঙ্গকে করেছে মানব জীবনের সেই আশ্চর্য মণিহার, যাকে পরতে গেলে লাগে, ছিঁড়তে গেলে বাজে।

এ উপন্যাসের ফার্স্ট পার্সন সিঙ্গুলার হচ্ছে শ্রীবিলাস। পাঠকের মনে তারই জন্যে সবচেয়ে বেশি বেদনার মেঘ জমে। শচীশের মতো মুক্তির সন্ধানে দামিনীকে সে পায়ে ঠেলতে পারেনি। দামিনীকে সে দিয়েছে সব, পায়নি কিছুই। সে বলেছে: 'আমি সন্ন্যাসী নই, তাই আমি বেশ করিয়া জানি দামিনী পদ্মের পাতায় শিশিরের ফোঁটা নয়। এই দামিনী তাকে বঞ্চিত করেছে, শচীশ করেছে অবহেলা। কিন্তু তবুও শ্রীবিলাস হার মানেনি। বঞ্চনার অবহেলার ধুলোয় ঢাকা জীবনের গলায় সে পরিয়ে দিয়েছে আর সহজে আনন্দে অম্লান বরমাল্য খানি: কলিকাতার এই শহরটাই যে বৃন্দাবন, আর সেই খাটুনিটাই যে বাঁশির তান, এ কথাটাকে ঠিক সুরে বলতে পারি এমন কবিত্বশক্তি আমার নাই। কিন্তু দিনগুলি যে গেল সে হাঁটিয়াও নয়, ছুটিয়াও নয়, একেবারে নাচিয়া চলিয়া গেল।'

জ্যাঠামশায়-শচীশ-দামিনী ও শ্রীবিলাস কেবল চতুরঙ্গের চার অংশ নয়; একটি মানুষেরই চারটি অস্তিত্ব। একজন তর্ক করে হ্যাঁ-কে না করতে চায়, আরেকজন কখনও না কখনও হ্যাঁ-য়ের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করে হাঁফায়, তৃতীয় একজনের সাধ মেটেনা কিছুতেই;

তারও পরে আরেকজন থাকে যার সব দেওয়ার গভীর আনন্দ, কিছুই না পাওয়ার সুগভীর বেদনাকে এমন দুর্মূল্য একটি দীপ্তি দেয় যাতে সকলের শেষে এসে দাঁড়িয়েও সকলকে ফেলে রেখে সে এগিয়ে যায়।

চতুরঙ্গের আরেক নামই চিরকালের জীবনরঙ্গ।

চতুরঙ্গের পর রবীন্দ্রনাথ আরও একবার, আর একবারই মহৎ উপন্যাস রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। মাসিক বিচিত্রায় ধারাবাহিক আত্মপ্রকাশের সময় সে উপন্যাসের প্রথমে নাম ছিল,—'তিন পুরুষ' ; পরে তার পাকা নাম করা হয় যোগাযোগ।' যোগাযোগ রবীন্দ্রনাথের মধুরতম বিষণ্ণ রচনা। মল্লবীরের গলায় ম্লান রজনীগন্ধার মালা,—যোগাযোগ রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গদ্যকাব্য। বইয়ের শেষ পরিচ্ছেদে বিপ্রদাস কুমুকে বলছে : 'নে যন্ত্রটা, আমরা দুজনে মিলে বাজাই।' এরপর যোগাযোগের কবি লিখছেন :

'তখনও অল্প অল্প অন্ধকার, সমস্ত রাত্রির পরে বাতাস একটু ঠাণ্ডা হয়ে অশথ পাতার মধ্যে ঝির্ ঝির্ করছে, কাকগুলো ডাকতে শুরু করেছে। দুজনে ভৈরোঁ রাগিনীতে আলাপ শুরু করলে, গম্ভীর শান্ত সকরুণ ; সতীবিরহ যখন অচঞ্চল হয়ে এসেছে, মহাদেবের সেইদিনকার প্রভাতের ধ্যানের মতো। বাজাতে বাজাতে পুষ্পিত কৃষ্ণচূড়ার ডালের ভিতর দিয়ে অরুণ-আভা উজ্জলতর হয়ে উঠল, সূর্য দেখা দিল বাগানের পাঁচিলের উপরে।'

মানুষের প্রয়োজনের ভাষা হচ্ছে গদ্য ; সেই গদ্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত আনন্দ-বেদনার এমন কাব্য আর কোন দেশে কোনকালে কারুর কলমে কখনও উচ্চারিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই ; এবং সম্ভবত আর যে কারুরই তা অজানা।

তের

মাসিক বিচিত্রায় তিন পুরুষ নাম ঘুচিয়ে যোগাযোগ রাখবার সময় রবীন্দ্রনাথ একটি কৈফিয়ৎ দিয়েছিলেন। তাতে তিনি একটি মূল্যবান কথা বলেছেন, 'রসশাস্ত্রে মূর্তিটি মাটির চেয়ে বেশি, গল্পটিও বিষয়ের চেয়ে বড়।' রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে আমরা যাকে গল্প বলি তা কোথায়।' তাঁর সব উপন্যাসেই গল্পের চেয়ে বিষয় বড়; বিষয়ের চেয়ে বিষয়ী। রবীন্দ্রনাথ মূলত গীতি কবি; এবং গীতি কবি মাত্রেই সাবজেক্টিভ। তার প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ কোথাও অবজেকটিভ নন। গল্পের বিষয়, বিষয়ের চেয়ে যিনি সেই বিষয়ে লিখছেন তাঁর মনের আলোক ও অন্ধকারের আলিম্পনে অনেক বেশি চোখে পড়ায়। যোগাযোগ তার ব্যতিক্রম নয়।

একটি কথা আরেকবার বলে নেওয়া দরকার। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসেও ঘটনা আছে; দুর্ঘটনাও। কিন্তু তা অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে উৎসারিত। এই জন্যে আমরা বলি যে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে গল্প কম; কিন্তু আসলে ব্যাপারটা তার উল্টো। বাইরের স্থূল ঘটনা নিয়ে হুলুস্থুল ঘটান রবীন্দ্রনাথ কোনকালে সে জাতের লেখক নন। রবীন্দ্ররচনা মাত্রই যা গভীর যা সূক্ষ্ম যা অনির্বচনীয় যা অপরূপ যা অগোচর যা অদৃশ্য যা অব্যক্ত যা দুর্নিরীক্ষ্য যা অনাদি ও অনন্ত-কালের যা নিগূঢ় নিস্তব্ধ নিঃসঙ্গ নিরুপম যা মন্ত্রের মতো ধ্যানের মতো নিরুচ্চার স্তবের মতো যা দুঃসহ দুর্বহ দুরধিগম্য যা অনায়ত্ত অস্পর্শ অধরা অচঞ্চল অনাস্বাদিত অভাবিত অপ্রত্যাশিত তারই আবরণ উন্মোচনের উল্লাসে উন্মাদনায় উত্তেজনায় উদ্দীপনায় অন্বেষণে

উত্তরণে বিচিত্রগামী। একই জন্মে জন্ম জন্মান্তরের অভিজ্ঞতারই আশ্চর্য নাম,—রবীন্দ্রনাথ।

যোগাযোগ তাঁর সবচেয়ে গভীরতম বিধুরতম মধুরতম তমো থেকে মহত্তমে যাত্রার জটিলতম ইতিহাস। তিন জনের, আসলে তিন পুরুষের ধারাপাত। সে তিন পুরুষ আনন্দ, মধুসূদন এবং অবিনাশ ঘোষালের নয়। আসলে তা দুটি পুরুষের এবং রমণীরও নয়। আসলে তা একটি অন্তর্বিপ্লবের গদ্যকাব্য। অনুচ্চার, অনালোকিত, অস্ফুট অনস্তিত্বের অপরিচয়ের পালার অন্ত থেকে আদিতে প্রত্যাবর্তন। ওরা যাকে চলচ্চিত্রের ভাষায় বলে, ফ্ল্যাশব্যাক।

বররুচি যাদের কাছে রস নিবেদনের দুর্ভাগ্য থেকে বঞ্চিত হতে চেয়েছেন তারা যোগাযোগকে ঘোষালদের তিনপুরুষের কাহিনী বলে মেনে নিয়েছে। যোগাযোগ তাদের জন্যে লেখা নয়। রূপের সঙ্গে অরূপের দ্বন্দ্বে উভয় মানুষের নির্মম ট্রাজিডি নির্মোক উন্মোচিত করাই এই উপন্যাসের উপজীব্য। মধুসূদন এবং কুমুদ জীবনযুদ্ধে দুজনেরই হার হয়েছে; মধুসূদন যাকে চেয়ে পায়নি, কুমু তাকে পেয়েও চায়নি। কিন্তু কুমুকে শেষ পর্যন্ত মধুসূদনের কাছেই ফিরে আসতে হয়েছে। এই ফিরে আসাটা যে অবিনাশ ঘোষালের জন্মের কারণে সেই নবজাতক, কুমু এবং মধুসূদনের থিসিস এবং এ্যান্টি থিসিসের সংঘাত-জাত সিনথিসিস কিনা সে সংশয় নিয়ে যারা মাথা ঘামিয়েছেন, তারা রবীন্দ্রনাথকে এই জিজ্ঞাসার জবাব না দেবার জন্যে রেহাই দেননি। রবীন্দ্রনাথ এবং যোগাযোগ, আমরা আগেই বলেছি, চরিত্রে উপন্যাস নয় গদ্যকাব্য। এবং কাব্য মাত্রই বৈয়াকরণের বোঝবার বস্তু নয়; এ বস্তু আসলে সহৃদয় হৃদয়-সংবাদীর বুকে বাজবার।

মধু এবং কুমুর মনের যে লড়াই তা নিরবধিকাল জুড়ে বিপুলা পৃথ্বী জুড়ে সকল মানুষের। একই মানুষের মধ্যে দুটি সত্ত্বার সংগ্রাম

যা স্থূল তার নাম মধুসূদন, যা সূক্ষ্ম তার নাম কুমু। যা বাসনা তা মধুসূদন, যা সোনা তা কুমু। মধুসূদনের চেয়ে কুমু ভাল কিম্বা কুমুর চেয়ে মধুসূদন মন্দ, যোগাযোগ পড়বার পর এ উক্তি নেহাতই শিশু সুলভ। কারণ ভাল মন্দ বিচারের ভার ঔপন্যাসিকের নয়। তার কাজ হচ্ছে এইটুকু দেখিয়ে দেওয়া যে স্থূল ও সূক্ষ্মের, বাসনা ও সোনার, রূপ ও অপরূপের দ্বন্দ্বেই মানুষ রক্তাক্ত রিক্ত ক্ষত-বিক্ষত। জীবনের মর্মমূলে এই ট্রাজিডির বীজ নিহিত। এর হাত থেকে কারুর নিস্তার নেই। এরই আরেক নাম জীবন যন্ত্রণা [The moment you are born as a man you are finished.]

যোগাযোগ উপন্যাসে মধুসূদনই কেবল কুমুর যোগ্য নয়, একথা অর্ধ সত্য ; কুমুও মধুসূদনের অযোগ্য। কিম্বা এহ বাহ্য। যোগ্যতা-অযোগ্যতার বিচার বৈয়াকরণের অনধিকারচর্চামাত্র। রসিকের কাছে, যোগাযোগ উপন্যাসে মধুসূদন এবং কুমু, দুজনেই অনিবার্য। রাম রাবণের, সুরাসুরের, শুভাশুভের দ্বন্দ্বে মুখবিত মহাকালের যে চাকা পতন ও অভ্যুদয়ের বিচিত্র পথ দিয়ে চিরকাল ধাবিত, কুমু এবং মধুসূদনের মুখোমুখি সংগ্রামের মধ্যেও তারই বাণী বিধৃত ; তারই প্রতিচ্ছবি প্রতিবিম্বিত।

এ প্রতিধ্বনি জীবনে, তাই যোগাযোগ উপন্যাসের যথার্থ বিষয়। কিন্তু যেহেতু এ লেখা মূলত একজন কবির সেই হেতু যোগাযোগ রবীন্দ্রনাথের, সবচেয়ে রক্তিম সবচেয়ে রমণীয় গদ্যকাব্য। তাই যোগাযোগ শেষ হয়েও শেষ হয়না যেমন রজনীগন্ধা ঝরে গিয়েও অনিঃশেষ।

চোদ্দ

পুরুষের যে শক্তি মাটির অন্ধকার নীচে যক্ষের রত্নপুরী থেকে কুবেরের ঐশ্বর্যকে লুট করে আনে সে ভেবে পায়না কেন ধরিত্রীর নন্দিনী সীতা তার অশোক বনে আনন্দ স্বরূপিনী হয়ে ওঠে না। সেই দুর্দান্ত অবুঝকে কিছুতেই বোঝানো যায়না যে লৌহ পিঞ্জরে শার্দুল পোষ মানে কিন্তু সোনার খাঁচায় প্রজাপতি কিছুতেই পড়েনা ধরা। যোগাযোগের অতি নায়ক মধুসূদন ঘোষাল যে শক্তিতে ব্যবসায়ী বুদ্ধির তুরঙ্গের পৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে সাফল্যের তুঙ্গে উঠেছিলেন সেই বাসনার তরীতে অর্থ ও সামর্থের ফেনায় ফেনায় শাদা হয়ে যাওয়া রক্তশূন্য জীবন তরঙ্গে টলমল মূলহারা যে ফুল কুলহারা যে কুমুদিনী তার কাছে পৌঁছনো যায় না, এ বার্তা অজ্ঞাত রয়ে গেল তাঁর।

শ্যামা বাসনার তরী। কুমুদিনী, নিরুদ্দেশ যাত্রা। মধুসূদন, নিরুদ্দেশ যাত্রায় ব্যর্থ হয়ে বাসনার তরীতে আশ্রয় পেয়েছিলেন কিন্তু মুক্তি পাননি। কুমুদিনী ছিল মধুসূদনের প্রার্থনা ; শ্যামা ছিল মধুসূদনের প্রাপ্য। প্রার্থনার উত্তর কোনদেশে কোনকালে প্রাপ্যের মধ্যে মেলেনা। এই জন্যেই :

'We look before and after,and pine for what is not.

And Our sweetest songs are those that tell of saddest thought.

কুমুদিনীর চেয়ে মধুসূদন অনেক অনেক বেশি করুণার পাত্র।

কুমুদিনীর মনের মধ্যে যে সুধার নির্ঝর ছিল সমগ্র বসুধায়

এমন শক্তি ছিল না যা তাকে শুষ্ক করতে পারে। মধুসূদন তাকে আঘাত করেছিল কিন্তু হার মানাতে পারেনি। এমন কি শ্যামার দেহ-নিমন্ত্রণে মধুসূদন নিজেই নিমজ্জিত হয়েছে কিন্তু কুমুর সৌরভ অবিচ্ছিন্ন বয়ে গেছে পঙ্কিল শ্বাসরুদ্ধকর আবহাওয়ার উপর দিয়ে। মধুসূদনের সমস্ত শক্তির ওপারে শ্যামার স্থূলতার অন্তহীন ওপরে কুমুর জীবনে যে অনির্বাণ আকাশ-প্রদীপের আলো জীবন দেবতা নিজের হাতে জ্বেলে দিয়েছিলেন তা কখনও কখনও হেলেছে দুলেছে কিন্তু তা একবারও কালো হয়নি। মধুসূদনের গৃহ থেকে যখন নিজের ঘরে প্রত্যাবর্তন করেছে কুমুদিনী তখন তা হার মেনে নয়। নারীত্বের প্রতি পুরুষের শ্রদ্ধার পরিবর্তে পঙ্কলেপনের প্রতিকারহীন সাক্ষী হয়ে সে থাকতে চায়নি। শ্যামা তার ঈর্ষার যোগ্য ছিল না। কারণ শ্যামা বাসনার তরী ; কুমুদ সোনার স্বপ্ন।

শ্যামার মধ্যে দিয়ে নারীত্বের যে অবমাননাকর পতিতাবৃত্তি প্রকাশিত সেই নরকে দুঃসহ নিরুপায় কুমু তার নিরুপম প্রতিবাদ জানিয়েছিল নিজের ঘরে নিঃশব্দ প্রস্থানের মধ্যে দিয়ে। বিপ্রদাসের ফুটো নৌকোর অর্থ প্রত্যর্পণের তাগিদের এক ঝাপটায় মধুসূদনের চোরাবালিতে অতল নিমজ্জিত হবার নিমন্ত্রণ ভয় দেখাতে পারেনি, বিপ্রদাস কিম্বা কুমু কাউকেই। কুমুদিনী ভেবেছে দাদার কথা, কিন্তু বিপ্রদাস কারুর কথা ভাবেনি। সে বলেছে :

'অনিষ্ট অশান্তি কাকে তুই বলিস কুমু ? তুই যদি অসম্মানের মধ্যে ডুবে থাকিস তার চেয়ে অনিষ্ট আমার আর কী হতে পারে ? ...আজ যেখানে তোর স্বাতন্ত্র্যকে কেউ বুঝবে না, সম্মান করবে না, সেখানে যে তোর নরক। আমি কোন্ প্রাণে তোকে সেখানে নির্বাসিত করে থাকব ?'

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কুমু স্থির থাকতে পারেনি। সন্তান সম্ভাবনা

যখন সত্য হয়ে দেখা দিল, তখন আবার সেই এক বিপ্রদাসই বলতে বাধ্য হল :

'তোকে নিষেধ করতে পারি এমন অধিকার আর আমার নেই। তোর সন্তানকে তোর নিজের ঘর ছাড়া করব কোন স্পর্ধায়?'

মধুসূদনের ঘরে স্বেচ্ছায় এসেছিল কুমুদিনী। কারুর কথা সে সেদিন শোনেনি। পদে পদে অশুভের ছায়া মুহূর্তের জন্যে তাকে দ্বিধান্বিত করেনি। চিরন্তন ভারতীয় নারীত্বের প্রতীক কুমুদিনী মধুসূদন ছাড়া আর কাউকেই পতিত্বে বরণ করবেনা বলেছিল। স্বামীগৃহ পরিত্যাগের মধ্যে দিয়ে যে কথা সে বলতে চেয়েছিল সন্তান সম্ভাবনার মধ্যে দিয়ে সে কথা অনুচ্চারিত রয়ে গেল। জয়-পরাজয় এ দুই-ই মূল্যহীন একথা জানতেন যে যুধিষ্ঠির, তিনিও শেষ পর্যন্ত স্থির থাকতে পারেন নি। আত্মীয় হননে আত্মার অবিনশ্বর রাণী বিস্মৃত হতে বাধ্য হয়েছিলেন যুধিষ্ঠির। যোগাযোগের কুমুদিনী সেই অসাধারণ নারী মধুসূদন যার নাগাল পায়নি কিন্তু অবিনাশ ঘোষাল যাকে ফিরিয়ে এনেছে জীবন রঙ্গভূমে, ঋণমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত নির্বান্ধব যক্ষপুরীতে। গর্ভের অন্ধকারে যে আলোকের ক্রন্দনে অহরহ রণিত হচ্ছিল কুমুর স্বামীগৃহে প্রত্যাবর্তন সেই বন্দীর বন্দনায় শকুন্তলার দুষ্মন্ত সমীপে পৌঁছবার প্রয়োজনে তপোবন ত্যাগের সেই মৃত্যুহীন চেয়েও আনন্দে উজ্জ্বল, ব্যথায় রক্তিম।

পনের

যে রবীন্দ্রনাথ কয়েক পাতার মধ্যে চতুরঙ্গের মতো বিপুল বক্তব্যকে উপস্থিত করবার অনবদ্য অধিকারী তিনিই যখন তিনপুরুষে নির্মম নিঃসঙ্গতার আবরণ উন্মোচিত করতে বসেন তখন কেন কয়েক শো পাতাতেও কুলোয় না, এ আমার নিরুত্তর রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা। যোগাযোগের রবীন্দ্রনাথ বড় বেশি বাক্যবাহুল। মধুসূদনের এবং কুমুর পূর্ব পুরুষের অপূর্ব বৃত্তান্ত অনেকটাই এ কাহিনীর পক্ষে অনধিকার চর্চা। মধুসূদন ঘোষাল কি করে এমন নিরতিশয় নির্মম হলো তার ইতিবৃত্ত রবীন্দ্রনাথ একটা প্যারাগ্রাফে বলে দিতে পারতেন। চতুরঙ্গে তার প্রমাণ আছে। যেমন,

"আর লিখিতে ইচ্ছা হয় না—লেখাও কঠিন।"

দামিনী সম্পর্কে এই একটি না বলা বাণীতে সব বলে দেবার যাদু যাঁর হাতের মুঠোয় তিনিই যখন যোগাযোগের সুরুতে বলেন: "গল্পটার এইখানে আরম্ভ। কিন্তু আরম্ভের পূর্বেও আরম্ভ আছে। সন্ধ্যাবেলায় দীপ জালাবার আগে সকালবেলায় সলতে পাকানো।" —এবং সত্যি সত্যি সেই সলতে পাকাতে গিয়ে সকালবেলা যখন সায়াহ্নে গড়িয়ে যায় তখন মধু এবং কুমুর সংঘর্ষের যে দীপালী জ্বলে ওঠে দুটি জীবনের একটি আকাশ জুড়ে তার প্রস্তাবনা বড় বেশি বিলম্বিত লয়ে রসের ব্যাঘাত ঘটায়। কুমুর সঙ্গে মধুসূদনের বিবাহ প্রস্তুতির বর্ণনাও অতিরিক্ত বহুল।

মধুসূদনের সঙ্গে কুমুর মনান্তরের স্তর পরিক্রমা পরম আশ্চর্য গদ্যকাব্য। সবচেয়ে উজ্জ্বল উদাহরণ: "গভীর রাত্রে প্রথম ঘুম

থেকে জেগে মানুষ আপনার সমস্ত শক্তিকে সম্পূর্ণ পায়না। তাই তার দিনের চরিত্রের সঙ্গে রাতের চরিত্রের অনেকটা প্রভেদ। এই রাত্রি ছুটোর সময় চারিদিকে লোকের দৃষ্টি বলে যখন কিছুই নেই, সে যখন বিশ্ব সংসারে একমাত্র নিজের কাছে ছাড়া আর কারও কাছেই দায়ী নয়, তখন কুমুর কাছে মনে মনে হার-মানা তার পক্ষে অসম্ভব হল না।

এই রাত্রির কাব্য, এই কাব্যের রাত্রি কুমু ও মধুসূদনের অভিসার-ভঙ্গে অনির্বচনীয় ভূমিকা।

যোগাযোগ উপন্যাস যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে ওর শেষ হয়নি। তাই গদ্যে লেখা হলেও এ উপন্যাস কাব্য। এ কাব্য হৃদয়ের সঙ্গে বুদ্ধির নিবিড় অমিলে নিরুপম ট্রাজেডি। এ হার হৃদয়ের কাছে বুদ্ধির কিংবা বুদ্ধির কাছে হৃদয়ের হার নয়। বেদনার যে আনন্দ তাকে স্পর্শ করতে চেয়েছে এই কাব্যে, আনন্দের যে বেদনা,—সে। যোগাযোগের শেষ ক'টি লাইনে সেই অব্যক্ত আনন্দ-বেদনার ছবি অপরূপ উপস্থিত ঃ

"কালু তবু রইল বসে। দাদার ঘরে আজ কুমু নেই, এ শূন্যতা তার বুকে চেপে রইল। হঠাৎ শুনতে পেলে বিছানার নিচে টম কুকুরটা গুমরে গুমরে কেঁদে উঠল। কুমুকে সে চলে যেতে দেখেছে, কী একটা বুঝেছে, ভালো করে বোঝাতে পারছে না।"

যোগাযোগ উপন্যাস হলে বোঝানো যেত। যোগাযোগ কাব্য বলেই তা বোঝাবার নয়।

রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন প্রত্যেক বড় কাব্যেই একটা পূর্বমেঘ এবং একটা উত্তরমেঘ থাকতেই হবে। বড় কাব্য আমাদের কেবল পথে বা' করে দেয়না, পথের শেষে পৌঁছিয়েও দেয়। তা কেবল তরুণ বয়সের ফুল নয়। মহৎ উপন্যাসের ক্ষেত্রেও একথা সমান

সত্য। চতুরঙ্গ এবং যোগাযোগ, এই দুই উপন্যাসেই পূর্বমেঘ আছে কিন্তু উত্তরমেঘ নেই। চতুরঙ্গের দামিনীর উত্তর পুরুষ হচ্ছে ল্যাবরেটরীর সোহিনী। কিন্তু সেখানেও কি দামিনীর জীবন জিজ্ঞাসার জবাব অনুক্ত রয়ে গেলনা? যোগাযোগে কুমু এবং মধুসূদনের অন্তর্দ্বন্দ্বের উৎস থেকে উৎসাবিত ট্রাজিডির মীমাংসা কি, এ প্রশ্নের উত্তর অনুপস্থিত। গোরাতে শেষ পর্যন্ত দুটি নদীকে যে সিন্ধুতে এনে মিলিয়ে দিয়েছেন লেখক, তার দেখা তো পাওয়া গেছে, বাইরের থেকে ঘটানো একটি আকস্মিক সংবাদের সাহায্যেই ঘটেছে। তা অনিবার্য অপরিহার্য হয়নি। অর্থাৎ উপন্যাসের শেষে গোরার সংহার হয়েছে কিন্তু উপসংহার হয়নি। যদি গোরা না জানতে পারত তার জন্ম বৃত্তান্ত, তাহলে এ উপন্যাস যেখানে শেষ হয়েছে তাকি তার যোগ্য হত? আমি শুনেছি যে গোরার উপসংহার লেখকের মাথায় ছিল অন্যরকম। অনুরাগীদের উপরোধেই রবীন্দ্রনাথ নাকি এই উপসংহারের ঢেঁকি গেলেন। যোগাযোগ উপন্যাসের শেষেও কুমু এবং মধুসূদনকে মেলানো জোর করে। অবিনাশ ঘোষাল কুমুর গর্ভে না এলে কুমু ফিরত না। তাতে এ উপন্যাসের মহিমা বাড়ত; কমত না।

ষোল

রবীন্দ্ররচনা একটু রক্তশূন্য, কৃত্রিম, জীবনের সঙ্গে জীবন যুক্ত নয়। এই কারণে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস বিশ্ব-সাহিত্যের সূচীপত্রে উপস্থিত হবার মতো বিস্ময় হয়ে ওঠেনি কখনই। তলস্তয়, দস্তয়ভস্কি, বালজাক, প্রুস্ত, স্তাঁদাল, এঁদের লেখা জীবনের যে রক্তে ভেজা অভিজ্ঞতার অশ্রুতে সিক্ত হাসির রঙে রাঙা তার ঠিকানা রবীন্দ্রনাথ পাননি। যে রবীন্দ্রনাথ কবি তাঁর কথা বলছিনা। দস্তয়ভস্কির ইডিয়ট চারশো পাতায় তা বলতে পারেনি যা রবীন্দ্রনাথ চার পাতার একটি কবিতা শিশুতীর্থে বলেছেন। ধ্যানে কল্পনায় অনুমানে রবীন্দ্রনাথ যাকে ধরতে পেরেছেন পৃথিবীর আর কোনো কালে আর কোনো কবি তার সন্ধান পাননি। কিন্তু উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ সেই সুর লাগাতে পারেননি যা জীবনের অবিমিশ্র সুর; যা তার নিরুপম নির্জলা রূপ। জীবন দেবতার ধ্যানে নিমগ্ন ধূর্জটি রবীন্দ্রনাথ আদ্যন্ত জীবন বিমুখ।

গল্পগুচ্ছের রবীন্দ্রনাথ আমার বক্তব্যের ব্যতিক্রম নয়। ধানের শিষের ওপর শিশির বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুকে তিনি দেখেছেন কারণ তিনি গীতিকবি। কিন্তু জীবন সিন্ধু মন্থন করে যে অমৃত এবং বিষ মপাসাঁ, শেকভ, কিম্বা ও হেনরির গল্পে পাঠককে বিস্মিত বিমূঢ় বিহ্বল করে, কয়েক শো পাতার মধ্যে আকাশের থেকে অনেক বড়, সমুদ্রের থেকে অনেক অতল, অরণ্যের থেকে গভীরতর গহন যে মানব জীবনের একই জন্মে জন্মান্তরে ইতিবৃত্তে, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে তা পুরোপুরি অনুপস্থিত একথা আমি বলিনা। কিন্তু তার অনেকটাই বুদ্ধি গ্রাহ্য বিতর্কের বিষয়; জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নয় তা কখনও। রক্ত

মাংসের স্পর্শ, হৃদপিণ্ডের শব্দ, শীৎকার, বিপুল হতাশা, বিশাল উল্লাস, উলঙ্গ বুভুক্ষা, ক্ষুধা তৃষ্ণা, মৃত্যু ও জীবনের রক্ত-পুঁজ-গলিত চিত্র নয়। একটু বিগলিত, সবটাই জ্যোতির্ময়। রবীন্দ্রনাথের কোনো উপন্যাস আকাশে পাতালে পাগলে মাতালে হট্টগোল নয় ; নয় জীবনের কণ্ঠে মৃত্যুর অট্টরোল।

রবীন্দ্রনাথের জীবন আর দস্তয়ভস্কির জীবনে যে আকাশ পাতাল ব্যবধান, যে উত্তর ও দক্ষিণ মেরু বৈসাদৃশ্য তাই একজনকে করেছে শান্ত সমাহিত, আরেকজনকে অশান্ত উত্তেজিত। তার ফলে একজনের হাত দিয়ে বেরিয়েছে গোরা, আরেকজনের,— দ্য ব্রাদার্স কারামাজোভ। দুটি উপন্যাসেরই অন্বেষণ মহৎ। দুটিরই লেখা মহৎ কিন্তু কই দ্য ব্রাদার্স কারামাজোভ যা হয়েছে, শেষ পর্যন্ত গোরা সেই মহৎ উপন্যাস হতে পারেনি। এর কারণ রবীন্দ্রনাথ কবি এবং দস্তয়ভস্কি ঔপন্যাসিক। গোরা রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধি দিয়ে লেখা ; দ্য ব্রাদার্স কারামাজোভ, দস্তয়ভস্কির প্যাশন দিয়ে লেখা।

এই প্যাশনের অভাবেই সমগ্র রবীন্দ্র রচনায় ঈষৎ রক্তশূন্য, কিছুটা কৃত্রিম ট্যু গুড্ টুবি ট্রু। পদ্মার তীরের গল্প যখন রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন তখনও সেই অবিস্মরণীয় গল্পগুলি পড়েও মনে হয় সেগুলি দূর থেকে দেখা শৌখিন বিলাসী বোটের নিরাপদ আরাম কেদারায় বলা। দেবতার মতোই রবীন্দ্র রচনার মুখ প্রসাধিত। পাথরের মূর্তির মতো নিরুপম নির্ভুল। কিন্তু প্যাশনলেস। তার মুখে স্বেদের চিহ্ন নেই ; তার গা দিয়ে রক্ত ফেটে পড়ছে না, তার চোখে জল নেই, তার ঠোঁটে নেই এতটুকু কম্পন। কাগজের ফুলের মতোই তা কখনও বাসনার গন্ধে মাতাল করে না মন।

রবীন্দ্র রচনা রূপকথার মতো কিছুটা অলীক এবং অনেকটাই অলৌকিক।

রবীন্দ্রনাথের আগে যাঁর নাম করা উচিত ছিল তিনি আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যের জনক বঙ্কিমচন্দ্র। যত বড় লেখক তার চেয়ে অনেক বড় ব্যক্তিত্ব। তিনি আমাদের প্রথম ঔপন্যাসিক কিন্তু শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক নন। বঙ্গ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ। যদিও বিশ্বের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকদের একজন নন। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে দুর্বল রচনাই তার উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথ চরিত্রে গীতিকবি বলে ব্যর্থ ঔপন্যাসিক। বঙ্কিমচন্দ্র চরিত্রে প্রচারক বলে শিল্পী হিসেবে অসার্থক। ব্যতিক্রম,– কমলাকান্তের দপ্তর। এ রচনায় বঙ্কিম নিজেকে অতিক্রম করে গেছেন। বঙ্গ সাহিত্যে এ বই অদ্বিতীয় এবং বিশ্বসাহিত্যে বিরল! বঙ্কিমের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের নাম, কৃষ্ণকান্তের উইল। এ ছাড়া তাঁর আর দুটি উপন্যাস আলোচনার যোগ্য। রাজসিংহ ও কপালকুণ্ডলা। বঙ্কিমচন্দ্রকে কেবল ঔপন্যাসিক হিসেবে বিচার করলে ভুল হবে। মনে রাখতে হবে যে তিনি বন্দেমাতরম মন্ত্রের স্রষ্টা। তাঁর লেখনী তরবারীর চেয়ে তীক্ষ্ণ। স্বদেশের অধঃপতনে বিচলিত বঙ্কিম যত হুল ফুটিয়েছেন, ফুল ফুটোননি তত।

সতের

রবীন্দ্রনাথ যে পরিমাণে বাক্য বাহুল্যে পীড়িত, বঙ্কিমচন্দ্র সেই পরিমাণেই সংযত ও সংহত-বাক্। বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্তের উইল তার সবচেয়ে উজ্জ্বল উদাহরণ। কৃষ্ণকান্তর উইলের রচনারীতি দৃঢ়বদ্ধ। এ উপন্যাস এখনও আশ্চর্য আধুনিক। নাম থেকে শুরু করে রোহিনীর মৃত্যু পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের উইলের কাজে এতটুকু ফাঁক অথবা ফাঁকি নেই। কৃষ্ণকান্তের উইল নামটি আশ্চর্য সার্থক। এ উইল চুরি করে আবার রেখে আসতে গিয়েই ভালোবাসার সঙ্গে কামনার সংঘাতে সৃষ্ট নাটকের যবনিকা উত্তোলিত। অথচ এ নাম থেকে বোঝবার উপায় নেই যে উপন্যাসের আসল কথাটা কী। রবীন্দ্রনাথও স্বীকার করেছেন যে কৃষ্ণকান্তের উইল উপন্যাসের পক্ষে উপযুক্ত নামকরণ।

বঙ্কিমের এ উপন্যাস কখনও পুরাণো হবার নয়। চোখের বালিরও আগে রোহিনীর মতো কামনায় কালো চোখ বঙ্গ সাহিত্যে রীতিমত অভাবিত। রোহিনী, নিরাবরণ যৌবনের জ্বালা। পঞ্চশরে দগ্ধ করেও মদনের বেদনা যেমন অনিঃশেষ, তেমনই রোহিনী বঙ্গ সাহিত্যে অমর। ভ্রমরের জন্যে যতটুকু ম্লান হয় আমাদের মুখ তার চেয়ে অনেক বেশি বিচলিত করে রোহিনীর যৌবন জ্বালা। রোহিনী গোবিন্দলালের গুলিতে মারা পড়ে; কিন্তু তার বাসনার বহ্নি অনির্বাণ। বঙ্কিম অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে গোবিন্দলালের আর রোহিনীর আকর্ষণ জাল বুনেছেন। অন্যদিকে ভ্রমরের সঙ্গে গোবিন্দ-লালের বিচ্ছেদ-জাল, তাও একটি বাহুল্য শব্দ ব্যয় না করে নিঃশব্দে

পাতা হয়েছে। যে কোনো লেখকের পক্ষে এ দুটি কাজ অত অল্প কথার মধ্যে নিষ্পন্ন করা দুঃসাধ্য ছিল। কৃষ্ণকান্তের উইল মুহূর্তের জন্যেও পাঠককে দাঁড়াতে দেয়না।

আমরা অজান্তে এই জালে কখন জড়িয়ে পড়ি তা আমরা নিজেরাও টের পাইনা। অত্যন্ত শান্ত সুখী একটি পরিবারের জীবন যাত্রার বৃত্তান্তের মধ্যে দিয়ে কাহিনীর মনোরম সূচনা। দু চারটে তুলির টানে দাম্পত্য সুখের চিত্রটি সুন্দর ও সজীব। জীবনের রঙ্গমঞ্চে হরলালের পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে নির্মেঘ নীল আকাশে একটুকরো কালোর আভাষ পাঠকের মনে অশুভ কৌতূহলের বীজ বোনে। উপন্যাসের তৃতীয় পরিচ্ছেদে হরলালের সঙ্গে, রোহিনীর সঙ্গে আমাদের প্রথম সাক্ষাত। তার আগে রোহিনীর কাকা ব্রহ্মানন্দকে হরলাল কৃষ্ণকান্তের উইল বদলের প্রয়োজনে হাত বদলের কৌশল শেখাচ্ছে। 'হরলাল বলিলেন এই কৌশলটি তোমায় শিখাইয়া দিব।' তারপর বঙ্কিম লিখছেন, 'দুই তিন দণ্ডে ব্রহ্মানন্দের সে কৌশলটি অভ্যস্ত হইল।' বঙ্কিমের মনে এত সহজ কার্যোদ্ধারের কৌশল কারুর পক্ষে সম্ভব কি না, এ সন্দেহ একবারও ওঠেনি। তার ফলে পাঠকের মনেও সে সুযোগ অনুপস্থিত। বঙ্কিম জানতেন তিনি যা করতে বসেছেন সে কাজে ব্রহ্মানন্দ প্রসঙ্গ নেহাতই তুচ্ছ। তাই চোখের নিমেষে পট পরিবর্তন করে হরলালকে নিয়ে হাজির হয়েছেন পাকশালে কারণ সেখানে ব্রহ্মানন্দের ভাইঝি রোহিনী রাঁধছিল। বঙ্কিমের মন্তব্য স্মরণীয়ঃ 'এই রোহিনীতে আমার বিশেষ কিছু প্রয়োজন আছে।'

যাকে নিয়ে কৃষ্ণকান্তের উইল উপন্যাসের ভালোবাসার আলো আশায় ভরা আকাশ কামনায় অন্ধকার কালো হয়ে উঠবে সেই রোহিনীর রূপ বর্ণনা অপরূপ সংহতঃ 'রোহিনীর যৌবন পরিপূর্ণ—

রূপ উছলিয়া পড়িতেছিল—শরতের চন্দ্র ষোলো কলায় পরিপূর্ণ। সে অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছিল, কিন্তু বৈধব্যের অনুপযোগী অনেকগুলি দোষ তাহার ছিল। দোষ, সে কালা পেড়ে ধুতি পরিত, হাতে চুড়ি পরিত, পানও বুঝি খাইত।'

বঙ্কিম ছাড়া আর কে পারত এক অপরূপ নাগিনীর এমন রূপ বর্ণনা করতে? এত কম কথায় এত বেশি কথা, এত পুরাকালে এত আধুনিক কালের ক্রাফ্‌ট্‌, বঙ্কিম ছাড়া আর কার।

উইল চুরি করে এনেও হরলালকে রোহিনী সে উইল দিলনা। রোহিনীর কাছ থেকে উইল আদায় করতে না পেরে হরলাল বলল, 'যে চুরি করিয়াছে, তাহাকে কখনও গৃহিনী করিতে পারিব না।' তখন রোহিনী-চরিত্রের আরেকটি দিক সহসা উদ্‌ঘাটিত: 'আমি তোমার অযোগ্য? তোমার মতো নীচ শঠকে গ্রহণ করে, এমন হতভাগী কেহ নাই। তুমি যদি মেয়ে মানুষ হইতে, তোমাকে আজ যা দিয়া ঘর ঝাঁট দিই, তাই দেখাইতাম। তুমি পুরুষ মানুষ, মানে মানে দূর হও।'

একটি সম্ভাবনার তীর থেকে, আর একটি অসম্ভবের তরীতে পা দেবার প্রাক্‌-মুহূর্তে, আমাদের চোখের সামনে জীবনের পর্দা ঈষৎ আন্দোলিত। পর্দার অন্তরালে তখনও আমরা জানিনা, আমাদের জন্যে কি অপেক্ষা করছে, সে কি ট্রাজিডি না কমেডি?

আঠারো

ভ্রমর থেকে রোহিনীতে গোবিন্দলালের মনের মোড় ঘোরার ইতিবৃত্ত এমন পটুতার সঙ্গে কল্পিত যে একবারও সন্দেহ হয় না যে ঘটনাটা উপন্যাসে ঘটেছে, বাস্তবে নয়। যেটুকু দরকার সেটুকু রেখে, যেটুকু বাহুল্য সেটুকু ছেঁটে, জীবনকে অন্ধ অনুকরণ না করে দুঃসাধ্য অনুসরণ ক'রে বঙ্কিম কৃষ্ণকান্তের উইল বলে যে কাহিনী রচনা করেছেন তাকে কোথাও অলীক বা অলৌকিক বলে মনে হয় না। বাংলা সাহিত্যে কোনও উপন্যাস জাতীয় রচনায়, এমন কি বঙ্কিমেরও আর কোনও উপন্যাসে এমন আশ্চর্য ভালো রচনাশৈলীর সাক্ষাৎ মেলে না।

ভ্রমরে সমর্পিতপ্রাণ গোবিন্দলাল, রোহিনীতে আসক্ত গোবিন্দ-লালে পরিবর্তিত হবার পর্যায়টুকু প্রতীতিযোগ্য করে পাঠক সাধারণ্যে উপস্থিত করা খুব সহজসাধ্য ছিল না। বঙ্কিমের চেয়ে অল্প শক্তি সম্বল যে কোনো লেখক এই পরিবর্তন ঘটাতে গায়ের জোরের কিম্বা গোঁজামিলের সাহায্য নিত। দেখা যাক বঙ্কিম কি ভাবে সেই অঘটন ঘটিয়েছেন। সপ্তম পরিচ্ছেদে গোবিন্দলাল এবং রোহিনীর সাক্ষাৎ বারুনীর ধারে। গোবিন্দলাল রোহিনীকে বলল: 'তোমার কিসের দুঃখ, আমায় কি বলিবে না···।'

নবম পরিচ্ছেদে বঙ্কিম লিখছেন, 'গোবিন্দলালের রূপ রোহিনীর হৃদয় পটে দিন দিন গাঢ়তর বর্ণে অঙ্কিত করিতে লাগিল! অন্ধকার চিত্রপট—উজ্জ্বল চিত্র! দিন দিন চিত্র উজ্জ্বলতর, চিত্রপট গাঢ়তর অন্ধকার হইতে লাগিল। তখন সংসার তাহার চক্ষে—যাক্,

পুরাতন কথা আমার তুলিয়া কাজ নাই। রোহিনী, সহসা গোবিন্দলালের প্রতি মনে মনে অতি গোপনে প্রণয়াসক্ত হইল। কুমতির পুনর্বার জয় হইল।

'কেন যে এতকালের পর, তাহার এ দুর্দশা হইল, তাহা আমি বুঝিতে পারি না, এবং বুঝাইতেও পারিনা। এই রোহিনী গোবিন্দলালকে বালক কাল হইতে দেখিতেছে—কখনও তাহার প্রতি রোহিনীর চিত্ত আকৃষ্ট হয় নাই। আজ হঠাৎ কেন? জানি না। যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা তাহা বলিয়াছি। সেই দুষ্ট কোকিলের ডাকাডাকি, সেই বাপীতীরে রোদন, সেই কাল, সেই স্থান, সেই চিত্তভাব, তাহার পর গোবিন্দলালের অসময়ে করুণা—আবার গোবিন্দলালের প্রতি রোহিনীর বিনাপরাধে অন্যায়াচরণ—এই সকল উপলক্ষে কিছু কাল ব্যাপিয়া গোবিন্দলাল রোহিনীর মনে স্থান পাইয়াছিল। তাহাতে কি হয় না হয়, তাহা আমি জানি না, যেমন ঘটিয়াছে, আমি তেমনি লিখিতেছি।'

দশম পরিচ্ছেদে: 'গোবিন্দলালের বিশ্বাসেই ভ্রমরের বিশ্বাস।' ইতিমধ্যে রোহিনী কৃষ্ণকান্তের উইল ফেরত দিতে এসে ধরা পড়ল। তারপর নিম্নলিখিত সংলাপ:

"গো। তুমি আপনিত বলিয়াছিলে, তুমি এ দেশ ত্যাগ করিতে চাও?

রো। আমি বলিয়াছিলাম লজ্জায়, আপনি বলেন কেন?

গো। তোমায় আমায় আর দেখাশুনা না হয়।

রোহিনী দেখিল, গোবিন্দলাল সব বুঝিয়াছেন।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে রোহিনী বারুনীতে ডুব দিল। গোবিন্দলাল দেখলেন, 'স্বচ্ছ স্ফটিক মণ্ডিত হৈম প্রতিমার ন্যায় রোহিনী জলতলে শুইয়া আছে। অন্ধকার জলতল আলো করিয়াছে।'

এরপর রোহিনীকে বাঁচাবার জন্যে মালিকে গোবিন্দলাল রোহিনীর ঠোঁটে ফুঁ দিতে বললেন। মালী রাজি হল না। তখন গোবিন্দলাল, 'সেই ফুল্লরক্তকুসুমকান্তি অধর যুগলে ফুল্লরক্ত-কুসুমকান্তি অধর যুগল স্থাপিত করিয়া—রোহিনীর মুখে ফুৎকার দিলেন।'

রোহিনীর ঠোঁটে যখন গোবিন্দলালের ঠোঁট স্পর্শ করল, ঠিক তখনই, 'ভ্রমর একটা লাঠি লইয়া, একটা বিড়াল মারিতে যাইতেছিল, লাঠি বিড়ালকে না লাগিয়া, ভ্রমরেরই কপালে লাগিল।'

আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে, উপন্যাসের পাতায় এই আশ্চর্য মণ্টাজ্ বঙ্কিমের ছাড়া আর কার কলমে উচ্চারিত হওয়া সম্ভব ছিল?

উনিশ

কৃষ্ণকান্তের উইল উপন্যাসে উপনায়িকা রোহিনীর মৃত্যু ঘটানো হয়েছে গোবিন্দলালের পিস্তলের গুলিতে। তাতে কোন কোন সমালোচক বলেছেন যে রোহিনী নয়, উপন্যাসের Art কেই বঙ্কিম হত্যা করেছেন। পরবর্তীকালে এ বিষয়ে সবচেয়ে সোচ্চার হয়েছেন শরৎচন্দ্র। অর্থাৎ রোহিনীকে জোর করে মেরেছেন বঙ্কিম। রোহিনীকে বাঁচিয়ে রাখলে তার জীবনের ট্রাজিডি সার্থকতর হ'ত। কিন্তু কৃষ্ণকান্তের উইল কি রোহিনীর অথবা ভ্রমরের ট্রাজিডি? না। কৃষ্ণকান্তের উইল, গোবিন্দলালের একার প্রেম ও কামনার আনন্দ বেদনার বাণী। গোবিন্দলালকে যদি বঙ্কিম আত্মহত্যার পথে প্রস্থানে বাধ্য করতেন তাহলে আর্ট ক্ষুণ্ণ হতো। বস্তুত, রোহিনীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এ উপন্যাস সমাপ্ত। তার পরের অংশটুকু যে বঙ্কিম লিখেছেন তিনি নিছক প্রচারক। বঙ্কিমের বিরুদ্ধে যদি শিল্প বিচারে কোনো আপত্তি টেঁকে, তা হচ্ছে, বঙ্কিম নীতি কথাকে কথা সাহিত্যের চেয়ে বড় করে দেখেছেন। বঙ্কিম মূলত প্রবন্ধকার।

ভ্রমরের কাছে গোবিন্দলালকে ফিরিয়ে আনা, গোবিন্দলালকে সন্ন্যাসী করে তোলা, এ সবই ঔপন্যাসিকের অকরণীয়। জীবনের ট্রাজি-কমিডির আবরণ উন্মোচনই উপন্যাস; শেষ পর্যন্ত ধর্মের জয় ঘোষণা করতেই হবে, এমন কথা যথার্থ উপন্যাসের কথা নয়। ঔপন্যাসিকের কাজ হচ্ছে, রেকর্ড করা; নীতি-দুর্নীতির ওপর বক্তৃতা দেওয়া সমাজ সেবীর আওতা, কথা সাহিত্যিকের কর্তব্য নয়। এ

জন্যেই রোহিনীর মৃত্যুর পর পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্ত হয়। গোবিন্দলাল ধরা পড়ল কি পড়লনা, এ প্রশ্ন, গোয়েন্দা-পুস্তক-পাঠকের। সাহিত্য রসিকের জীবন জিজ্ঞাসা কিছুতেই নয় তা।

শোনা যায়, বঙ্কিম নাকি বলেছিলেন যে, রোহিনীকে না মেরে তিনি কি করতে পারতেন আর। আর একটি কাজ অন্তত তিনি স্বচ্ছন্দে করতে পারতেন। আর একটি কথাও না লিখতে পারতেন তিনি। কাব্যে এবং কথা সাহিত্যে একটি কথা কম হলেও যে ক্ষতি, একটি কথা বেশি হলেও তার ব্যতিক্রম নয়। কৃষ্ণকান্তের উইলে আগাগোড়া সংহত সংযতবাক্ বঙ্কিম কেন রোহিনীর মৃত্যুতে থামতে পারলেন না তা অনুমান করা শক্ত নয়। এর কারণ, ভ্রমরের জয় এবং গোবিন্দলালের পরাজয় উলঙ্গ করে না দেখানো পর্যন্ত প্রচারক অতৃপ্ত। বঙ্কিমের উপন্যাসে কুমতি-সুমতির বিবাদ, জনান্তিকে লেখকের মন্তব্য, এ সবই ঐ একই কারণের উৎস থেকে উৎসারিত। বঙ্কিম কখনই ভুলতে পারেননি যে তিনি নিছক ঔপন্যাসিক নন, তিনি তাঁর চেয়ে অনেক বড় ব্যক্তিত্ব। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে তাঁর এ ধারণা সত্য। কিন্তু ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের ক্ষেত্রে এটি নিষ্ঠুর সত্য।

ঔপন্যাসিক জীবনকে অনুকরণ না করে তাকে অনুসরণ করবে। জীবনের গল্প বলতে গিয়ে তার সৃষ্ট পাত্র পাত্রীকে আশীর্পূত কিম্বা অভিশপ্ত কিছুই করবে না। চরিত্রগত কারণে সেই পাত্র পাত্রীর পক্ষে যা অনিবার্য, যা অপরিহার্য, তাই লিপিবদ্ধ করার দায়ে বদ্ধ লেখক। জীবনকে যে বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে একজন লেখক দেখেন সেই দৃষ্টি ভঙ্গীর বিশেষত্বর ওপরই নির্ভর করে ঔপন্যাসিক হিসেবে তার বিশেষত্ব। কারণ মহৎ উপন্যাস মাত্রই অনেকটাই ঔপন্যাসিকের আত্মজীবনী। এমন জীবন নেই যা নিয়ে উপন্যাস লেখা যায়, কিন্তু এমন ঔপন্যাসিক কই যে, যে কোনো জীবন থেকে

গল্পটুকু ছেঁকে তুলতে পারে। এমন কি নিজের জীবন থেকেও যতটুকু দরকার ততটুকু নিয়ে যতটুকু বরবাদ করবার তাকে বাদ দিয়ে, একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে চলমান জীবনের পার্সপেক্‌টিভ-এর পটভূমি ধরে রেখে নিজের পিক্যুউলিয়র পার্সোনালিটি এবং ইডিওসিনক্রিসিস সংযুক্ত করে সেই উপন্যাসের জন্ম দিতে পারে যা কোটিকে গোটিক। যেমন, দস্তয়ভস্কির দ্য ব্রাদার্স কারামাজোভ্, বালজাকের দ্য কমিটি হিউমেন, তলস্তয়ের ওয়ার এণ্ড পিস।

বঙ্কিমের সহজাত ব্যক্তিত্ব সেই জন্যেই সবচেয়ে বেশি সজীব যে বইতে, সে বইয়ের নাম স্বভাবতই, কমলাকান্তের দপ্তর।

ক্রাফ্‌টের বিচারে কমলাকান্তের দপ্তর বঙ্গ সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। কিন্তু জীবনের অতলস্পর্শ গভীরতায় অবগাহনের অনিচ্ছায়, এ উপন্যাস মহৎ নয়। অথচ গোবিন্দলালের ট্রাজিডি গভীরতার উপাদানে বঞ্চিত নয়। এই ব্যর্থতার ট্রাজিডি ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের ট্রাজিডি। কৃষ্ণকান্তের উইলের উপাদান নিয়ে বাংলা সাহিত্যে আজও এমন উপন্যাস লেখা যায় যা মহৎ উপন্যাসের লক্ষ্য হতে পারে অনায়াসে। গোবিন্দলাল, ভ্রমর এবং রোহিনী, এই ত্রয়ীর ট্রাজিডি নিয়ে মহৎ উপন্যাস, মহাকাব্যের মহিমায়, আজও পুনর্জন্মের প্রতীক্ষায় আছে। সে প্রত্যাশা পূরণ করবার মতো লেখক নেই একজনও, বর্তমান বঙ্গ সাহিত্যের ট্রাজিডি হচ্ছে এই।

কুড়ি

তিনটি চরিত্রের এই উপন্যাস কৃষ্ণকান্তের উইল ; রোহিনী, ভ্রমর ও গোবিন্দলালের। এহ বাহ্য। আসলে এ উপন্যাস গোবিন্দলালের দুটি সত্তার মধ্যে বিরোধ। রোহিনী এবং ভ্রমর এই দুটি মানুষই গোবিন্দলালের মনে বাস করে। বস্তুত প্রত্যেক মানুষেরই মনে থেকে থেকে রোহিনী এবং ভ্রমরের মধ্যে লড়াই বাধবার উপক্রম লেগেই আছে। এবং এ যুদ্ধে ভ্রমর বারংবার রোহিনীর কাছে পরাজিত। রোহিনীর কাছে ভ্রমর কেন বারবার পরাজিত, এ হচ্ছে মানুষের শাশ্বত জীবন জিজ্ঞাসা। বুদ্ধিতে এর যে উত্তর মেলে তাই এর একমাত্র উত্তর কিনা জানিনা। যেহেতু ভ্রমর গোবিন্দলালের স্ত্রী, সেহেতু রোহিনীর আকর্ষণ তার কাছে বেশি। মানুষের রক্তেই বহু ভোগের বাসনার বাস। আমরা যা পাই আমরা তা চাই না। সেই চেয়ে না পাওয়ার ব্যথা আমরা যাকে পেয়ে ভুলতে চেষ্টা করি, একটা সময় আসে যখন যাকে পেয়েছি তাকে আর না-চাওয়ার মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। চাওয়া এবং পাওয়ার গভীর আনন্দ নয় ; চাওয়া এবং না পাওয়ার সুগভীর বেদনাই হচ্ছে মানবজীবন।

ভ্রমর না হয়ে যদি রোহিনী গোবিন্দলালের স্ত্রী হতো, তাহলে রোহিনী গোবিন্দলালকে ছেড়ে আর কাউকে চাইত। তখনও এই ট্রাজিডি গোবিন্দলালেরই ট্রাজিডি হতো। ভ্রমর সত্ত্বেও গোবিন্দ-লালের রোহিনীতে মজার কারণ হচ্ছে ভ্রমরের অতিরিক্ত স্বামী-সোহাগ। এক মুহূর্ত স্বামীকে ছেড়ে থাকতে না পারার প্রতিক্রিয়া

সব সময় শুভ হয়না। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে সম্পর্কহীন পুরুষ ও নারীর প্রবেশ এই ছিদ্র পথেই ঘটে থাকে। গোবিন্দলাল এবং ভ্রমরের মধ্যে যদি সময় ও স্থানের বিচ্ছেদ হতো তাহলে এ ট্রাজিডি অসম্ভব ছিল, একথা বলি না, কিন্তু তার সম্ভাবনা ছিল অন্যরকম। স্বামী-স্ত্রীর বিবাহের কিছুকাল পরেই অত্যন্ত একসঙ্গে বসবাসের কারণই মনে মনে অত্যন্ত দূরে চলে যাওয়ার মূলে।

ভ্রমর দারুণ ভালো। কিন্তু too good to be true। রোহিনীকে বারুনীর অন্ধকার আলোয় আনবার মুহূর্তে গোবিন্দলাল আলো থেকে অন্ধকারে পিছলে গেছে। রোহিনীর মধ্যে যে আকর্ষণ তা নিষিদ্ধ বলেই গোবিন্দলাল পদভ্রষ্ট হয়েছে। হাত বাড়ালেই ভ্রমরকে পেয়ে পেয়ে আত্মতৃপ্ত গোবিন্দলাল এবার সেই মৃণাল বাহুর দিকে হাত বাড়িয়েছে, যার জন্যে কণ্টকে ক্ষত বিক্ষত হওয়াই তার স্বাভাবিক আকর্ষণের উৎস। এবং শেষ পর্যন্ত রোহিনীকে জবরদখল করবার পর থেকেই রোহিনীর চোখের আলো গোবিন্দলালের চোখে আলেয়া রূপে প্রতিভাত হওয়ার পালা শুরু। মানুষের ট্রাজিডিই এই। খাঁটি সোনার থেকে মিথ্যে বাসনার প্রলোভন তার কাছে অনেক বেশি জ্যান্ত।

এ উপন্যাস লেখা হলে সমসাময়িক কাল ভ্রমরকে দোষী করত এ ট্র্যাজিডির জন্যে। সে নিশ্চয়ই বলত যে ভ্রমরের অত্যধিক আত্মমর্যাদাই গোবিন্দলালকে স্ত্রীর স্বর্গ থেকে স্ত্রীলোকের রসাতলে ঠেলে দিয়েছে। গোবিন্দলালের দুর্বলতাকে বড় করে না দেখে যদি ভ্রমর গোবিন্দলালকে আর একটু ছেড়ে দিতো তাহলে গোবিন্দলালের ভুল ভাঙতে দেরী হতো না। সমসাময়িকালের এই কিম্বা অন্য কোনো রায় কিছু চিরকালের রায় নয়। আসলে এ উক্তি নীতি শাস্ত্রের ; এ রায় রস শাস্ত্রের নয়। ঔপন্যাসিকের কাজ ট্রাজিডির

পথনিরোধ করা নয়; ট্রাজিডির আবরণ উন্মোচন করা। সেই আবরণ উন্মোচন করতে গিয়ে ভ্রমরকে অত্যন্ত ভালো করতে গিয়ে বঙ্কিম তাকে অবাস্তব করেছেন। রোহিনীকে অত্যন্ত বাস্তব করতে গিয়ে গোবিন্দলালকে কলের পুতুল বানিয়েছেন। বস্তুত, কারুর প্রতি সুবিচার না করতে পেরেও সকলের প্রতি তিনি অবিচার করেছেন।

রোহিনী পরপুরুষের সঙ্গে ধরা পড়বার পর গোবিন্দলাল তাকে ঘরে বন্ধ করে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছে। রোহিনীর, গোবিন্দলালের সঙ্গে বেরিয়ে যাওয়ার পর, আবার অন্য পুরুষের প্রতি আসক্ত হওয়ার ঘটনাকে অসঙ্গত মনে করিনা। এমনকি হরলাল তাকে চোর অপবাদে বিবাহ করতে অস্বীকার করবার পরেও গোবিন্দলালের স্ত্রী হিসেবে নয় স্ত্রীলোক হিসেবে থাকতে স্বীকৃত হওয়া জীবন সঙ্গত মনে করি। রোহিনী যে জাতীয় স্ত্রীলোক তারা বিবাহিত হলে কোনো অবস্থাতেই এক পুরুষে তৃপ্ত থাকার লোক নয়। হরলাল তাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে না চাইলে সে হরলালকেই অপমান করতে দ্বিধাবোধ করেনি। কিন্তু গোবিন্দলালের ক্ষেত্রে মান-অপমানের প্রশ্নই তার মনে ওঠেনি। তার কারণ গোবিন্দলালের রূপ, সহানুভূতি এবং অকস্মাৎ সুযোগের উপস্থিতি। এই রোহিনী যখন গোবিন্দলালের সব কিছুর বিনিময়েও সন্তুষ্ট নয়, এ কথা গোবিন্দলাল যখন জানতে পারে তখন তার পক্ষে রোহিনীকে গুলি করা বাস্তবিক পুরুষোচিত। কিন্তু গুলি মারবার আগে রোহিনীকে গোবিন্দলালের বক্তৃতা, ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের কলমে নয়, প্রচারক বঙ্কিমের বকলমে উচ্চারিত। এক বালতি দুধে এই এক ফোঁটা চোনা কৃষ্ণকান্তের উইলকে আশ্চর্য ক্রাফট সত্ত্বেও অতি অবাস্তবতার পর্যায় পৌঁছে দিয়েছে। এ দোষ বঙ্কিমের অল্প বিস্তর সব উপন্যাসেই উপস্থিত। তাই বলেছি, বঙ্কিম যতবড় ব্যক্তিত্ব, ততবড় ঔপন্যাসিক নন।

একুশ

কল্পনার ঐশ্বর্যে, সমস্যার নবত্বে, সহৃদয়তার সামর্থ্যে, বঙ্কিমের মানস কন্যা কপালকুণ্ডলা বঙ্গ সাহিত্যের নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ। কাপালিকের কবল থেকে উদ্ধৃত সমাজের যূপকাষ্ঠে সন্দেহের বলি কুণ্ডলার স্বাভাবিকতা, সারল্য, এক অসাধারণ ট্রাজিডির উপকরণ। এ রচনা রোমান্স অথবা উপন্যাস, এ হ'লো স্থূল বর্বর বহিরংগ আলোচনা। কপালকুণ্ডলার অন্তরের অন্তঃস্তলে প্রবেশ করতে হ'লে দুর্লভ অভিনিবেশ, সংকেতধর্মিতা, অতি সাধারণ সংবেদনশীলতা এবং অতিমানসের সহজাত অধিকার আয়ত্বাধীন হওয়া চাই। কপালকুণ্ডলা আধো স্বপ্ন আধো জাগ্রত,—অর্ধেক বলা অর্ধেক না বলা ; সূক্ষ্ম ও স্থূলের সোনায় সোহাগা। কপালকুণ্ডলা লেখা যত শক্ত, পড়া তার চেয়ে সহজ নয়।

বাংলা ভাষায় গদ্যে যদি কোন কাব্য কেউ লিখে থাকেন তো কপালকুণ্ডলায় বঙ্কিম ; যোগাযোগে রবীন্দ্রনাথ। এ গদ্যকাব্যের আরম্ভ একটি দিকহারা, কূলহারা সমুদ্রপ্রায় নদীর বুকে কৃষ্ণবর্ণ কুজ্ঝটিকার অন্ধকারে। এবইয়ের শেষ অনন্ত গঙ্গাপ্রবাহ মধ্যে, বসন্তবায়ুবিক্ষিপ্ত বীচিমালায় আন্দোলিত নিরুদ্দেশ যাত্রায়। এ কাব্য শেষ হবার পর অন্তরে ধূলি ধূসরিত বাসর গৃহে অনন্তের উদ্দেশে একটি অনির্বান আকাশ প্রদীপ জ্বলে ওঠে আমাদের মনে। বেদনার নদীতে কথার তরণী পথ হারায়। বিষয় বেদনাহত চিত্তের অবরুদ্ধ ক্রন্দনের আবেগ বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মতো সহস্র কণ্ঠের গর্জনে নয়, নিরুপম নিঃশব্দতার তটে মাথা খুঁড়ে মরে।

কপালকুণ্ডলা বঙ্কিমের দ্বিতীয় হলেও আসলে অদ্বিতীয় রচনা। দুর্গেশনন্দিনীর লেখক বঙ্কিম আর কপালকুণ্ডলার জনক বঙ্কিম, এ দুয়ের মধ্যে ব্যবধান কালের নয়, এ দুয়ের মধ্যে ব্যবধান কুঁড়ির সঙ্গে ফুলের ; অস্ফুট ধ্বনির সঙ্গে কাকলীর ; কৃত্রিম হ্রদের সঙ্গে অসীম সমুদ্রের। বঙ্কিমের সব লেখাই পড়া শেষ হলে ফুরিয়ে যায় ; কপালকুণ্ডলা এবং কমলাকান্তের দপ্তর ফুরিয়ে যাবার পরেও অশেষ থাকে। এ উপন্যাস লেখা হবার পর বাংলা সাহিত্যের বয়স বেড়েছে অনেক। অনেকতর উপকরণে বাজারের থলি ভরে উঠেছে। কিন্তু বঙ্গভারতীর নৈবেদ্য হবার মতো লেখা, কপালকুণ্ডলার তুল্য উপচার উপন্যাসের সূচীপত্রে অনুপস্থিত। বঙ্কিম ছাড়া আর কারুর পক্ষে এই অতি অসাধারণ কল্পনাকে রূপ দেওয়া অসম্ভব ছিলো। এমনকি দুর্গেশনন্দিনী পড়েও মনে হয়না একবারও যে বঙ্কিম এত বড় শিল্পী।

বঙ্কিম একদিন তাঁর বৈঠকখানায় কপালকুণ্ডলার সমস্যাটি তুলে ধরেন। সমাজের বাইরে প্রতিপালিতা কপালকুণ্ডলার মতো কেউ যদি সমাজে আশ্রয় পায় তাহলে তার পরিণতি কি হবে এই ছিলো বঙ্কিম-জিজ্ঞাসা। বঙ্কিম ভ্রাতা রহস্যপ্রিয় সঞ্জীবচন্দ্র উত্তর দিয়েছিলেন যে, সে চোর হবে। বঙ্কিম এ উত্তরে রুষ্ট হন। পরে রহস্য ত্যাগ করে সঞ্জীবচন্দ্র বলেনঃ "কিছুকাল সন্ন্যাসীর প্রভাব থাকিবে। পরে সন্তানাদি হইলে স্বামি-পুত্রের প্রতি স্নেহ জন্মাইলে সমাজের লোক হইয়া পড়িবে ; সন্ন্যাসীর প্রভাব তাঁহার মন হইতে একেবারে তিরোহিত হইবে।"

এ উত্তর বুদ্ধিদীপ্ত ; বঙ্কিম প্রতিভাপ্রদীপ্ত নয়। বঙ্কিম এ প্রশ্নের যে উত্তর দিয়েছেন, বঙ্গসাহিত্যে তা চিরস্থায়ী কীর্তি হয়ে আছে। কপালকুণ্ডলা বঙ্কিমের কীর্তির চেয়ে কিছু বেশি। কপালকুণ্ডলার কল্পনা এবং জন্ম, এর বিস্ময় আনন্দ এবং বেদনা কাব্যেরই মতো

কেবল সহৃদয়গ্রাহ্য। মানব হৃদয়ের অতি সূক্ষ্ম কারুকার্যমণ্ডিত এই ব্যাখ্যা। এক দুঃসাহসী শিল্পীর অবিস্মরণীয় দীপ্তি। বঙ্কিমের আর কোনও লেখায় শিল্পীর স্বধর্ম এমন সোচ্চার নয়। দুর্গেশনন্দিনীর পর স্বাভাবিক ছিলো আরেকটি দুর্গেশনন্দিনী জাতীয় রচনা। কিন্তু নিরাপদ নিশ্চিন্ততা পরিহার করে কপালকুণ্ডলায় যে পথ ধরে বঙ্কিমের প্রতিভা দীপ্যমান হলো সে পথ ক্ষুরধার দুর্গম। দুর্গেশ নন্দিনীতে যে বঙ্কিমের বঙ্গসাহিত্যে প্রথম পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ্য অভিবাদন সে পথ থেকে কপালকুণ্ডলার উৎস এত দূর এবং এত দুরধিগম্য যে একমাত্র প্রতিভা ছাড়া আর যে কারুর পক্ষেই তার সাধ এবং সাধ্য দুয়েরই অতীত। মাইকেল মধুসূদন যে অর্থে আজও আধুনিক, কপালকুণ্ডলায় বঙ্কিম সেই একই অর্থে অদ্বিতীয়। বঙ্কিম-মানস যে ভাবে এই রচনায় সহসা প্রকাশিত তার সঙ্গে তুলনা চলে কেবল এক অপরূপ সূর্যাস্তের চিত্রাঙ্কনরত এক অদৃশ্য অপরূপ দক্ষ শিল্পীর। এ শিল্পের স্রষ্টা এবং রসিক একই ভাবনার ভাবুক না হলে কপালকুণ্ডলার মহিমা অবলোকন অসাধ্য।

বাইশ

কপালকুণ্ডলা, এই পৃথিবীর পরমাশ্চর্য কান্না। সমাজের মনুষ্য চরিত্র সম্পর্কে অজ্ঞ এই রমনী খানিকটা স্বপ্ন আর খানিকটা অদ্ভুত সারল্য দিয়ে গড়া। She was too good to be true। নবকুমার তাকে বিশ্বাস করতে পারেনি। না পারার জন্যে নবকুমারকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। তার কারণ, অনুরূপ অবস্থায় কোটিকে গোটিক ব্যতিক্রম হতে পারত। নবকুমার কপালকুণ্ডলার রূপে মুগ্ধ হয়েছিল ; কপালকুণ্ডলার মধ্যে অপরূপের সন্ধান পায়নি সে ঃ

"নবকুমার কহিলেন, 'কাঁদিব কেন ? তুমি কি জানিবে মৃন্ময়ি ! তুমি ত কখনও রূপ দেখিয়া উন্মত্ত হও নাই'—"।

সোনার হরিণের চেয়েও বাসনার হরিণের পেছনে যে পুরুষ দৌড়য় নিজের ভুল ভাঙার সময় যখন আসে তখন তার চেয়ে কৃপার পাত্র আর কে। নবকুমার কপালকুণ্ডলার চরিত্রে সন্দেহ করে যখন প্রায় জেনেছেন কপালকুণ্ডলা প্রজ্জ্বলিত পাবকের চেয়েও পূতঃ এবং পবিত্র, তদ্দণ্ডেই বলেছেন ঃ "তুমি ত কখনও আপনার হৃদপিণ্ড আপনি ছেদন করিয়া শ্মশানে ফেলিতে আইস নাই।"

কপালকুণ্ডলা যে অবিশ্বাসিনী হতে পারেনা, এবং কপালকুণ্ডলাকে সে কৈফিয়ৎ দিতে হলে যে তারপর সে আর কারুর ঘরণী হয়ে থাকতে পারেনা, নবকুমার তা জেনেও কপালকুণ্ডলার পায়ে পড়ে বলেছে ঃ "একবার বল যে, তুমি অবিশ্বাসিনী নও।"

জীবনের রঙ্গমঞ্চে অকাল যবনিকা পতনের মুহূর্তে, অনূঢ়া কালের মত কেশমণ্ডলমধ্যবর্তিনী কপালকুণ্ডলা সমুদ্রের সুগভীরতার চেয়েও

সুগম্ভীরতার নিরুপম নিরুত্তেজকণ্ঠ। কেবল বললেন: "তুমি ত জিজ্ঞাসা কর নাই!" তারপর নবকুমারের সন্দেহ সমূলে উৎপাটিত করবার পর অবিচলিত প্রতিজ্ঞায় দীপ্ত হলেন: "ভবানীর চরণে দেহ বিসর্জন করিতে আসিয়াছি—নিশ্চিত তাহা করিব। তুমি গৃহে যাও। আমি মরিব। আমার জন্য রোদন করিও না।"

বঙ্কিমের কোনও উপন্যাসে আরম্ভ এবং শেষ এমন অশেষ বিস্ময়ে এবং কান্নায় রহস্য ও সঙ্গীতময় নয়।

মৃত্যুর মুহূর্তে কপালকুণ্ডলার মধ্যে যে অমৃত ছিল, বঙ্কিম একটি আঁচড়ে তাকে অনবদ্য উপস্থিত করেছেন: "এই প্রশ্ন কপালকুণ্ডলা যে স্বরে করিলেন, তা কেবল রমণী কণ্ঠেই সম্ভবে। যখন রমণী পর দুঃখে গলিয়া যায়, কেবল তখনই রমণীকণ্ঠে সে স্বর সম্ভবে। কে জানিত যে, আসন্নকালে শ্মশানে আসিয়া কপালকুণ্ডলার কণ্ঠ হইতে এ স্বর নির্গত হইবে?"

শুষ্ক কথার রুক্ষ জটা থেকে দিব্য ভাবের এই জাহ্নবী এমন অনায়াসে মুক্ত করে আনা আর কার কলমে সম্ভব ছিল আমি জানিনা।

অন্তিম মুহূর্ত আসন্ন হলে, বাসনার হরিণের পেছনে দৌড়ে ক্লান্ত নবকুমারের অন্তরের অন্তঃস্তল বেদনায় বিদীর্ণ করে উঠে এসেছে বিস্ফারিত হৃদয়ের হাহাকার: "তুমি ত কখনও আপনার হৃদপিণ্ড আপনি ছেদন করিয়া শ্মশানে ফেলিতে আইস নাই।"

কোটি কথায় যা কেউ বলতে পারত না, ক'টি কথায় কখনও কখনও যে, কেউ সে কথা বলতে পারে,—নবকুমারের এই সংলাপ তারই তুলনাহীন আলাপ। এই কাব্য গদ্যে লেখা। বাংলা সাহিত্যের অনেক কাব্যে লেখা গদ্যের অভাব নেই। বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ এবং ক্বচিৎ কদাচিৎ বিভূতিভূষণ-ই কেবল গদ্যে কাব্য রচনা করেছেন।

কপালকুণ্ডলা একটি স্বপ্নাচ্ছন্ন তন্দ্রাচ্ছন্ন কুয়াশাচ্ছন্ন প্রত্যূষ থেকে যাত্রারম্ভ করে একটি আনন্দ-বেদনার অতাত, বিচার বিশ্লেষণ ব্যাখ্যার অতীত, না-অন্ধকার না-আলোকিত প্রদোষচ্ছায়ায় পথ হারানোর করুণ বিপ্রলম্ভ। এ সেই আশ্চর্য গান যা শেষ হবার পর আমরা এমন মুহ্যমান, আমাদের অস্তিত্ব এমন আনন্দের সমুদ্রে কান্নার জোয়ারে ভাসমান, আমাদের কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ, আমাদের অন্তর আনন্দ আপ্লুত, আমাদের চিন্তা স্তব্ধ, আমাদের চেতনা এমন লুপ্ত যে, কপালকুণ্ডলা,—গদ্য কাব্য না গান, এ জ্ঞান অনবশিষ্ট।

তেইশ

বঙ্কিম এবং রবীন্দ্রনাথ বিদ্বজ্জনপ্রিয়; কিন্তু শরৎচন্দ্র শুধুই জনপ্রিয়। এই কারণেই অত্যন্ত অধুনা শরৎচন্দ্র যতটুকু নন্দিত তার চেয়ে অনেক বেশি নিন্দিত। এক সময় নির্বোধ সাহিত্য জিজ্ঞাসা ছিল যে, শরৎচন্দ্র না রবীন্দ্রনাথ, কে বড়। আজ আবার শুনছি, শরৎচন্দ্র চোখের জলের লেখক; তার পাঠক একমাত্র মেয়েরা। এই দুই উক্তির মধ্যে কোনটি হাস্যকরতর বলা আমার পক্ষে অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথ যে পৃথিবীতে লেখক, বঙ্গসাহিত্যে সে পৃথিবী অনুপস্থিত। এবং বিশ্বসাহিত্যে তিনজন কি চারজন রবীন্দ্রসঙ্গী আজ পর্যন্ত দেখা দিয়েছেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র কেবল মেয়েদের লেখক, একথা বলা, অতি অর্বাচীন বাচালতা বই কিছু নয়। শরৎ-সাহিত্যে বিদ্ব-জ্জনপ্রিয়তার চেয়ে জনপ্রিয়তার উপাদান বেশি একথা অস্বীকার করবে কে। কিন্তু সেই সঙ্গে কেই বা স্বীকার না করবে যে, বিদ্বজ্জনপ্রিয়তা কাউকে শিল্পী করে না; এবং জনপ্রিয়তা শিল্পীর

সধর্মচ্যুতি নয়। বার্নড শ বিদ্বজ্জনপ্রিয়; টমাস হার্ডি,—জনপ্রিয়। সাহিত্য পাঠকের কাছে হার্ডি, শ অথবা ওয়েলস্‌ের চেয়ে অনেক বড় গুণী।

শরৎচন্দ্র কেবলই গল্পকার। অত্যন্ত ইদানীং গল্প ব্যাপারটা প্রশংসার চেয়ে নিন্দার পাত্র হয়েছে অনেক বেশি। কোন লেখায় গল্প থাকলেই তার জাত গেল উল্টোপক্ষে। গল্পর নামে প্রবন্ধ রচনা অধুনা সুপ্রচুর সার্টিফায়েড হচ্ছে। অর্থাৎ গল্প যারা লিখতে পারে না তারা বলছে সাহিত্য গল্প নয়; গল্প যারা লিখতে পারে তারা বলছে গল্প ছাড়া কথাসাহিত্য কিছু নয়। হস্তী সম্পর্কে দুই অন্ধের বিতর্কের মতই এর শেষ নেই। আসলে নিছক গল্প অথবা গল্প-নিঃস্বতা কথা সাহিত্যের আসল কথা নয়। ওয়ার এণ্ড পিস গল্প সত্ত্বেও মহৎ সাহিত্য; কাম্যুর দ্য আউট সাইডার গল্প-না সত্ত্বেও গহন সাহিত্যকর্ম। আবার, মমের কেকস এণ্ড এল উঁচু দরের ক্রাফ্‌ট কিন্তু ক্রিয়েশন নয় এবং জয়েসের উলিসিস ক্রাফটের অনুপস্থিতিতেও বৃহৎ সৃনাসৃষ্টি।

শরৎচন্দ্র প্রথমত এবং প্রধানত জীবনের গল্পকার। বঙ্গসাহিত্যে যে বিরল কতিপয় জীবনের আঘাটা থেকে কিছু বিচিত্র অভিজ্ঞতা কুড়িয়ে এনেছেন শরৎচন্দ্র তাঁদের মধ্যে বিরলতম উপস্থিতি। তাঁর অভিজ্ঞতার পৃথিবী সঙ্কীর্ণ, কিন্তু অলীক বা অলৌকিক নয়। যেটুকু দেখেছেন, তার থেকে কতটুকু বাদ দিয়ে কতটুকু যোগ করলে জীবনের একটা নিটোল গল্প খাড়া হয় তা তিনি জানতেন। তাঁর গল্পে আদি মধ্য এবং অন্ত্য সুনির্দিষ্ট এবং পারস্পরিক। কোথায় শুরু করতে হবে এবং কোথায় পৌঁছে থামতে হবে, এ তাঁর বিলক্ষণ জানা ছিল। যেখানে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার আকাশ সীমা লঙ্ঘন করে বিদ্যা বুদ্ধির জানান দিতে গেছেন সেখানেই তিনি স্বধর্মচ্যুত হয়েছেন। যেমন শেষপ্রশ্ন, বিপ্রদাস অথবা নারীর মূল্য। কিন্তু

যে পৃথিবী শরৎচন্দ্রের নিজের সেখানে তিনি অপরাজিত সম্রাট। যেমন নিষ্কৃতি, রামের সুমতি, মহেশ।

শরৎচন্দ্র জীবনকে দর্শন করেছেন; কিন্তু তাঁর লেখায় জীবনদর্শন অনুপস্থিত। তিনি অনবদ্য গল্পকার কিন্তু মানবাত্মার নিগূঢ় মর্মের আত্মীয় নন; তিনি ইণ্টারেস্টিং কিন্তু ইনস্ট্রাক্টেবল নন। চোখের সামনে যা ঘটছে লেখকের চোখ তার পেছনে আরও অনেকখানি দেখতে পায়; মহৎতম লেখকরা জীবনের দুর্ভেদ্য দেওয়াল ভেদ করে পৌঁছতে পারেন মানব রহস্যের গভীরে। শরৎচন্দ্র যেটুকু দেখতে পেয়েছেন সেটুকুর জন্যে তিনি পপুলার; যেটুকু দেখতে পাননি তার অভাবেই তিনি প্রোফাউণ্ড নন। শরৎচন্দ্রের তিনটি উপন্যাসে প্রোফাণ্ডউডিটির লক্ষণ আছে: গৃহদাহ, চরিত্রহীন এবং শ্রীকান্তের প্রথম দুই পর্ব। চরিত্রহীন শরৎচন্দ্রের সবচেয়ে গভীর এবং জটিল রচনা।

চব্বিশ

আজকে যখন নতুন করে আবার বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ পড়ছি তখন আমাকে যা সবচেয়ে অবাক করে দিচ্ছে তা হচ্ছে এই উপন্যাসের আধুনিকতা। আধুনিকতার একটা লক্ষণ হচ্ছে এই যে, তা অনাবশ্যককে পরিহার করে চলে। বিশ্বের বিস্ময় যে সব উপন্যাস আধুনিককালে তা আয়তনে সংক্ষিপ্ত এবং প্রয়োজনে কেবল অনিবার্য। ইতিহাস আশ্রয় করে উপন্যাস লিখতে গেলে অনাবশ্যককে এড়িয়ে চলা প্রায় অসম্ভব। বঙ্কিমচন্দ্র রাজসিংহে সেই অসম্ভবকে প্রায় সম্ভব করেছেন।

রাজসিংহের এই দুর্নিবার গতিবেগ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথই আমাদের প্রথম সচেতন করেন ঃ

"একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। রাজসিংহের সহিত চঞ্চলকুমারীর প্রণয়-ব্যাপারটা তেমন ঘনাইয়া উঠে নাই বলিয়া কোনো কোনো পাঠক এবং সম্ভবত বহু সংখ্যক পাঠিকা আক্ষেপ করিয়া থাকেন। বঙ্কিম বড়ো একটি দুর্লভ অবসর পাইয়াছিলেন। এই সুযোগে কন্দর্পের পঞ্চশরে এবং করুণরসের বরুণবাণে দিগ্‌বিদিগ সমাকুল করিয়া তুলিতে পারিতেন।

কিন্তু তাহার সময় ছিল না। ইতিহাসের সমস্ত প্রবাহ তখন একটি সংকীর্ণ সন্ধিপথে বজ্রস্তনিত রবে ফেনাইয়া চলিতেছে ; তাহারই উপর দিয়া 'সামাল্ সামাল্ তরী'। তখন রহিয়া-বসিয়া ইনিয়া-বিনিয়া প্রেমাভিনয় কবিবার সময় নহে।

তখনকার যে প্রেম সে অত্যন্ত বাহুল্য বর্জিত, সংক্ষিপ্ত, সংহত।

সে তো বাসররাত্রের সুখশয্যায় বাসন্তী প্রেম নহে, ঘন বর্ষার কাল-রাত্রে মৃত্যু হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে আসিয়া দোলা দিয়াছে—মান-অভিমান লাজলজ্জা বিসর্জন দিয়া ত্রস্ত নায়িকা চকিত বাহুপাশে নায়ককে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। এখন সুদীর্ঘ সুমধুর ভূমিকার সময় নাই।"

উপন্যাসের ইতিহাসে ঐতিহাসিক উপন্যাসকে একটা আলাদা শ্রেণীতে ফেলা হয়॥ এই শ্রেণী বিভাগ নিতান্তই বাহ্যিক, তাই রসগ্রাহ্য নয়। কারণ উপন্যাস মাত্রই মানুষের ইতিহাস। একটা বিশেষকালের রাজায় রাজায় যুদ্ধের বর্ণনা ইতিহাসও নয়, উপন্যাসও নয়। রাজসিংহে ঔরঙ্গজেব এবং রাজসিংহের লড়াই ত উপন্যাসের ছাত্রপাঠ্য অংশ মাত্র। এবং তাদেরই কাছে ঐতিহাসিক উপন্যাস। একটা আলাদা শ্রেণীর উপন্যাস। সেক্সপীয়ারের জুলিয়াস সিজার সাহিত্য রসিকের কাছে নিছক ঐতিহাসিক নাটক নয়। একটি মানুষের উত্থান পতনের স্থূল ইতিবৃত্তের নেপথ্যে যে ভয়ঙ্কর দ্বন্দ্ব ব্যক্তি এবং দেশের প্রতি আকর্ষণকে উপলক্ষ করে বিস্ফারিত হয়েছে মানুষের সেই মহত্তম ট্রাজিডির আবরণ উন্মোচনে 'জুলিয়াস সীজার।' সেক্সপীয়ার জানতেন যে মানুষকে নিয়েই নাটক লেখা যায় এবং ইতিহাসের মানুষের মধ্যে মানুষের আসল যে ইতিহাস ঐতিহাসিকের চোখে পড়ে না কবির তৃতীয় দৃষ্টিতে তা ধরা পড়ে। রাজসিংহ হিন্দুর বাহুবল বর্ণনা নয়। রাজসিংহ জেবউন্নিসার ইতিহাস। সেই ইতিহাস রক্তলিপ্ত নয়, অশ্রুসিক্ত।

বঙ্কিমচন্দ্র এমন একটা সময়কে বেছেছিলেন জেবউন্নিসার প্রেমের পটভূমি হিসাবে যখন মোগল সাম্রাজ্যের দুর্ভেদ্য দুর্গ ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে। দিল্লীর সেই প্রাসাদপুরী যেখানে 'অল্পভূমিমধ্যে যত ধনরাশি, রত্নরাশি, রূপরাশি এবং পাপরাশি ছিল' গোটা ভারতবর্ষে

যার তুলনা ছিল না সেই মহাপাপ আর মহাবিলাসের মধ্যে জন্মেছিল রাজসিংহ উপন্যাসের নায়িকা জেবউন্নিসা। একটি যুগের অবসান আসন্ন, মহাকালের হাতে ভয়ঙ্করের মন্দিরা বেজে উঠেছে, দুর্যোগের নিবিড় তিমির রাত্রি এসেছে নিশিথ দিগন্তের অন্ধকার হৃদয়ের ত্রিকূল ওকূল দুকূল ভাসিয়ে নিয়ে যেতে। ভারত ইতিহাসের সবচেয়ে সর্পিল নিদারুণ সঙ্কটাবর্তের মধ্যে সম্রাট দুহিতা জেবউন্নিসা যক্ষপুরীর জাল ছিন্নভিন্ন করে সর্বনাশা প্রেমে পথের ধুলোয় তখন নিজেকে খুঁজে পেল। বিলাসের মণিমাণিক্যমণ্ডি, অভ্রভেদী দম্ভে দুঃশাসন মুক্ত দৃপ্ত হৃদয়ের অনির্বচনীয় সেই মহিমা ইতিহাসের ভয়ঙ্কর রক্তিম পটভূমি ছাড়া অসম্ভব অচরিতার্থ হতো। জেবউন্নিসার প্রয়োজনে ঐতিহাসিক অংশের প্রয়োজন হয়েছিল; ইতিহাসের প্রয়োজনে জেবউন্নিসার জন্ম হয় নি। রাজসিংহের রচয়িতা এই রহস্য অবগত ছিলেন বলেই উপন্যাসের রথ ইতিহাস ও মানবহিতাস এই দুই তুরঙ্গকে সেই একই রজ্জুতে বেঁধে পতন ও অভ্যুদয়ের বন্ধুর পথ দিয়ে একটি বিশেষ যুগ থেকে চিরযুগের লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পেরেছিল। লৌকিক ঘটনাকে আশ্রয় করে যে অলৌকিক মায়ায় এই দুঃসাধ্য কর্ম সম্পন্ন হয়েছিলো তার নাম প্রতিভা। রাজসিংহ রচনার প্রতিভা বঙ্গসাহিত্যে অদ্যাবধি দ্বিতীয়বার অদৃষ্ট আছে।

উপন্যাস শেষ হবার আগে জেবউন্নিসা মবারককে বলেছে: 'আমায় ক্ষমা কর! আমি ঐশ্বর্যের গৌরবে পাগল হইয়াছিলাম।
…যদি আসিয়াছ, যদি ক্ষমা করিয়াছ, তবে আমায় গ্রহণ কর।' সম্রাট দুহিতার এই ধ্বংসাবশেষ রাজসিংহ উপন্যাসের কান্না ও হাসির পান্না ও হীরে বসানো একটি অনন্ত মুহূর্ত। এই উপন্যাস শেষ করবার পর ঔরঙ্গজেবের পরাজয়, রাজসিংহের জয়, চক্রান্ত, যুদ্ধ, নির্মলকুমারী, চঞ্চলকুমারী, মাণিকলাল, এমন কি মবারককেও মনে

সে তো বাসররাত্রের সুখশয্যায় বাসন্তী প্রেম নহে, ঘন বর্ষার কাল-রাত্রে মৃত্যু হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে আসিয়া দোলা দিয়াছে—মান-অভিমান লাজলজ্জা বিসর্জন দিয়া ত্রস্ত নায়িকা চকিত বাহুপাশে নায়ককে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। এখন সুদীর্ঘ সুমধুর ভূমিকার সময় নাই।"

উপন্যাসের ইতিহাসে ঐতিহাসিক উপন্যাসকে একটা আলাদা শ্রেণীতে ফেলা হয়॥ এই শ্রেণী বিভাগ নিতান্তই বাহ্যিক, তাই রসগ্রাহ্য নয়। কারণ উপন্যাস মাত্রই মানুষের ইতিহাস। একটা বিশেষকালের রাজায় রাজায় যুদ্ধের বর্ণনা ইতিহাসও নয়, উপন্যাসও নয়। রাজসিংহে ঔরঙ্গজেব এবং রাজসিংহের লড়াই ত উপন্যাসের ছাত্রপাঠ্য অংশ মাত্র। এবং তাদেরই কাছে ঐতিহাসিক উপন্যাস। একটা আলাদা শ্রেণীর উপন্যাস। সেক্সপীয়ারের জুলিয়াস সিজার সাহিত্য রসিকের কাছে নিছক ঐতিহাসিক নাটক নয়। একটি মানুষের উত্থান পতনের স্থূল ইতিবৃত্তের নেপথ্যে যে ভয়ঙ্কর দ্বন্দ্ব ব্যক্তি এবং দেশের প্রতি আকর্ষণকে উপলক্ষ করে বিস্ফারিত হয়েছে মানুষের সেই মহত্তম ট্রাজিডির আবরণ উন্মোচনে 'জুলিয়াস সীজার।' সেক্সপীয়ার জানতেন যে মানুষকে নিয়েই নাটক লেখা যায় এবং ইতিহাসের মানুষের মধ্যে মানুষের আসল যে ইতিহাস ঐতিহাসিকের চোখে পড়ে না কবির তৃতীয় দৃষ্টিতে তা ধরা পড়ে। রাজসিংহ হিন্দুর বাহুবল বর্ণনা নয়। রাজসিংহ জেবউন্নিসার ইতিহাস। সেই ইতিহাস রক্তলিপ্ত নয়, অশ্রুসিক্ত।

বঙ্কিমচন্দ্র এমন একটা সময়কে বেছেছিলেন জেবউন্নিসার প্রেমের পটভূমি হিসাবে যখন মোগল সাম্রাজ্যের দুর্ভেদ্য দুর্গ ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে। দিল্লীর সেই প্রাসাদপুরী যেখানে 'অল্পভূমিমধ্যে যত ধনরাশি, রত্নরাশি, রূপরাশি এবং পাপরাশি ছিল' গোটা ভারতবর্ষে

যার তুলনা ছিল না সেই মহাপাপ আর মহাবিলাসের মধ্যে জন্মেছিল রাজসিংহ উপন্যাসের নায়িকা জেবউন্নিসা। একটি যুগের অবসান আসন্ন, মহাকালের হাতে ভয়ঙ্করের মন্দিরা বেজে উঠেছে, দুর্যোগের নিবিড় তিমির রাত্রি এসেছে নিশিথ দিগন্তের অন্ধকার হৃদয়ের ত্রিকুল গুকূল দুকূল ভাসিয়ে নিয়ে যেতে। ভারত ইতিহাসের সবচেয়ে সর্পিল নিদারুণ সঙ্কটাবর্তের মধ্যে সম্রাট দুহিতা জেবউন্নিসা যক্ষপুরীর জাল ছিন্নভিন্ন করে সর্বনাশা প্রেমে পথের ধুলোয় তখন নিজেকে খুঁজে পেল। বিলাসের মণিমাণিক্যমণ্ডি, অভ্রভেদী দম্ভে দুঃশাসন মুক্ত দৃপ্ত হৃদয়ের অনির্বচনীয় সেই মহিমা ইতিহাসের ভয়ঙ্কর রক্তিম পটভূমি ছাড়া অসম্ভব অচরিতার্থ হতো। জেবউন্নিসার প্রয়োজনে ঐতিহাসিক অংশের প্রয়োজন হয়েছিল; ইতিহাসের প্রয়োজনে জেবউন্নিসার জন্ম হয় নি। রাজসিংহের রচয়িতা এই রহস্য অবগত ছিলেন বলেই উপন্যাসের রথ ইতিহাস ও মানবেতিহাস এই দুই তুরঙ্গকে সেই একই রজ্জুতে বেঁধে পতন ও অভ্যুদয়ের বন্ধুর পথ দিয়ে একটি বিশেষ যুগ থেকে চিরযুগের লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পেরেছিল। লৌকিক ঘটনাকে আশ্রয় করে যে অলৌকিক মায়ায় এই দুঃসাধ্য কর্ম সম্পন্ন হয়েছিলো তার নাম প্রতিভা। রাজসিংহ রচনার প্রতিভা বঙ্গসাহিত্যে অদ্যাবধি দ্বিতীয়বার অদৃষ্ট আছে।

উপন্যাস শেষ হবার আগে জেবউন্নিসা মবারককে বলেছে: 'আমায় ক্ষমা কর! আমি ঐশ্বর্যের গৌরবে পাগল হইয়াছিলাম। ...যদি আসিয়াছ, যদি ক্ষমা করিয়াছ, তবে আমায় গ্রহণ কর।' সম্রাট দুহিতার এই ধ্বংসাবশেষ রাজসিংহ উপন্যাসের কান্না ও হাসির পান্না ও হীরে বসানো একটি অনন্ত মুহূর্ত। এই উপন্যাস শেষ করবার পর ঔরঙ্গজেবের পরাজয়, রাজসিংহের জয়, চক্রান্ত, যুদ্ধ, নির্মলকুমারী, চঞ্চলকুমারী, মাণিকলাল, এমন কি মবারককেও মনে

থাকে না। ইন্দ্রধনুচ্ছটার মতই বিলাসপুরীর মণিমাণিক্যর ঘটা যখন রঙিন বুদবুদের মত মিলিয়ে গেছে তখন ইতিহাসের অন্ধকারতম মুহূর্তে জ্বলে উঠেছে জেবউন্নিসার হৃদয়ের অনির্বাণ দীপশিখা। তারই আলোকে সে চিনতে পেরেছে, মবারক তার কে।

পঁচিশ

বঙ্গসাহিত্যে এবং বঙ্কিম সাহিত্যে একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস হচ্ছে রাজসিংহ। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাস বলতে আমরা যা বুঝি, বিশ্বসাহিত্যের মানদণ্ডে উপন্যাস হিসেবে তা নিশ্চয়ই উত্তীর্ণ নয়। তবুও বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস বলতে যা বোঝায় তার প্রথম পূর্ণাঙ্গ-রূপকার বঙ্কিমচন্দ্র। বাংলা ভাষায় সামাজিক উপন্যাস বঙ্কিম ছাড়াও কারুর কারুর হাত দিয়ে বেরিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের হাত দিয়ে বেরিয়েছে আমাদের যা শ্রেষ্ঠ তাই। কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে বঙ্কিমই প্রথম এবং বঙ্কিমই শেষ উপন্যাসকার। বঙ্গ ও বঙ্কিম-সাহিত্যে সেই প্রথম ও শেষ, অদ্বিতীয় ঐতিহাসিক উপন্যাসের নাম রাজসিংহ।

ইতিহাস তখনই উপন্যাস হয় শুধু যখন মানবেতিহাসের সঙ্গে তা যুক্ত হয়। সেই একবারই তা হয়েছে বঙ্কিমের রাজসিংহে। এবং সে কথা রবীন্দ্রনাথের রাজকীয় ভাষায় অনবদ্য উপস্থিত ঃ

"সাধারণ ইতিহাসের একটা গৌরব আছে। কিন্তু স্বতন্ত্র মানব-জীবনের মহিমাও তদপেক্ষা ন্যূন নহে। ইতিহাসের উচ্চচূড় রথ চলিয়াছে— বিস্মিত হইয়া দেখো, সমবেত হইয়া মাতিয়া উঠ; কিন্তু সেই রথচক্রতলে যদি একটি মানব হৃদয় পিষ্ট হইয়া ক্রন্দন করিয়া

মরিয়া যায় তবে তাহার সেই মর্মান্তিক আর্তধ্বনিও, রথের চূড়া যে গগনতল স্পর্শ করিতে স্পর্ধা করিতেছে সেই গগনপথে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে ; হয়তো সেই রথচূড়া ছাড়াইয়া চলিয়া যায়।"

রাজসিংহই যে বঙ্কিমের একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস এ আমার একার কথা নয় ; স্বয়ং বঙ্কিমের কথাও হুবহু তাই : "পরিশেষে বক্তব্য যে, আমি পূর্বে কখনও ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখি নাই। দুর্গেশনন্দিনী বা চন্দ্রশেখর বা সীতারামকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাইতে পারেনা। এই প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিলাম।" বঙ্কিম অতিরিক্ত যে কথা যোগ করেছি তা হচ্ছে, রাজসিংহ কেবল বঙ্কিমের প্রথম নয়, বঙ্কিম তথা বঙ্গ সাহিত্যের শেষ ঐতিহাসিক উপন্যাস।

রাজসিংহ উপন্যাসের ভূমিকায় বঙ্কিম বলেছেন : "হিন্দুদিগের বাহুবলই আমার প্রতিপাদ্য।" রাজসিংহ পড়ে একথা স্বচ্ছন্দে বলা যায় যে, লেখকের মনে যাই থাকুক, এই উপন্যাস সেই প্রতিপাদ্যকে অতিক্রম করে বহুদূর চলে গেছে। যদি হিন্দুদের বাহুবল প্রমাণ করাই এ উপন্যাসের একমাত্র প্রতিবেদন হতো তাহলে রাজসিংহ উপন্যাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এ বক্তব্য অত্যুক্তি হিসেবে গণ্য হতো যে রাজসিংহর :

"এক-একটি খণ্ড এক-একটি নির্ঝরের মতো দ্রুত ছুটিয়া চলিয়াছে। প্রথম প্রথম তাহাতে কেবল আলোকের ঝিকিমিকি এবং চঞ্চল লহরীর তরল কলধ্বনি ; তাহার পর ষষ্ঠ খণ্ডে দেখি ধ্বনি গম্ভীর, স্রোতের পথ গভীর এবং জলের বর্ণ ঘনকৃষ্ণ হইয়া আসিতেছে। তাহার পর সপ্তম খণ্ডে দেখি কতক বা নদীর স্রোত, কতক বা সমুদ্রের তরঙ্গ, কতক বা অমোঘ পরিণামের মেঘগম্ভীর গর্জন, কতক বা তীব্র লবণাশ্রুনিমগ্ন হৃদয়ের সুগভীর ক্রন্দনোচ্ছ্বাস, কতক বা ব্যক্তি

বিশেষের মজ্জমান তরণীর প্রাণপণ হাহাধ্বনি। সেখানে নৃত্য অতিশয় রুদ্র, ক্রন্দন অতিশয় তীব্র এবং ঘটনাবলী ভারত ইতিহাসের একটি যুগাবসান হইতে যুগান্তরের দিকে ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে।"

ইতিহাসের সঙ্গে মানবেতিহাস যুক্ত না হলে ক্ষণকালের কথা চিরকালের কথাসাহিত্য হতে পারত না। ঔরঙ্গজেব ও রাজসিংহে, মুসলমান ও হিন্দুশক্তির সংঘর্ষ এ উপন্যাসের মুখোস মাত্র। সেই মুখোসের অন্তরাল থেকে বারংবার যে মুখ বেরিয়ে পড়েছে তা জেবউন্নিসার। এই উপন্যাসের অন্তরঙ্গ উপাখ্যানের নায়ক এবং নায়িকা, দুই-ই সে। সম্রাটদুহিতা এবং মানব কন্যার অন্তর্দ্বন্দ্বে নিরন্তর ক্ষত-বিক্ষত জেবাউন্নিসাই এ উপন্যাসের ইতিহাস অংশকে মানবেতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করেছে। ইতিহাসের আকস্মিক বজ্রপাত আর মানবাশ্রুর মুক্তা বিন্দু দিয়ে গাঁথা, বঙ্কিমের রাজসিংহ, একটি রাগে উদ্ধত, অভিমানে অভ্রভেদী, অনুতাপের অশ্রুজলে পরিশ্রুত হৃদয়ের হাহাকারে, অনির্বচনীয়। ঔরঙ্গজেব-রাজসিংহে মুখোমুখি সংঘর্ষের ইতিবৃত্তের কেন্দ্র ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জেবউন্নিসা তার গর্বোদ্ধত হৃদয় পেতে দিয়েছে যখন এবং ডাক দিয়েছে প্রিয় নাম ধরে তখনই ইতিহাস-রথের চূড়া অতিক্রম করে গেছে মানবেতিহাসের মৃত্যুদীপ্ত জীবনের জ্যোতির্ময় মহিমা।